অধ্যাপক নীহার কুমার সরকার

ছোটদের রাজনীতি
ছোটদের অর্থনীতি

অধ্যাপক নীহার কুমার সরকার

প্রকাশক

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
মুক্তিভবন, ২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক
পুরানা পল্টন, ঢাকা
ফোন : ০১৭৬৬৭৯৭৯৭৯
ফ্যাক্স : ৯৫৫২৩৩৩
ই-মেইল : jatiya.sahitya@gmail.com

প্রকাশকাল	অমর একুশে গ্রন্থমেলা ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ফাল্গুন ১৪২০
প্রচ্ছদ	সব্যসাচী হাজরা
অক্ষর বিন্যাস	লেখনী কম্পিউটার্স মুক্তিভবন, ২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক পুরানা পল্টন, ঢাকা
মুদ্রণ	মাটি আর মানুষ ১১০ ফকিরাপুল, ঢাকা ফোন : ৭১১৯৪৫৩০
দাম	১২৫ টাকা
ISBN	978-984-8675-28-1

প্রথম প্রকাশক

পুথিঘর

২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

লেখকের পরিচয়

অধ্যাপক নীহার কুমার সরকার কিশোর বয়সেই বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন এবং ছাত্র জীবনের বেশির ভাগ সময় কারাগারে ও অন্তরীনে কাটান। তিনি অর্থনীতিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এম.এ. ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট।

অধ্যাপক সরকার ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৫৭ সনে রাষ্ট্রসংঘ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের গবেষণা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৬৬ সনে রাষ্ট্রসংঘের এশিয়া কেন্দ্র ব্যাংককে বদলি হয়ে তিনি প্রাচ্য দেশসমূহের অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯৭৫ সনে রাষ্ট্রসংঘ থেমে অবসর গ্রহণ করে তিনি দিল্লীতে ভারত সরকারের শ্রম বিভাগের ন্যাশনাল লেবার ইনস্টিটিউটের গবেষণা বিভাগের অবৈতনিক উপদেষ্টারূপে কাজ করেন।

অধ্যাপক সরকার রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রসঙ্গে ইংরেজি ও বাংলায় বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর কোন কোন গবেষণামূলক গ্রন্থ রাষ্ট্রসংঘ থেকে এবং বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যাপক সরকারের লেখা সর্বাধিক পঠিত দু'টি বিশিষ্ট গ্রন্থ হলো- 'ছোটদের রাজনীতি' ও 'ছোটদের অর্থনীতি'। গ্রন্থ দু'টি ১৯৪২ সনে রাজনীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের উপযুক্ত করে লিখিত ও মুদ্রিত হয়। তখন থেকে আজ ৭০ বছরের অধিককাল বহু সংস্করণের মধ্য দিয়ে গ্রন্থ দু'টি রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রবেশক গ্রন্থ হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বীর মর্যাদা পেয়ে আসছে।

ছোটদের রাজনীতি

অধ্যাপক নীহার কুমার সরকার

সংশোধিত নতুন সংস্করণ ২০০৫

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

ছোটদের রাজনীতি

অধ্যাপক নীহার কুমার সরকার

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী সংস্করণ

প্রকাশকাল

অমর একুশে গ্রন্থমেলা
ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ফাল্গুন ১৪২০

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৪২

বিয়াল্লিশতম সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০০৫

পুঁথিঘর
২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

লেখকের কথা

ছোটদের রাজনীতি, ছোটদের অর্থনীতি জাতীয় বই-এ প্রায় প্রতি সংস্করণেই কিছু না কিছু সংযোজন সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'ছোটদের রাজনীতি' বইয়ের আগের দু'টি সংস্করণের একটিতে 'সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিফলতার কারণ' নামে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়েছে। তারপরের সংস্করণে 'জাতীয়তাবাদ, মৌলিকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা' আর একটি প্রয়োজনীয় অধ্যায় যোগ করা হয়েছে। এবার তেমন কোনো নতুন অধ্যায় না হলেও ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য ও সামান্যতঃ বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল নিরপেক্ষ আন্দোলন সম্পর্কেও আবার একটু বিশেষ করে মনে করিয়ে দেওয়ার।

আমার অসুস্থতার কারণে স্থানে স্থানে এই সংযোজনের দায়িত্বটুকু আমি আমার স্নেহভাজন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপকদের মধ্যে অন্যতম ড. শোভনলাল দত্তগুপ্তের হাতে ছেড়ে দিই। আমি দেখে সুখী হয়েছি শ্রীমান শোভন তাঁকে দেওয়া দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেছেন। বিশেষ করে অত্যন্ত মনোযোগ ও সতর্কতার সঙ্গে এই সংস্করণের গোটা প্রেসকপি তৈরি করে দিয়েছেন। এ সংস্করণে গত সংস্করণের 'জাতীয়তাবাদ, মৌলিকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা' অধ্যায়টি 'ভারতীয় জাতীয়তা সমস্যা' নামে বই-এর শেষ অধ্যায়ের আগের অধ্যায় হিসেবে এসেছে!

(আগস্ট ১৯৯৫ সংস্করণ থেকে পুনর্মুদ্রিত)

সূচিপত্র

[এক]

ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ

ক্যাপিটালিজম কী?

সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমাতে যাওয়া অবধি আমরা কতো হাজার হাজার রকমের জিনিসপত্র ব্যবহার করি, তা কখনো হিসাব করে দেখেছো কি? যেমন সকালে ঘুম থেকে উঠেই টুথ-ব্রাস, টুথ-পেস্ট, তোয়ালে, সাবান চাই। তারপর চা খাবার জন্যে চা, চিনি, দুধ, পেয়ালা, পিরিচ, মাখন, রুটি ইত্যাদি। আবার পড়তে বসবে তার জন্য বই, খাতা, কাগজ, কলম, চেয়ার, টেবিল চাই। স্কুলে যাবে তার জন্যে চাই কাপড়-চোপড়, সাইকেল বা মোটর। এই করে করে সব রকম কাজের জন্যই জিনিসপত্র কোত্থেকে আসে জানো? বাজারে দোকানদারের কাছ থেকে তোমার বাবা-মা কিনে নিয়ে আসেন। দোকানদারেরা আবার কারখানা থেকে, চাষীদের কাছ থেকে, খনির মালিকদের কাছ থেকে এই সকল জিনিস কিনে নিয়ে আমাদের কাছে বিক্রি করে। কারখানার মালিকরা, চাষীরা ও খনির মালিকরা তাদের কল-কারখানা খাটিয়ে, জায়গা-জমি চাষ করে, খনি থেকে নানারকম জিনিস তুলে কুলি-মজুরদের দিয়ে এই সব জিনিস তৈরি করায়। এই সকল জিনিস তৈরি করার যে যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, জমি-জায়গা, খনি ইত্যাদি ঐ গুলিকে আমরা বলবো **'উৎপাদন যন্ত্র' (Means of Production)**, কারণ এগুলোর সাহায্যে আমাদের দরকারি জিনিসপত্র 'উৎপাদিত' অর্থাৎ তৈরি হয়। আর এই সব জিনিসপত্র যা আমরা ব্যবহার করি তা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় বলে তাকে বলবো **'পণ্য' (Commodity)**।

কয়েকটি সোস্যালিস্ট (সমাজতান্ত্রিক) দেশ ছাড়া পৃথিবীর অন্য সকল দেশে উৎপাদন যন্ত্রগুলো, যেমন খনি, কল-কারখানা, জায়গা-জমি– এ সবই লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অর্থাৎ যার এইরূপ কোনো উৎপাদন যন্ত্র আছে, শুধু সে একাই তার মালিক, সমাজে অন্য কেউ তার এই উৎপাদন যন্ত্রের বিষয়ে কোনো হাত দিতে পারে না। যেমন কারো যদি একখণ্ড জমি থাকে বা একটা কারখানা থাকে, তবে সে জমি চাষ করা বা না করা, সে কারখানা চালু করা বা বন্ধ রাখা সম্পূর্ণ তার মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আবার সেই

জমিতে যদি কোনো ফসল হয় বা কারখানায় যদি কোনো জিনিস তৈরি হয়, তবে সেই ফসল বা সেই জিনিস যার জমি বা যার কল তারই হবে। **ক্যাপিটালিজমের** (পুঁজিবাদ) গোড়ার কথাই হলো এই– উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার।

যাদের এই উৎপাদন যন্ত্রের অধিকার থাকে, তারা এগুলো সাধারণত ফেলে রাখে না। সেগুলো খাটিয়ে নানা রকম জিনিসপত্র তৈরি করে। কেন তৈরি করে? কেননা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করলে এদের যথেষ্ট লাভ হয়। এই লাভের লোভেই উৎপাদন যন্ত্রের মালিকরা উৎপাদন যন্ত্র খাটিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করায়। এইসব জিনিসপত্র বা পণ্য আমাদের অভাব মেটায়, আমাদের দরকারে লাগে, এগুলো না পেলে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয়। এমনকি বেঁচে থাকতে পারি না। কিন্তু সে সব কথা উৎপাদন যন্ত্রের মালিকরা ভাবে না। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য লাভ বা **'মুনাফা' (Profit)**। যতোক্ষণ লাভ হবে, ততোক্ষণ অবধি তারা পণ্য উৎপাদন করে বাজারে বিক্রি করবে। যখনি লাভ বন্ধ হবে, তখনই পণ্য উৎপাদনও তারা বন্ধ করবে। তাতে লোকের অসুবিধাই হোক বা না খেতে পেয়েই মরুক সেদিকে তারা ভ্রুক্ষেপও করবে না। কাজেই লাভ করবার জন্যেই এই সব পণ্য ক্যাপিটালিস্ট সমাজে তৈরি করা হয়। লাভই ক্যাপিটালিজমের প্রধান কথা। এই সকল পণ্য যে মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্যে দরকার সে কথাটা বড় কথা নয়।

মোটামুটিভাবে ক্যাপিটালিস্ট সমাজের একটা সংজ্ঞা আমরা এখন দিতে পারি– যে সমাজে উৎপাদন যন্ত্রগুলি ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে এবং যেখানে একমাত্র লাভের জন্যই পণ্য তৈরি হয়, সেই সমাজকেই আমরা ক্যাপিটালিস্ট সমাজ বলতে পারি।

উৎপাদন যন্ত্র যখন এইরূপ ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে, এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য যখন তা দিয়ে পণ্য তৈরি হয়, তখন এই উৎপাদন যন্ত্রগুলোকে বলা হয় **'পুঁজি' বা ক্যাপিটাল**। যেমন, কারখানার মালিকের পুঁজি হলো তার কারখানা। জমিদারদের পুঁজি হলো তার জমি-জমা। সুদখোরের বা ব্যাঙ্কারের পুঁজি হলো তার টাকা। আর খনি মালিকের পুঁজি হলো তার খনি। এই সব পুঁজির মূল্য আবার টাকায় হিসাব করা যায়। যেমন, খনির মূল্য যদি হয় দশ হাজার টাকা হয়, তবে খনির মালিকের দশ হাজার টাকার পুঁজি আছে বলা হয়।

ক্যাপিটালিজমের ফল (১)

আগেই বলেছি, লাভের জন্য উৎপাদন যন্ত্রের মালিকেরা তাদের ক্যাপিটাল বা পুঁজি খাটায়। সমাজের যারা গরিব মানুষ তারা পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে কল-কারখানায়, খনিতে, জমিতে কাজ খুঁজতে আসে। কারণ তাদের টাকা-কড়ি নেই, জমি-জমা নেই, 'উৎপাদন যন্ত্র' কিছুমাত্র নিজেদের হাতে নেই। একমাত্র নিজেদের গতর ছাড়া আর কোনো পুঁজি তাদের নেই, যা খাটিয়ে তারা কিছু আয় করতে পারে। তাই তারা তাদের একমাত্র সম্বল শরীর খাটিয়ে বাঁচে। এরাই মজুর, এদের তাই বলে **'সর্বহারা'** বা 'স্বশ্রমজীবী' (Proletariat : প্রোলিটারিয়েট)। ক্যাপিটালিস্টরা তাদের কাছ থেকে তাদের এই পরিশ্রম করার শক্তি কিনে নেয় এবং তা খাটিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে পণ্য তৈরি করিয়ে বাজারে বিক্রি করে। বাজারে পণ্য বিক্রি করে মালিকরা যা টাকা পায়, তা থেকে মজুরদের মাইনে হিসেবে কিছু দেয় এবং অন্যান্য (যেমন কাঁচামালের দাম, ব্যাংকের কাছ থেকে ধার-করা টাকার সুদ ইত্যাদি) খরচপত্র বাদ দেয়, তারপর যা বাকি থাকে তাই হলো ক্যাপিটালিস্টের লাভ।

ক্যাপিটালিস্টের যা লাভ হয় তার কতকটা সে নিজের ছেলে-মেয়ের ও পরিবারের অন্য সকলের জন্য খরচ করে এবং বাকিটা আবার পুঁজি হিসেবে ব্যবসায় খাটায়। এমনিভাবে তার কল-কারখানা বড় হয়, পুঁজি বেড়ে যেতে থাকে এবং যতোই তার পুঁজি বেড়ে যায় ততোই আবার তার লাভের পরিমাণও বেড়ে যেতে থাকে। এমনিভাবে লাভ বাড়াতে, পুঁজি বাড়ে এবং পুঁজি বাড়ায় লাভ আরো বেড়ে যেতে থাকে। তার খুব দরকারও হয় এই বর্ধিত পুঁজি খাটাবার এবং সুযোগও পায় সে যথেষ্ট। বাজারে অন্য অনেক ক্যাপিটালিস্ট থাকে, তাদের সঙ্গে পণ্য বিক্রি করার জন্য তাকে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এই প্রতিযোগিতায় সে-ই জেতে, যে সবচেয়ে কম দামে জিনিস বিক্রি করতে পারে। এই জন্য সব ক্যাপিটালিস্টরা চেষ্টা করে যাতে খুব কম খরচে খুব বেশি পণ্য তৈরি করতে পারে। তার জন্য তারা বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে নানা রকম নতুন নতুন কল ও যন্ত্রপাতি অবিষ্কার করিয়ে তা পণ্য তৈরির কাজে লাগায়। উদ্দেশ্য এই যে, এই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রমিকদের কাছ থেকে খুব কম সময়ে বেশি কাজ আদায় করিয়ে নিয়ে খুব সস্তায় পণ্য তৈরি করা। পণ্য সস্তায় উৎপন্ন হলে বিক্রি করাও যায় সস্তায় এবং সস্তা দরে পণ্য বিক্রি করলে বিক্রিও হয় অনেক বেশি। কারণ, যার জিনিসের দাম কম, তার কাছে থেকেই সবাই

কেনে। আর বিক্রি বেশি হলে, সাধারণত লাভও বেশি হয়। এই জন্য ক্যাপিটালিস্টরা সব সময়ে চেষ্টা করে তাদের পুঁজি বাড়াতে, কারণ পুঁজি বাড়ালেই তাদের লাভ বাড়ে। দেখতে দেখতে ছোট কারখানা বড় কারখানা হয়ে পড়ে, নতুন নতুন কলকজা বসে। যেখানে একশ' মজুর কাজ করতো, সেখানে হাজার মজুর খাটতে থাকে। জিনিস তৈরির নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার হয়।

একদিকে যেমন ক্যাপিটালিস্টদের পুঁজি, ধনসম্পত্তি বেড়ে যেতে থাকে, অন্যদিকে আবার সমাজে দারিদ্র্যও বেড়ে যেতে থাকে। যাদের পুঁজি অল্প, তারা বড় পুঁজিওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে এবং মজুরদের দলে ভিড়ে যায়। এমনিভাবে শ্রমিকদের দল বেড়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে কলকজা আবিষ্কার হওয়ায়, কলেই সব কাজ করে দেয়। শ্রমিকদের আর বেশি দরকার হয় না। কাজেই শ্রমিকরা যেমন সংখ্যায় বেড়ে যায়, তেমনি তাদের কাজও কমে যায়। এইজন্য শ্রমিকরা যা পায় সেই মাইনেতেই কাজ করতে রাজি হয়। ক্যাপিটালিস্টরাও সুবিধা বুঝে খুব কম মাইনে দেবার চেষ্টা করে। কারণ মাইনে যতো কম দেবে, ততো তাদের পণ্য তৈরির খরচ কম হবে এবং ততোই লাভ বেশি হবে। সমাজে সেইজন্য অল্প কয়েকজন লোক খুব ধনী হয়ে ওঠে, আর বাকি সব লোক তাদের তুলনায় ক্রমেই গরিব হয়ে পড়তে থাকে। এমনিভাবে সমাজে ক্যাপিটালিজম গোটাকয়েক মানুষকে ধনী করে, বেশির ভাগ মানুষকে গরিব করে দেয়। এই হলো ক্যাপিটালিজমের প্রথম ফল।

ক্যাপিটালিজমের ফল (২)

পুঁজিবাদ শুধু শ্রমিকদের আয় কমিয়ে দিয়ে তাদের গরিব করে দেয়- তা নয়, সময় সময় তাদের আয়ের পথ একেবারে বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিককে ভিক্ষুকে পরিণত করে। আমরা দেখেছি, বাজারে জিনিসপত্র বিক্রি হলে, তবে ক্যাপিটালিস্ট তার লাভ আদায় করতে পারে। কিন্তু বাজারে পণ্য কেনে কারা? কিছু পণ্য ক্যাপিটালিস্টরা নিজেরাই কেনে। আর বেশির ভাগ কেনে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা। কিন্তু এদের আয় যখন কমে যায়, তখন এরা আর সব জিনিস কিনতে পারে না। তার ফলে পণ্য বাজারে বিক্রি না হয়ে পড়ে থাকে। দোকান, কারখানার গুদাম পণ্যে বোঝাই হয়ে থাকে। কিন্তু ক্রেতাদের পকেটে পয়সা না থাকায় ঐ সব জিনিস বা পণ্য বিক্রি

হয় না। পণ্য বিক্রি না হওয়ায়, ক্যাপিটালিস্টদের লাভ আর হয় না বরং লোকসান হতে থাকে। তখন ক্যাপিটালিস্ট বাধ্য হয়ে তার কারখানা বন্ধ করে দেয়। কারণ বাজারেই যখন জিনিসপত্র অবিক্রিত অবস্থায় বোঝাই হয়ে রয়েছে, তখন আরো পণ্য তৈরি করে লাভ কী? কারখানার পরে কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, ব্যাংক লোকসান করতে থাকে। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যায়। ক্যাপিটালিজমের এই দুর্দশাকে বলা হয় **'ব্যবসা-সংকট'**।

ব্যবসা-সঙ্কটের সময় শ্রমিকদের দুর্দশার একশেষ হয়। ছেলেপুলে নিয়ে চেয়ে-চিন্তে অতিকষ্টে আধপেটা খেয়ে, কোনোদিন না খেয়ে তাদের দিন কাটে। এই শতাব্দীতেই তিনবার এইরূপ ব্যবসা-সংকট হয়ে গেছে। এ অবধি শেষ বারের ব্যবসা-সংকট হয়েছিলো ১৯৩০ সালে। সে-বারের ব্যবসা-সঙ্কটে একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই ১ কোটি ৩০ লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে গিয়েছিলো। তারা যে কী রকমভাবে বেঁচে থাকতো, তার সঠিক কোনো হিসাব পাওয়া যেতো না। তাদের ছোট ছেলে-মেয়েরা দোকানের ও গুদামের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতো। ডকের গুদামে নানা রকম খাদ্যদ্রব্য, ফল-মূল মজুত হয়ে থাকতো। যখনই এখান থেকে পচে যাওয়ার কারণে বা খারাপ হয়ে যাবার কারণে কোনো কিছু বাইরে ফেলে দেওয়া হতো, তখনি বাইরের ছেলেমেয়েরা কুকুরের মতো কাড়াকাড়ি করে সেই খাবার বা ফলমূল খেয়ে নিতো। (চার্লি চ্যাপলিনের 'মর্ডার্ন টাইমস' নামক ছবিতে এই রকম মর্মান্তিক দৃশ্য তোমরা দেখতে পাবে।) এই রকম একদিকে যেমন যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য গুদামে থেকে পচতো অন্যদিকে লোকে ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতো। একদিকে যেমন গুদামে পোষাক-পরিচ্ছদ বোঝাই হয়ে থাকতো, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ লোক শীতে কষ্ট পেতো। শিশুরা শীতের রাতে ঠাণ্ডা হয়ে জমে যেতো। বড় বড় বাড়ি খালি থাকতো, অথচ লোকে আশ্রয়শূন্য হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। এমনকি ক্যাপিটালিস্টরা বাজার নষ্ট হয়ে যাবে বলে পণ্য কম দামে বিক্রি না করে বা বিনা পয়সায় পণ্য বিলিয়ে না দিয়ে সব সমুদ্রে ফেলে দিতো বা পুড়িয়ে ফেলতো। এই রকম প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য ক্যাপিটালিজমের কৃপায় পাশাপাশি অবস্থান করে। মনে রেখো, এই ব্যবসা-সংকট ও মানুষকে বেকার করে দেওয়া হলো ক্যাপিটালিজমের দ্বিতীয় ফল।

ক্যাপিটালিস্টরা পুঁজিপতিরা এই ব্যবসা-সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বাড়তি জিনিসপত্র নষ্ট করে দেয়, উৎপাদন যন্ত্রের খানিকটা ধ্বংস করে ফেলে এবং শ্রমিকদের আরো কম মাইনে দিয়ে বেশি করে খাটানোর চেষ্টা করে। এর ফলে উৎপাদন যন্ত্র খাটিয়ে কিছুদিনের জন্য তাদের আবার বেশ

লাভ হতে থাকে। কিন্তু লাভ বেশ জেঁকে ওঠার আগেই ব্যবসা-সংকট আবার আরম্ভ হয়। এই রকম কিছুদিন অন্তর অন্তর ব্যবসা-সংকট ক্যাপিটালিজমের একটা বিশেষ রীতি।

ক্যাপিটালিজমের ফল (৩)

ক্যাপিটালিজমের তৃতীয় ফল হচ্ছে- **উৎপাদন ক্ষমতার অপপ্রয়োগ**। পুঁজিবাদী কল মালিকরা যেসব পণ্য তৈরি করে বেশি লাভ পাবে, সেইসব পণ্য ততো বেশি তৈরি করবে। কিন্তু এই লাভ আদায় করতে হলে, তাকে উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি করতে হয়। সুতরাং বাজারে যে জিনিসের বিক্রি সেই, সে জিনিস মালিকরা কিছুতেই তৈরি করবে না। সে জিনিস খুব অত্যাবশ্যকীয় হতে পারে, এমনকি সে জিনিস না পেলে মানুষ মরে যাবে এমনও হতে পারে, তবু কিন্তু পুঁজিবাদীরা তা তৈরি করবে না, যদি তা বাজারে বিক্রি করে তা থেকে তাদের বেশ কিছু লাভ না হয়! একদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ক্রমেই গরিব হয়ে পড়ে, তাই তারা তাদের অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র বেশি দাম দিয়ে কিনতে পারে না। অপরদিকে ধনীদের হাতে যথেষ্ট পয়সা থাকায় তারা তাদের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনতে তো পারেই, উপরন্তু নানা প্রকার বিলাসিতার জিনিসপত্রের জন্য বিশেষ করে তাগিদ দিতে থাকে। ফলে খাদ্যদ্রব্য, কাপড় ইত্যাদি বাঁচার পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে জিনিসগুলো সেগুলো যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি না করে পুঁজিবাদীরা মোটরগাড়ি, সুন্দর বাড়ি, রেডিও, টিভি, ভিডিও প্রভৃতি বিলাসিতার জিনিসপত্র তৈরি করায়। কারণ এগুলো ধনীদের কাছে বেশ চড়া দামে বিক্রি হয়। তাতে তারা মোটা কাপড় ও খাদ্যদ্রব্য তৈরির চাইতে অনেক বেশি লাভ করতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজে তাই উৎপাদন ক্ষমতা এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যাতে মানুষের সবচেয়ে আগে যে জিনিসগুলো দরকার সেগুলো তৈরি না হয়ে ধনীদের বিলাসিতার খোরাক যোগাবার জন্যই জিনিসপত্র তৈরি হয়। ফলে একদিকে কোটি কোটি লোক বুভুক্ষু ও অর্ধনগ্ন থেকে যায় এবং অন্যদিকে বিলাসিতার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা হয়।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি– ১৯৩০-৩৩ সালে ভয়ঙ্কর ব্যবসা-সংকট হয়েছিলো। তাতে সমস্ত পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক বেকার হয়ে গিয়েছিলো। এই সময়ে বিলাতের অস্টিন মোটরকার কোম্পানি গর্বের সঙ্গে তাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি লাভ ঘোষণা করে। কারণ ধনীদের হাতে তখন বিস্তর টাকা। ব্যবসায়ে সে

টাকা তারা খাটাতে পারছিলো না- অন্যান্য ব্যবসায় লাভ কমে গেছে বলে। তাই মোটরগাড়ি কিনে অন্যান্য বিলাসিতায় তারা সে টাকাটা খরচ করেছিলো। আর অস্টিন কোম্পানিও তখন মোটরগাড়ি তৈরি করেছিলো খুব।

ক্যাপিটালিজমের ফল (৪)

পুঁজিবাদের আর একটা কুফল হলো, গ্রামের **সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনীতির সর্বনাশ** করে দেওয়া। প্রায় সব দেশের কৃষিকাজেই বছরের কয়েক মাস চাষীর হাতে চাষবাসের কোনো কাজ থাকে না। এই কয় মাস তারা নানা রকম হাতের তৈরি জিনিসপত্র তৈরি করে এবং গ্রামের হাটে সেগুলো বিক্রি করে এই কয়েক মাস সংসার চালায়। কেউ কেউ মাটির হাড়ি-কুড়ি তৈরি করে, কেউ লোহার সাজ-সরঞ্জাম বানায়, কেউ বাঁশের নানা রকম টুকরি ইত্যাদি বানায়, কেউ কাঠের কাজ করে, কেউ ঘানি চালিয়ে তেল বানায় ইত্যাদি করে অবসর সময়টা এরা কাজে লাগায় এবং বেশ কিছু আয় করে।

পুঁজিবাদের আমলে এই সব জিনিসপত্র কলে-কারখানায় অনেক সস্তায় তৈরি হয়। ফলে কলে তৈরি জিনিসে গ্রামের বাজার ছেয়ে যায়। গ্রামে হাতে তৈরি জিনিস আর কেউ কেনে না। গ্রামের চাষীরাও হাতের কাজ করে যারা বাঁচে, তারা বেকার হয়ে পড়ে। তাদের আয় কমে যায় এবং সংসার চালানো দুরূহ হয়ে পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে তারা মহাজন, জমিদার বা বড় চাষী, যাদের অনেক জমি জমা আছে ও অনেক বাড়তি শস্য মজুদ আছে, তাদের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে এবং উঁচু হারে টাকা বা ধান ধার করে। একবার এই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়লে, আর তাদের রক্ষা থাকে না। ধীরে ধীরে জমি-জমা বিক্রি হয়ে যায় এবং সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রামে ভূমিহীন চাষী হয়ে যায়। যখন গ্রামেও আর কাজ জোটে না, তখন শহরে চলে আসে বস্তিতে ভীড় করে শহরের বেকার সংখ্যা বাড়ায়। এই রকম একটা গ্রাম পুঁজিবাদের প্রকোপে ধ্বংস হয়ে যাবার ছবি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই 'গণদেবতা'-তে তোমরা হয়তো পড়ে থাকবে। ইদানীং টিভিতেও এই বইটা মাঝে মাঝে দেখাচ্ছে এবং সেখানেও পুঁজিবাদের প্রকোপে গ্রামবাসীদের দুরবস্থার ছবি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

ক্যাপিটালিজমের এই চারটি ফল ছাড়াও আরো একটা ফল আছে- তা পঞ্চম ফল এবং এই পঞ্চম ফল হচ্ছে যুদ্ধ। যুদ্ধ কেন হয়, তার কারণগুলো আমরা ইম্পেরিয়ালিজম অধ্যায়ে আলোচনা করবো এখন।

[দুই]

ইম্পেরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ

কলোনির (উপনিবেশ) সৃষ্টি

আমরা দেখেছি, পুঁজিবাদের একটা বিশেষ প্রকৃতি হলো খুব দ্রুত পুঁজির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। পুঁজির পরিমাণ বেড়ে যাওয়াতে নতুন নতুন কল-কজা, নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার হয় এবং এর ফলে সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে পণ্য তৈরি হতে থাকে। কিন্তু ক্যাপিটালিস্টের আয় যে পরিমাণে বাড়ে, শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত লোকেরদের আয় সে রকম বাড়ে না। কাজেই পুঁজি বেড়ে গিয়ে অনেক বেশি বেশি জিনিস তৈরি হয় বটে, কিন্তু লোকের সেই সব জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতা তেমন বাড়ে না। আমরা দেখেছি, এর ফলে ব্যবসা-সংকট উপস্থিত হয়। অর্থাৎ বাজার অবিক্রিত পণ্যে বোঝাই হয়ে যায়। দোকানে দোকানে, গুদামে গুদামে জিনিসপত্র বোঝাই হয়ে পড়ে থাকে। হাজার অভাব থাকলেও, হাজার ক্ষুধা থাকলেও, খাদ্য ও ক্ষুধিতের মধ্যে টাকার প্রাচীর ব্যবধান সৃষ্টি করে রাখে। এদিকে এই সকল পণ্য বিক্রি না হলে ক্যাপিটালিস্টদের লাভ আদায় করা হয় না।

নিজেদের দেশের বাজারে যখন আর এই সব পণ্য বিক্রি হয় না, বাধ্য হয়েই তখন পণ্য বিক্রি করার জন্য ক্যাপিটালিস্টরা বাজারের খোঁজে বিদেশে বের হয়ে পড়ে। বাজারের খোঁজ করতে করতে এরা কী রকম দেশে এসে হাজির হয়? যে দেশে ক্যাপিটালিস্ট প্রথায় জিনিসপত্র তৈরি হয় সেরকম দেশে এসে তাদের কোনো লাভ হয় না। কারণ এ সব দেশগুলোতেও তাদের দেশের মতোই অবিক্রিত পণ্যে বাজার বোঝাই হয়ে থাকে। তাই পণ্য বিক্রি করার কোনো আশা ওখানে থাকে না। কাজেই এরা যে সব দেশ এখনও ক্যাপিটালিস্ট প্রথা যথেষ্ট আঁকড়ে ধরে নি, সেই সব দেশে এসে ভীড় করে। এই সব পেছনে-পড়ে থাকা অ-ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলোতে ক্যাপিটালিস্টরা তখন তাদের অবিক্রিত পণ্য নিয়ে হাজির করে সেখানে সব বিক্রি করার চেষ্টা করতে থাকে। সকল ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলোই যে যার পণ্য নিয়ে এসে ওদের কাছে বিক্রি করতে চায়।

এই নিয়ে বিভিন্ন দেশের ক্যাপিটালিস্টদের ভেতরে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, ঝগড়া ঝাটি হতে থাকে। তখন তারা এই দেশগুলোর গভর্নমেন্ট অধিকার করতে সচেষ্ট হয়। কারণ গভর্নমেন্ট যে জাতির ক্যাপিটালিস্টদের হাতে থাকবে, সে জাতির ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব সুবিধে হবে এবং এই গভর্নমেন্টের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে অন্য দেশের ক্যাপিটালিস্টদের যথেষ্ট নাস্তানাবুদ করা যাবে। ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলো তখন যুদ্ধ করে এই সব অ-ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলোকে হস্তগত করে নেয়। এই রকম পেছনে-পড়ে থাকা অ-ক্যাপিটালিস্ট দেশ যখন কোনো ক্যাপিটালিস্ট দেশের হাতে চলে যায়, তখন এই অধিকৃত পেছনে পড়ে থাকা দেশকেই বলা হয় ঐ অধিকারী ক্যাপিটালিস্ট দেশের 'কলোনি' বা 'উপবিবেশ'।

কলোনি কেন চাই ?

সব ক্যাপিটালিস্ট দেশেরই ক্যাপিটাল বেড়ে গিয়ে গিয়ে এমন একটা অবস্থায় এসে পড়তে হয়, তাদের দেশের বাজারে আর নিজের দেশের পণ্য বিক্রি করা সম্ভব হয় না। তখন বাধ্য হয়েই তাদের কলোনির খোঁজে বের হতে হয়। ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলোর বাজার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়াই হচ্ছে কলোনির প্রধান আবশ্যকতা। এ ছাড়া ক্যাপিটালিস্ট দেশের অন্যান্য কতকগুলো প্রয়োজনেও কলোনির আবশ্যকতা আছে।

প্রথমত, ক্যাপিটালিস্ট দেশের কারখানাগুলোর জন্য খুব সস্তা দামে কলোনি থেকে কাঁচামাল পাওয়া যায়। সস্তা দামে কাঁচামাল পেলে পণ্য তৈরির খরচও কম হয় এবং তৈরির খরচ কম হলে পণ্যের দামও কম করা যায়। আর দাম কম হলে বিক্রি বেশি হয় এবং বিক্রি বেশি হলে লাভও হয় বেশি।

দ্বিতীয়ত, ক্যাপিটালিস্ট দেশের মজুরদের জন্য সস্তা দামে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। তার ফলে মজুরদের মাইনে কম করে দেওয়া যায়। কারণ খাবার জিনিসপত্রের দাম বেশি হলে শ্রমিকদের মাইনেও বাড়াতে হয়, তা না হলে না খেয়ে মজুরেরা মারা যায়। আর খাবার-দাবার সস্তা হলে মজুরদের মাইনেও কম করে দেওয়া যায়।

তৃতীয়ত, দেশে ক্যাপিটাল খুব বেড়ে গেলে, নতুন ক্যাপিটাল খাটাবার আর সুবিধা থাকে না। নতুন কোনো কারখানা খুললেও তাতে বেশি লাভ হয় না। ক্যাপিটালের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে লাভের হারও কমে যেতে থাকে। কাজেই দেশে ক্যাপিটাল খাটানো আর লাভজনক হয় না। তখন ক্যাপিটাল

খাটাবার জন্য ক্যাপিটালিস্টরা জায়গা খুঁজতে থাকে। বস্তুত তাদের দেশের অধিকারে যে সব কলোনি থাকে, সেই সব কলোনিতেই তারা তাদের এই বাড়তি বা উদ্বৃত্ত ক্যাপিটাল খাটাবার সবচেয়ে নিরাপদ ও ভালো জায়গা পায়। কারণ ওখানে তাদেরই গভর্নমেন্ট তার সমস্ত সৈন্য সামন্ত নিয়ে তাদের ক্যাপিটাল রক্ষা করবে। অন্য কোনো জাতির কলোনিতে সে সুবিধা না-ও পেতে পারে। উদ্বৃত্ত ক্যাপিটাল খাটানোর ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার হওয়া হলো, কলোনির তৃতীয় আবশ্যকতা।

চতুর্থত, কলোনি থাকলে ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলোর বেকার সমস্যা একটু লাঘব হয়। ওদের দেশের বেকার লোকেরা কলোনিতে গিয়ে নানাভাবে যথেষ্ট আয় করতে পারে।

পঞ্চমত, কলোনি থাকলে দেশের শ্রমিকদেরও বেশ বশে রাখা যায়। এই লাভের এক অংশ দিয়ে শ্রমিকদের হাতে রাখা যায়। এর ফলে শ্রমিকরা ক্ষেপে গিয়ে দেশে কোনো গোলমাল করে না বা বিপ্লব আনে না। এই সব কারণে ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলোর কলোনির খুব দরকার। কলোনি না পেলে, উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রি হয় না। উদ্বৃত্ত মাল বিক্রি না হলে, কল-কারখানা সব বন্ধ থাকে। কল-কারখানা বন্ধ থাকলে, শ্রমিকরা বেকার থাকে। শ্রমিকরা বেকার থাকলে আর খেতে না পেলে, রেগে গিয়ে বিপ্লব করে ক্যাপিটালিস্টদের হাত থেকে গভর্নমেন্ট কেড়ে নিতে পারে ও নিজেদের গভর্নমেন্ট স্থাপন করে ক্যাপিটালিস্টদের ধ্বংস করে দিতে পারে। কাজেই কলোনি না পেলে ক্যাপিটালিজম টিকতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদের প্রথম ও প্রধান কাজই হলো কলোনিকে নিজের দেশের মালপত্র বিক্রি করার জন্য বাজার হিসেবে ব্যবহার করা। কাজেই কলোনির সাম্রাজ্যবাদী গভর্নমেন্ট কখনো কলোনিতে এমন কোনো পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি করতে দিতে চায় না, যা তাদের দেশেও তৈরি হয়। এইজন্য কলোনিতে খুব ভালো করে বর্তমান যুগের বড় বড় কল-কারখানা বসিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করার ব্যবস্থা হয় না। তাদের শুধু খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল তৈরি করতে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং ছোট খাটো কল-কারখানা কিছু করতে দেওয়া হয়। এর ফলে এবং লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে, দেশের দুর্দশার একশেষ হয়। তাদের দারিদ্র্য ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। ব্রিটেন হলো একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশ আর ভারতবর্ষ ছিলো তার একটা কলোনি। ভারতবর্ষের মানুষের দিকে আজও তাকালে বুঝতে পারবে, বিভিন্ন কলোনির মানুষের দুর্দশার কথা কতো সত্যি। তাহলে ইম্পেরিয়ালিজমের মোটামুটি একটা সংজ্ঞা আমরা এখন দিতে পারি।

কোনো ক্যাপিটালিস্ট দেশ যখনই উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির জন্য, উদ্বৃত্ত ক্যাপিটাল খাটাবার জন্য, সস্তায় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য কেনার জন্য, কোনো পেছনে-পড়ে থাকা অ-ক্যাপিটালিস্ট দেশ দখল করে নেয়, তখন সেই দখলকারী দেশকে বলা হয় 'সাম্রাজ্যবাদী দেশ'। আর যে দেশটি দখল করে নেওয়া হয়, সে দেশকে বলা হয় তার 'কলোনি', তা পূর্বেই বলেছি।

কলোনি নিয়ে যুদ্ধ

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দেশের ক্যাপিটালিস্ট যে একটু নিশ্চিন্তে বসে কলোনির লোকদের শোষণ করবে, তার অবসর তারা পায় না। আমরা আগেই দেখেছি, যে সব ক্যাপিটালিস্ট দেশের কলোনি দখলে নেই, কলোনির জন্য তারা কাতর হয়ে পড়ে। তাই ইম্পেরিয়ালিস্টদের দ্বারা অধিকার করা কলোনির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে এবং ইম্পেরিয়ালিস্টদের কাছ থেকে এই কলোনিগুলো কেড়ে নেওয়ার জন্য গোপনে গোপনে যোগাড়-যন্ত্র করতে থাকে। তারপর তাদের যোগাড়-যন্ত্র শেষ হয়ে গেলে সুযোগ বুঝে তারা ইম্পেরিয়ালিস্ট দেশগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কলোনিওয়ালা ইম্পেরিয়ালিস্ট দেশ ও কলোনিহীন ক্যাপিটালিস্ট দেশের ভেতরে তখন ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য নিয়ে দুই দেশের ক্যাপিটালিস্টরাই মানুষ খুন করার যন্ত্রপাতি কল-কৌশল আবিষ্কার করে। সেগুলোর সাহায্যে লক্ষ লক্ষ লোকের, এমনকি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে বধ করে তাদের নিরপরাধ রক্তে সবুজ পৃথিবী লাল করে দিয়ে, নিজেদের প্রচণ্ড লোভ পূরণ করতে চেষ্টা করে।

যুদ্ধ কিন্তু একবার হয়েই শেষ হয়ে যায় না। যে সব ক্যাপিটালিস্ট দেশ যুদ্ধে হেরে যায় তাদের কলোনিগুলো যারা জিতে তারা দখল করে নেয়। কিন্তু আমরা আগেই আলোচনা করেছি- কলোনি না হলে ক্যাপিটালিজম বাঁচতে পারে না। তাই হেরে গেলেও এই সব হেরে যাওয়া দেশগুলোর কলোনির দরকার দূর হয় না। কাজেই কিছুদিনের ভেতরই তারা আবার কলোনি লাভের জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। আবার যুদ্ধ হয়। এমনভাবে চলতে থাকে যুদ্ধ ও কলোনির ভাগাভাগি।

লাভের জন্য পণ্য তৈরি করাই হলো ক্যাপিটালিজমের মূলসূত্র। এই লাভের জন্য পণ্য তৈরি হয় বলেই জনসাধারণ ক্রমেই গরিব হয়ে পড়তে থাকে, আর ধনীদের পুঁজি বেড়ে যেতে থাকে। এর ফলে পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয়,

কিন্তু বিক্রি হয় না। বাজার পণ্যে বোঝাই হয়ে যায়, ব্যবসা-সংকট ও বেকার সমস্যা দেখা দেয়। ক্যাপিটালিস্টরা তখন কলোনির খোঁজে বের হয়। কলোনির লোভ থেকে সাম্রাজ্যবাদ জন্ম নেয়। সাম্রাজ্যবাদের ফলে আসে যুদ্ধ। কাজেই যুদ্ধের মূল কারণগুলি হচ্ছে উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও লাভের জন্য পণ্য উৎপাদন। এই দুইটি জিনিস যেদিন নষ্ট করা যাবে, সেদিন যুদ্ধবিগ্রহও আর থাকবে না। তা না হলে কিছুদিন অন্তর অন্তর যুদ্ধ হওয়া অনিবার্য।

[তিন]

ফ্যাসিজম বা ফ্যাসিবাদ

পুঁজিবাদের প্রহরী

তোমরা হয়তো শুনে থাকবে, গত মহাযুদ্ধের আগে ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল অবধি আর একটা যুদ্ধ হয়েছিলো। এই যুদ্ধ হয়েছিলো প্রধানত কলোনিওয়ালা ইংরেজ ও ফরাসির সঙ্গে কলোনিহীন জার্মানির। ইংরেজ ও ফরাসীরা জয়লাভ করবে এই ভেবে রুশদেশ ও ইতালি কলোনির আশায় তাদের দলে যোগ দেয় এবং তুরস্ক যোগ দেয় জার্মানির দলে। যুদ্ধের শেষের দিকে আমেরিকা এসে যোগ দিয়েছিলো ইংরেজ ও ফরাসিদের দলে। যুদ্ধে জার্মানি হেরে যায়। তার সব কলোনিগুলো ইংরেজ ও ফরাসিরা ভাগবাটোয়ারা করে নিয়ে নেয়। ইটালীর ভাগে বিশেষ কিছুই দেওয়া হয় না এবং রুশ দেশে তখন বিপ্লব হয়ে ক্যাপিটালিস্টদের হাত থেকে ক্ষমতা শ্রমিকদের হাতে চলে যাওয়াতে, রুশদেশকে 'ভদ্র' ক্যাপিটালিস্ট সমাজ থেকে বিতাড়িত করা হয়। এইরূপে ইতালি ও জার্মানি প্রায় কলোনিহীন দেশই থেকে যায়।

কিন্তু যুদ্ধের পর থেকেই ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলোতে ভাঙ্গন লাগে। যুদ্ধের পরই আরম্ভ হয় ব্যবসা-সংকট। হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। কলোনিওয়ালা ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলো কলোনি থাকায় অবস্থা কতকটা সামলে নেয়। কিন্তু কলোনিহীন ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলোতে দুর্দশার চরম হতে থাকে। ইটালীতে শ্রমিকরা ক্ষেপে গিয়ে কল-মালিকদের তাড়িয়ে দিয়ে কল-কারখানা অধিকার করে বসে। শ্রমিকদের এই আন্দোলন দেখে ক্যাপিটালিস্টরা ঘাবড়ে যায়। তারা তখন শ্রমিকদের জব্দ করে নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য উঠে

পড়ে লাগে। এই কাজের জন্য একজন উপযুক্ত লোকের সন্ধানও তারা পায়। তার নাম মুসোলিনী।

মুসোলিনী আগে শ্রমিকদেরই একজন নেতা ছিলো। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হলে নিজে ক্যাপিটালিস্টদের পক্ষে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং শ্রমিকদেরও যুদ্ধে যোগ দিতে বলে। এর ফলে শ্রমিক দল থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধ থেকে এসে কী করবে সে ভাবছিলো, এমন সময় শ্রমিকদের আক্রোশ থেকে ক্যাপিটালিস্টদের রক্ষার ভার তার উপর এসে পড়ে। সে তখন শ্রমিকদের জব্দ করার জন্য একটা দল তৈরি করে। এই দলের নাম হলো 'ফ্যাসিস্ট' দল। দেশের সকল ধনী এই দলকে সাহায্য করতে থাকে। এর ফলে কিছুদিনের ভেতরেই ফ্যাসিস্ট দল বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু শ্রমিকরা এই ফ্যাসিস্ট দলকে শায়েস্তা করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলো না। তাদের নেতারা নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য শ্রমিকদের একসঙ্গে মিলিত করে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ করলো না। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের ভেতর গোলমাল করেই তারা নিজেদের শক্তি ক্ষয় করলো। ফলে ফ্যাসিস্টরা অনায়াসে শ্রমিকদের পরাজিত করে দিলো। ফ্যাক্টরি থেকে শ্রমিকদের বিতাড়িত করে দিলো, শ্রমিকদের দলগুলোকে জোর করে ভেঙ্গে দিলো, তাদের শ্রমিক সংঘ বা ট্রেড ইউনিয়নগুলোও ভেঙ্গে দিলো এবং শ্রমিকনেতাদের কাউকে মেরে ফেললো, কাউকে জেলে পুরে দিলো, কেউ বা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচলো। এইরূপে অত্যন্ত নৃশংসতার সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনকে পরাজিত করে ফ্যাসিস্টরা ধনিকশ্রেণীর আশীর্বাদ লাভ করলো এবং ধনিকশ্রেণীর সম্পত্তি রক্ষার পাহারাদার হিসেবে ধনীরা তাদের হাতে দেশের গভর্নমেন্ট তুলে দিলো।

মুসোলিনী ফ্যাসিস্ট দলের নেতাদের নিয়ে 'ফ্যাসিস্ট গ্রান্ড্ কাউন্সিল' নামে এক বৈঠক গঠন করে, তাদের সাহায্যে দেশের একচ্ছত্র শাসক হয়ে গেল। শ্রমিক-আন্দোলন যাতে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে এবং কৃষকদের ভেতরও যাতে অসন্তোষ বেড়ে না যায়, তার জন্য কল মালিকদের ও জমিদারদের আওতায় কতকগুলো সঙ্ঘ করে ফ্যাসিস্টদের তার ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। এই সঙ্ঘগুলোর নাম দেওয়া হলো 'করপোরেশেন'। এই করপোরেশন তৈরি করে দেশ থেকে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করার একটা বন্দোবস্ত করা হল।

শ্রমিক-বিপ্লব থেকে ক্যাপিটালিস্টদের বাঁচানো হলো ফ্যাসিজমের প্রথম কাজ। আর কলোনিহীন দেশগুলোতে ফ্যাসিজমের দ্বিতীয় কাজ হলো কলোনি আদায় করা। আমরা আগে দেখেছি, কলোনি না হলে ক্যাপিটালিজম বাঁচতে পারে না। কলোনি না পেলে ব্যবসা-সংকট দেখা দেয়, হাজার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যায়, শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবশেষে শ্রমিকরা ক্ষেপে গিয়ে ক্যাপিটালিস্টদের হাত থেকে গভর্নমেন্ট কেড়ে নিয়ে উৎপাদন যন্ত্রগুলো তাদের নিজেদের করে নেয়। এই জন্য কলোনি না হলে ক্যাপিটালিজম বেশিদিন টিকতে পারে না। ফ্যাসিস্টরা যদিও শ্রমিক-আন্দোলন জোর করে ভেঙ্গে দিলো, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন যার জন্য সৃষ্টি হয় সেই মূল কারণ দূর করতে পারলো না। সেই মূল কারণ হচ্ছে, ক্যাপিটালিজম এবং ফ্যাসিবাদের সৃষ্টি হয়েছিলো শ্রমিক আক্রমণ থেকে ক্যাপিটালিজমকে রক্ষা করার জন্য। কাজেই ক্যাপিটালিজমের যতো সব সমস্যা তা এতে কিছুমাত্র দূর করা গেল না। ফ্যাসিস্টরা তখন কলোনির খোঁজে বের হলো।

আমরা আগেই দেখেছি, কলোনি থাকলে এই সব সমস্যা অন্তত কিছুদিনের জন্য সমাধান করা যায়। কিন্তু গোলাকার পৃথিবী তো আর সীমাহীন নয় যে, নতুন দেশ খুঁজলেই পাওয়া যাবে। কলোনির উপযুক্ত যে সব দেশ ছিলো, তা ইংরেজ ও ফরাসিরা ইতিমধ্যেই দখল করে নিয়েছিলো। কাজেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়া আর গতি ছিলো না। সুতরাং 'যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও' এটাই হলো ফ্যাসিস্টদের মূলমন্ত্র। দেশকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করাই হলো তাদের দ্বিতীয় কাজ।

এই উদ্দেশ্যে তারা যুদ্ধের জয়গান গাইতে শুরু করলো। ১৯১৪-১৯১৮ সালের যুদ্ধের নৃশংসতা ও বর্বরতা দেখে মানুষের মনে যুদ্ধের প্রতি একটা আন্তরিক ঘৃণা জন্মে গিয়েছিলো। সেই ঘৃণার ভাব দূর করে যুদ্ধের জন্য তাদের আবার ক্ষেপিয়ে তুলবার জন্য ফ্যাসিস্টরা প্রাণপণে প্রচার কাজ আরম্ভ করলো। খুব ছোট ছোট ছেলেদের যুদ্ধ-ভাবাপন্ন করে তোলার জন্য স্কুল থেকেই তাদের শেখানো হতে লাগলো- যুদ্ধ মানুষকে সভ্য করে, শান্তি মানুষকে অমানুষ করে দেয়। দেশের জন্য (অর্থাৎ কলোনির জন্য) যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়ার মতো গৌরবময় মৃত্যু আর হতে পারে না ইত্যাদি। সব জায়গায় যুবকদের যুদ্ধ শেখানো হতে লাগলো। কল-কারখানায় যুদ্ধের গোলা-বারুদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র বেশি করে তৈরি করা শুরু হলো।

নাৎসীবাদ

ইতালিতে যে যে কারণে ফ্যাসিজম দেখা দিয়েছিলো, ঠিক সেই সেই কারণেই জার্মানিতেও ফ্যাসিজম দেখা দিলো। শুধু এখানে ফ্যাসিজম, ফ্যাসিজম নাম না নিয়ে নাৎসীজম নাম নিলো। কিন্তু ফ্যাসিজম ও নাৎসীজমের ভিতর আসল ব্যাপারে কোনো রকম বিভিন্নতা নেই। নাৎসীবাদ শুধু ফ্যাসিবাদ থেকে আরো বেশি উগ্র, আরো বেশি নৃশংস।

১৯১৮ সালে যুদ্ধের শেষের দিকেই জার্মানির শ্রমিকরা যুদ্ধের অসহ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ করে। কিন্তু কয়েকজন শ্রমিকনেতার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এবং ইংরেজ ও ফরাসী ক্যাপিটালিস্টদের চাপে শ্রমিকদের হাতে ক্ষমতা না এসে ক্যাপিটালিস্টদের হাতেই থেকে যায়। ক্যাপিটালিজম টিকে যাওয়ার ফলে জনসাধারণের দারিদ্র্য বৃদ্ধি, ব্যবসা-সংকট, অবিক্রিত মালে বাজার বোঝাই, বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি সকল লক্ষণগুলোই প্রকাশ পেতে থাকে। এর উপরে আবার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেক টাকা বছরে বছরে ইংরেজ ও ফরাসীরা আদায় করে নেওয়ায় জনসাধারণের দুর্দশা আরো বেড়ে যায়। জার্মানির কোনো কলোনি না থাকায়, এই সব সমস্যার আংশিক সমাধানও সম্ভব হয় না। জনসাধারণের ভেতর অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। এসবের উপরে আবার মরার উপর খাঁড়ার ঘার মতো ১৯৩১ সালের প্রচণ্ড ব্যবসা-সংকট এসে জার্মানির লোকদের দুর্দশা সেবার চরমে ওঠায়। চারিদিকে অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শ্রমিকরা এই দুর্দশা হতে বাঁচার উপায় হিসেবে ক্যাপিটালিজমের ধ্বংস দাবি করে। ক্যাপিটালিস্টরা দাবি করে কলোনি, আর চায় শ্রমিক-আন্দোলনের ধ্বংস হোক। শ্রমিক ও ধনিকের সংঘর্ষ তখন তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে। ধনিকশ্রেণী হিটলারের দলবলের ভিতর তাদের পরিত্রাণ দেখতে পায়।

যুদ্ধে হেরে গিয়ে হিটলার 'নাৎসী' বা 'জাতীয় সোস্যালিস্ট' নাম দিয়ে একটি দল বানায়। ১৯৩১ সাল অবধি জার্মানির ক্যাপিটালিস্টরা দেখলো যে, শ্রমিকরা যে রকম সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাতে শ্রমিক-আন্দোলন শীঘ্র ধ্বংস করে না দিলে তাদের আর রক্ষা নেই। তাই হিটলারের দলকে তারা সাহায্য করতে লাগলো। শোনা যায়, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ক্যাপিটালিস্টরাও হিটলারকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছিলো, যাতে জার্মানিতে শ্রমিকরা ক্ষমতা লাভ না করতে পারে। এইসব সাহায্যের ফলে হিটলারের নাৎসীদল বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে

লাগলো। শ্রমিকরা কিন্তু তাদের এ বিপদের কথা বুঝতে পারলো না।

জার্মানিতে তখন দুটো বড় শ্রমিক দল ছিলো। একটার নাম 'সোস্যাল ডেমোক্রাটিক' দল ও অপরটার নাম 'কমিউনিস্ট' দল। সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দল ক্যাপিটালিজম একেবারে ধ্বংস করে না দিয়ে, তার সঙ্গে রফা করে ধীরে ধীরে শ্রমিকদের ক্ষমতা বাড়াবার পক্ষপাতী ছিলো। অন্যদিকে কমিউনিস্টরা ক্যাপিটালিস্টদের ধ্বংস করে দিয়ে শ্রমিক গভর্নমেন্ট স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলো। এই নিয়ে এ দু' দলে ঝগড়াঝাটি লেগেই ছিলো। কিন্তু এর ফল হলো খুব খারাপ। শ্রমিকরা বিভক্ত হয়ে রইলো। এদিকে ক্যাপিটালিস্টরা ক্রমেই নাৎসী দলে সঙ্ঘবদ্ধ হতে লাগলো। কিন্তু যতোই সঙ্ঘবদ্ধ হোক, দেশে ক্যাপিটালিস্ট থাকে আর ক'জন? কাজেই তারা অন্যান্য শ্রেণীর সহযোগিতা না পেলে এবং শ্রমিকের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করে দিতে না পারলে, বিশেষ কিছু করতে পারে না। সুতরাং অন্যান্য শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য চালাক হিটলার তার দলের প্রোগ্রামের ভেতর সব শ্রেণীর লোকের দাবি-দাওয়া কিছু কিছু ঢুকিয়ে নিলো। যেমন কৃষকদের তুষ্ট করবার জন্য বললো, 'কৃষকদের ফসলের উপযুক্ত দাম দিতে হবে', 'কৃষকদের সুদের হার কম করে দিতে হবে।' শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করবার জন্য বললো, 'ক্যাপিটালিজমের বিরোধিতা করতে হবে।' ছোট ছোট দোকানদারদের হাত করবার জন্য বললো, 'বড় ব্যবসায়ীদের ক্ষমতা লোপ করতে হবে' ইত্যাদি। এছাড়া প্রত্যেক জার্মান-ই ভার্সাই সন্ধিপত্রের (গত ১৯১৪-১৯১৮ এর যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে ইংরেজ ও ফরাসিদের সঙ্গে জার্মানি যে সন্ধি করে) বিরুদ্ধে মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করতো। হিটলার তাই ভার্সাই সন্ধিপত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে লাগলো। ইহুদীদের বিরুদ্ধে ইউরোপের লোকের অনেকদিন থেকে ঘৃণাভাব ছিলো, সেই ঘৃণাভাবটাকেও কাজে লাগালো।

হিটলার প্রচার করতে লাগলো- দেশের যতো দুঃখ-দুর্দশা তার কারণ ভার্সাই-সন্ধি, ইহুদী ও কমিউনিস্টরা। এমনি করে জনসাধারণের রাজনৈতিক অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ভাঙ্গিয়ে নাৎসীরা দলে লোক সংগ্রহ করতে লাগলো। ১৯১৯ সালের পর থেকে জার্মান আইন-সভার প্রত্যেক নির্বাচনে হিটলারের নাৎসী দলের ও কমিউনিস্টদের ভোট সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো। এর থেকে বোঝা যায়, সে সময় ধনিক ও শ্রমিকের ঝগড়া অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠছিলো এবং জার্মানির প্রত্যেকেই হয় ধনীর দিকে কিংবা শ্রমিকের দিকে যোগ দিচ্ছিলো। দেশের শ্রেণীসংগ্রাম যখন এইরকম তীব্র হয়ে উঠলো তখন জার্মানির ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণী হিটলারের হাতে দেশের শাসনভার ছেড়ে দিলো।

নাৎসীবাদের কাজ

হিটলার শাসনভার পেয়েই তার প্রথম কাজ শ্রমিক-আন্দোলন ধ্বংস করতে লেগে গেল। শ্রমিক নেতাদের ধরে বিনা বিচারে 'কনসেনট্রেশান ক্যাম্প' নামক এক রকম জেলখানায় আটক করে রাখলো এবং অনেককে গোপনে হত্যা করালো। শুধু যে শ্রমিক নেতারাই মারা বা ধরা পড়লো- তা নয়, যারা নাৎসীদের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করলো, তারাও বিপদগ্রস্ত হলো। নাৎসী গুণ্ডারা দলে দলে গিয়ে তাদের বাড়ির ভেতর ঢুকে তাদের উপর অত্যাচার করতে লাগলো। ইহুদীদের উপর এই অত্যাচার অসম্ভব রকম হিংস্র হয়ে উঠেছিলো। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন পালিয়ে নাৎসীদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচালেন। এমনি যারা পালাতে পারলো, তারা বাঁচলো। যারা পারলো না, তাদের ধরে অত্যাচার করতে করতে মেরে ফেলা হলো। এই রকমভাবে অত্যাচার করে হিটলার তার বিরুদ্ধ পক্ষের সব দলগুলোকে ধ্বংস করে নাৎসীদলের একাধিপত্য বিস্তার করলো। ফ্যাসিজমের যে প্রথম কাজ- অর্থাৎ শ্রমিক-আন্দোলনকে ধ্বংস করে ক্যাপিটালিজমকে নিরাপদ করা, তা এই রকম নিষ্ঠুরতার ভেতর দিয়ে সাধিত হলো।

প্রথম কাজ শেষ করে নাৎসীরা এবার ফ্যাসিজমের দ্বিতীয় কাজে লেগে গেল। অর্থাৎ কলোনি আদায় করে নেবার বন্দোবস্ত করতে লাগলো। কলোনি আদায় করতে গেলেই যুদ্ধের দরকার হয়। কাজেই জার্মান জাতিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার কাজে নাৎসীরা উঠে-পড়ে লেগে গেল। একদিকে যেমন দ্রুত যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদ তৈরি করাতে লাগলো, তেমনি লোকের মন যুদ্ধের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলবারও চেষ্টা করতে লাগলো।

ইতালির ফ্যাসিস্টদের মতো জার্মানির নাৎসীরা যুদ্ধের মহিমা-কীর্তন ছাড়াও আর এক মতবাদ আবিষ্কার করলো। এই মতবাদ অনুযায়ী তারা প্রত্যেক জার্মানকে শেখাতে লাগলো, 'জার্মান জাতি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জাতি এবং সব জাতির উপর প্রভুত্ব করবার জন্যই জার্মান জাতির সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং জাতির এই গৌরবময় কাজের জন্য প্রাণ দিতে হবে।' সহজ কথায় 'প্রাণপণে যুদ্ধ করে জার্মান ক্যাপিটালিস্টদের জন্য কলোনি আদায় করে দাও'–এই হলো নাৎসী শিক্ষার মূলমন্ত্র। এমনিভাবে তারা দেশকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলো। অন্ধ ও উগ্র দেশপ্রেমই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির খোরাক যোগালো। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত যুবকরা এই অন্ধ দেশপ্রেমের বুলিতে সাড়া

দিলো এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে ধনিকদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়লো। তারা ভেবে দেখলো না, দেশপ্রেম মানে অপরের দেশপ্রেমকে আঘাত করে অপরের দেশ দখল করা নয়।

খাঁটি দেশপ্রেম মানে স্বাধীনতা। এক দেশের স্বাধীনতা নষ্ট করে দিয়ে আরেক দেশের স্বাধীনতা কখনও সম্ভব হয় না। যারা নিজের দেশকে বড় করতে গিয়ে অপর দেশকে ছোট করে দেয়, অন্য জাতির স্বাধীনতা নষ্ট করে দেয় এবং অন্য দেশের লোকদের উপর অযথা অত্যাচার করে, তারা কখনো স্বাধীনতাকে সম্মান করে না। তারা আসলে নিজের দেশের লোকদের স্বাধীনতা মুখেই স্বীকার করে, কাজে স্বীকার করে না। কিন্তু এতো সব কথা জার্মান যুবকরা ভেবে দেখলো না। তারা অন্ধ দেশপ্রেমের ভ্রান্ত আহ্বানে উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফলে, স্বাধীনতা তারাও পেল না। স্বাধীনতার টুঁটি টিপে ফ্যাসিস্টরা তাকে ধ্বংস করলো। আর সাম্রাজ্যবাদের যুপকাষ্ঠে স্বাধীনতার নাম করে, দেশের নাম করে এই সব আদর্শনিষ্ঠ বিভ্রান্ত যুবকদের বলি দেওয়া হলো।

জাপানেও জাপানি মার্কা ফ্যাসিবাদ স্থাপিত হলো একই ভাবে এবং এই তিন কলোনিহীন রাজ্যের মধ্যে গভীর মিতালী স্থাপিত হলো, যাতে করে তারা পরস্পরকে কলোনি আদায়ের কাজে সাহায্য করতে রাজি হলো। এমনিভাবে আয়োজন শেষ করে তার যুদ্ধ আরম্ভ করলো। গত মহাযুদ্ধ এমন করেই আরম্ভ হয়।

ফ্যাসিজম কি জয়ী হয়?

আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি, ফ্যাসিজম ইতালি, জার্মানি ও জাপানে একই কাজের জন্য স্থাপিত হয়েছিলো। অবস্থা বিশেষে সামান্য রকমফের অবশ্য ছিলো, কিন্তু আসলে তারা ছিলো সব একই পন্থার পন্থী। আমরা দেখেছি, ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ঝগড়া যখন খুব বেড়ে যায়, তখনই ধনিকশ্রেণী খোলাখুলিভাবে ফ্যাসিস্ট রূপ নেয় এবং শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করার চেষ্টা করে। যদি শ্রমিকশ্রেণী দ্বিধা-বিভক্ত থাকে, তবে সহজেই ক্যাপিটালিস্টরা শ্রমিকদের হারিয়ে দেয় এবং নিজেদের একাধিপত্য স্থাপন করে।

ফ্যাসিজমের উৎপত্তির দুটো কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রথমত, শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকশ্রেণীর ভেতর একতার অভাব। আর, ফ্যাসিজমের কাজও হলো দুটো। প্রথম কাজ, শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করে বিপ্লবের হাত থেকে ক্যাপিটালিজমকে বাঁচানো এবং দ্বিতীয় কাজ, যুদ্ধ করে কলোনি আদায়ের চেষ্টা করা। সুতরাং ফ্যাসিবাদকে ক্যাপিটালিজম থেকে ভিন্ন করে দেখলে ভুল করা হবে। ক্যাপিটালিজম এক বিশেষ অবস্থায় এসে ফ্যাসিবাদের রূপ ধারণ করে মাত্র। ফ্যাসিজম ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে তো নয়ই বরং ক্যাপিটালিজমকে বাঁচানোর জন্যই এর সৃষ্টি। শ্রমিক বিপ্লবের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেবার জন্য এবং কলোনি আদায়ের জন্য ক্যাপিটালিজমের যে নগ্ন রূপ, তাকেই আমরা ফ্যাসিজম বলতে পারি।

ফ্যাসিজমের ভবিষ্যৎ কী? ফ্যাসিজমের উৎপত্তির কারণ যদি ভালো করে বুঝে থাকো– তবে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হবে না। পুঁজিবাদ যে সকল মূল সমস্যা সৃষ্টি করে (যেমন ব্যবসা-সংকট, বেকার ইত্যাদি) তার কোনো সমাধান করতে না পেরে পুঁজিবাদই ফ্যাসিবাদের রূপ নেয়। কিন্তু ফ্যাসিবাদও কি এই সকল সমস্যা সমাধান করতে পারে? না, পারে না। কারণ ফ্যাসিবাদীরা এই সকল সমস্যা সমাধান করবার জন্য যুদ্ধ করে কলোনি আদায়ের চেষ্টা করে। তারা ভাবে, কলোনি পেলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এ রকমভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় দু'দিক থেকে বিপদ আছে।

প্রথমত, যদি যুদ্ধে হেরে যায়, তবে সমস্যার সমাধান তো হয়ই না, বরং উল্টো শ্রমিক বিপ্লব হয়ে দেশে ফ্যাসিবাদের গোড়াশুদ্ধ উপড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। যুদ্ধের ফলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট অসম্ভব বেড়ে যায়। যতোদিন অবধি ফ্যাসিস্টরা যুদ্ধে জিততে থাকে ততোদিন ফ্যাসিস্ট দেশের লোকেরা ভাবে, দেশের গৌরব হচ্ছে এবং কলোনি পেলেই ভবিষ্যতে তাদের দুঃখ ঘুচবে, এইসব ভেবে সব দুঃখ কষ্ট তারা সহ্য করে। কিন্তু যুদ্ধে হারতে আরম্ভ করলেই এ আশায় ছাই পড়ে। অপরের দেশ জয় করাকে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেম বলে ভাবতো, তারাও মুষড়ে পড়ে। চারিদিকে হতাশার ভাব ছড়িয়ে পড়ে। ভবিষ্যতের স্বর্গ চুরমার হয়ে যাওয়াতে বর্তমানের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার আগ্রহ কারো দেখা যায় না। সুযোগ বুঝে শ্রমিক শ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহ করে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করবার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধে যদি ফ্যাসিবাদীরা জিতেও যায়, তাহলেও বেশিদিন সুখে রাজত্ব করা ও কলোনির মানুষকে শোষণ করার সুবিধা ভোগ করতে পারে না। একদিকে কলোনির মানুষের স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হতে থাকে,

অন্যদিকে আবার কলোনির বাজারও শীঘ্র ফ্যাসিবাদী দেশের উৎপাদিত পণ্যে বোঝাই হয়ে যায়। ফলে আবার ব্যবসা-সংকট উপস্থিত হয়, আবার লোক বেকার হয়ে যেতে থাকে এবং পুঁজিবাদী আমলের সকল সমস্যাই গুরুতর আকারে দেখা দেয়। সেই সব সমস্যা সমাধান করতে না পারায় কলোনিতে এবং ফ্যাসিবাদী দেশেও শ্রমিক বিপ্লব দেখা দেয়। এই বিপ্লবের ধাক্কায় ফ্যাসিবাদী প্রথা ভেসে যায়।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছো, ফ্যাসিবাদী প্রথা সমাজে বেশিদিন টিকতে পারে না। তাই বলে ক্যাপিটালিজম বা ইম্পেরিয়ালিজম যে থেমে থাকে তাও নয়, তার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সে করেই চলে। আবার নতুন করে অন্য নামে অন্য অজুহাতে শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে নিজের শোষণ অব্যাহত রাখতে সে চেষ্টা করে। এসব আমরা পরে দেখতে পাবো।

[চার]

সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ

আদিম কমিউনিজম (আদিম সাম্যবাদ)

পৃথিবীর কোনো কিছু স্থির থাকে না, সবই বদলে যায়। তেমনি আজকে যে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে ক্যাপিটালিস্টজম দেখছো এমনটি চিরকাল ছিলো না। একদিন ছিলো, যখন মানুষ সবেমাত্র পশুত্বের ধাপ থেকে মানুষের ধাপে পা দিয়েছে। তখন মানুষ উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার কাকে বলে, এই ব্যক্তিগত লাভের জন্য কী করে জিনিসপত্র তৈরি হয়, তা কিছুই জানতো না। সেই আদিম যুগে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে থাকতো। পরস্পরের ভেতর যাদের রক্তের যোগাযোগ ছিলো, তারা এক একটা দল গঠন করে একসঙ্গে বাস করতো। এই দলগুলোকে বলা হয় 'গোষ্ঠী' বা 'ট্রাইব'।

ট্রাইবের সামান্য যা উৎপাদন যন্ত্র, তীর-ধনুক, লাঠি-সোঁটা, তাতে ট্রাইবের সকলের অধিকার ছিলো এবং তাই দিয়ে একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে শিকার করে এবং গাছের ফলমূল আহরণ করে যা পেতো, তা সবাই এক সঙ্গেই ভোগ করতো। এমনি করে বনে বনে ঘুরে তাদের জীবন কেটে যেতো। এ রকম অবস্থায় থাকলে উৎপাদন-যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার বা ব্যক্তিগত লাভের জন্য

উৎপাদন সম্ভব হয় না। তাই তারা সবাই একসঙ্গে থাকতো, এক সঙ্গে যা কিছু আয় করতো এবং একসঙ্গে তা ভোগ করতো। এই জন্যে মানুষের এই অবস্থাকে বলা হয় **আদিম কমিউনিজম (Primitive Communism)**।

আদিম কমিউনিজম বেশিদিন টিকলো না। মানুষ নানারকম যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করলো, যাতে করে তাদের জীবনযাত্রা অনেকটা সহজ হয়ে এলো। তারা পশুপক্ষী পোষ মানাতে শিখলো, গাছ-পালাও পোষ মানিয়ে নিলো অর্থাৎ চাষ-বাস শিখলো। এর ফলে আর বনে বনে মাংস ও ফলমূলের জন্য ঘুরে বেড়াবার দরকার হলো না। এক জায়গায় বসেই সব পেল। কাজেই মানুষ তখন ভালো জায়গা দেখে বসতি করলো ও ঘরবাড়ি বাঁধলো। জায়গায় জায়গায় গ্রাম গড়ে উঠলো। এই অবস্থার প্রথম দিকেও পশু-পক্ষী, জায়গা-জমি ও অন্যান্য উৎপাদন যন্ত্রের অধিকারী ছিলো সবাই। সবাই মিলেই আবশ্যক জিনিসপত্র তৈরি করতো এবং ভোগ করতো। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের ভেতর **'শ্রম-বিভাগ'** এসে দেখা দিলো। অর্থাৎ এক একটা কাজ সবাই মিলে না করে এক-একজন করে বা কয়েকজন করে ভাগ করে দেওয়া হলো। কারণ দেখা গেল যে, এক এক জনকে শুধু এক একটা কাজ দিলে, সে কাজটা সে খুব ভালো করে করতে পারে। কারণ একই কাজ নিয়ে পড়ে থাকে বলে সেই কাজে সে খুব দক্ষতা লাভ করে। আর এই রকম করে সমাজের সব কাজগুলোই খুব ভালোভাবে হয়ে যায়।

শ্রম-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়ও আরম্ভ হয়। প্রথম এই ট্রাইবের যা বেশি কিছু জিনিস উদ্বৃত্ত থাকতো, তা অন্য ট্রাইবের উদ্বৃত্ত জিনিসপত্রের সঙ্গে অদল-বদল করা হতো। শেষে এই কাজের ভারও পড়লো কয়েকজন বিশেষজ্ঞের উপর। তারা অন্য ট্রাইবগুলোর সম্বন্ধে সব খবরাখবর জানতো। ধীরে ধীরে সমাজের লোকসংখ্যাও খুব বেড়ে যেতে লাগলো। তাই সমাজের জিনিসপত্র তৈরির ক্ষমতা খুব বেড়ে গেল। উৎপাদন-যন্ত্রে সকলের অধিকার আর রাখা গেল না। ব্যক্তিগত অধিকার এসে দেখা দিলো। এমনি করে আদিম কমিউনিজমের যুগ শেষ হয়ে গেল। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারের যুগ প্রতিষ্ঠা হলো।

ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব

সম্পত্তি যখন ব্যক্তিগত অধিকারে এসে গেল, তখন ধীরে ধীরে সমাজে নানারকম শ্রেণী দেখা দিলো। এর আগে আদিম কমিউনিজমের আমলে কিন্তু সমাজে শ্রেণী বলে কিছু ছিলো না। তখন সমাজের সকলের অবস্থাই এক রকম

ছিলো। উৎপাদন-যন্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার ছিলো, কাজেই শ্রেণী বলে কিছু ছিলো না।

আদিম কমিউনিস্ট সমাজে ট্রাইবের লোকেরা নিজেদের ভেতর ঝগড়াঝাটি করে যাতে তারা দুর্বল হয়ে না পড়ে এবং বাইরের শত্রুর সঙ্গে ভালোভাবে যুদ্ধ করতে পারে এবং শিকার বা কৃষিকাজ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে, তার জন্য তারা তাদের ভেতরের একজনকে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ দেখে নেতা বা সর্দার হিসেবে মেনে নিতো এবং তার নির্দেশ মতো সব কাজ করতো।

যতোই দিন যেতে লাগলো ততোই এই আদিম সমাজের মানুষদের অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগলো এবং তারা কৃষি কাজে, পশুপালনে ও বন্যপ্রাণী শিকারে নানা রকম নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করে তাদের উৎপাদন শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে ফেলতে পারলো। নানা প্রকার গাছ গাছড়ার রোগ সারাবার ক্ষমতাও তারা আবিষ্কার করলো। ফলে তাদের আয়ু বেড়ে গেল এবং লোকসংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগলো।

লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ট্রাইবের যুদ্ধবিগ্রহও বেড়ে গেল। খাদ্যশস্য বেশি উৎপাদিত হতো বলে একদল লোক স্থায়ীভাবে সৈন্য সামন্তের কাজে নিয়োজিত হলো। চাষবাস বা শিকারের কাজ থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হলো। এই সৈন্যদল স্থায়ীভাবে সর্দারদের নেতৃত্বে চালিত হতে লাগলো। সর্দাররা এই সৈন্যদলের সাহায্যে নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখলো। এই সঙ্গে যখন জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার এসে গেল, তখন এই সর্দারশ্রেণী পাকাপাকিভাবে নিজেদের রাজত্বের গদিতে বসালো।

প্রথম প্রথম ট্রাইবের সব পরিবারগুলোই একসঙ্গে জমিতে চাষবাস করতো বা শিকার করতো। ক্রমে ক্রমে যতোই তাদের সমাজে শ্রমবিভাগ হতে লাগলো, ততোই জমিতেও ভাগাভাগি করে প্রত্যেক পরিবারকে এক এক টুকরো জমি দেওয়া হতো। প্রত্যেক ২/৩ বছর অন্তর অন্তর এই সব জমি আবার বন্টন করা হতো, যাতে কেউ বরাবরই ভালো জমি না পায়। যখনই কোনো ট্রাইব সর্দারের নেতৃত্বে অন্য কোনো ট্রাইবকে যুদ্ধে পরাস্ত করে, তাদের জমা-জমি কেড়ে নিতে পারতো, তখনই তাদের ভালো ভালো জমিগুলো সর্দার ও তার সাগরেদরা ভাগাভাগি করে বরাবরের জন্য দখল করে নিতো এবং পরাজিত ট্রাইবের লোকদের 'দাস' করে তাদের দিয়ে চাষবাস করাতো। তখন থেকে সর্দাররা শুধু সমাজে শাসনের কাজ করতে লাগলো। এইভাবে সমাজ তিনটে শ্রেণীতে ভাগ হয়ে গেল। সর্দার বা রাজা অর্থাৎ সামন্তশ্রেণী। এরা হলো বেশির ভাগ জমির মালিক। এদের কর বা ফসলের ভাগ দিয়ে জমি চাষ করার

অধিকার পেল দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সাধারণ চাষী শ্রেণী এবং তৃতীয় শ্রেণী হলো দাস শ্রেণী, যারা শুধু পরের দাসত্ব করতো।

সামন্ত রাজাদের ভেতর আবার কেউ কেউ খুব শক্তিশালী হয়ে আশেপাশের সব দেশ দখল করে নিয়ে নিজের রাজ্য বাড়িয়ে ফেলতো। এইভাবে ইউরোপে, এশিয়ায় ও আফ্রিকায় কয়েকটা বড় বড় দেশের বা সাম্রাজ্যের পত্তন হলো। এভাবে সামন্ত রাজাদের উপর আবার একজন বড় রাজা বা সম্রাট হলো এবং তার নামেই রাজ্য শাসন চলতে লাগলো। এই ভাবে সামন্তযুগের উৎপত্তি হলো।

শ্রেণী ও রাষ্ট্র

এইরূপ সম্পত্তিতে অধিকার এসে গেল, তখন থেকেই সমাজে প্রথম শ্রেণী দেখা দিলো। উৎপাদন-যন্ত্রে কার কতোখানি অধিকার বা কার কতখানি উৎপাদন যন্ত্র বা সম্পত্তি তাই দিয়ে কে কোন্ শ্রেণীতে থাকবে– তা ঠিক হয়। একদল লোক হলো– যাদের কোনো সম্পত্তি থাকলো না, বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো তাদের শারীরিক পরিশ্রম। তারা গতর খাটিয়ে কিছু আয় করে বেঁচে থাকলো। আর একদল লোক হলো ঠিক এর উল্টো, তারা এতো সম্পত্তির মালিক হলো যে, তাদের আর পরিশ্রম করার দরকারই হলো না, সম্পত্তি থেকেই তারা প্রচুর আয় করতে লাগলো এবং অপরের পরিশ্রমের উপরেই এরা বেঁচে রইলো পরগাছার মতো। এর মাঝামাঝি আবার অনেকগুলো শ্রেণী হলো যাদের আয় কিছু সম্পত্তি থেকে হতো আর কিছুটা পরিশ্রম করে। এমনিভাবে নানা শ্রেণী গজিয়ে সমাজ ভাগ ভাগ হয়ে গেল।

যারা প্রচুর সম্পত্তির মালিক হলো, তারা তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য **'রাষ্ট্র' (State)** নামে একটা সংগঠন সৃষ্টি করলো। রাষ্ট্রের কাজ হলো দু' রকম। এক, সমাজে যাদের উৎপাদন-যন্ত্রে কোনো অধিকার নেই, সেই সব সম্পত্তিহীন লোকদের আক্রমণ থেকে উৎপাদন যন্ত্র রক্ষা করা এবং এই উৎপাদন যন্ত্র যাতে মালিকদের জন্য চালু থেকে লাভ সৃষ্টি করে তার ব্যবস্থা করা। দুই, বিদেশের আক্রমণ থেকে সম্পত্তিওয়ালাদের সম্পত্তি বাঁচানো। এই কাজ করার জন্য রাষ্ট্র দু'রকম ব্যবস্থা করে। এক, উৎপাদন যন্ত্র যাতে সম্পত্তিওয়ালাদের হাত-ছাড়া না হয়ে যায় এবং ঠিকমতো তাদের লাভের জন্য চালু থাকে তার উদ্দেশ্যে 'আইন' তৈরি করে। আর এই আইন যাতে ঠিকমতো কাজে লাগে

এবং সবাই মেনে চলে, সৈন্য, পুলিশ, গুপ্তচর, বিচার, জেল প্রভৃতি রেখে তারও ব্যবস্থা করে। উৎপাদন যন্ত্র ঠিকমত চালু রাখতে হলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ভালো থাকা চাই। তার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য রাষ্ট্র স্বাস্থ্য বিভাগ খোলে। শ্রমিকদের খানিকটা শিক্ষাও দেওয়া দরকার, তার জন্য শিক্ষা বিভাগ আর তারা নিজেদের ভেতর মারামারি কাটাকাটি করলে কাজের ক্ষতি হয়, তাই শান্তিরক্ষা বিভাগ ইত্যাদি চালু করা হয়। যে শ্রেণী সম্পত্তির মালিক তাদের ক্ষমতা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য এমনি করে রাষ্ট্র পাহারাদারি করে। মোটামুটি রাষ্ট্র হলো একটা যন্ত্র স্বরূপ যা দিয়ে শাসশ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীগুলোকে বশে রাখে। এমনি ভাবে আদিম কমিউনিজম ভেঙ্গে যাওয়ার পর সম্পত্তির মালিক শ্রেণী তাদের শাসন ও শোষণ বজায় রাখবার জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি করলো এবং রাষ্ট্রের সাহায্যে তাদের শাসন বজায় রাখতে লাগলো।

কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীগুলো তাদের ওপরে এই কর্তৃত্ব মুখ বুজে সব সময় সহ্য করলো না। শাসক-শোষক শ্রেণী ও শাসিত-শোষিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকলো। কখনও কখনও সে ঝগড়া প্রকাশ্যে ভীষণ আকার ধারণ করে ফুটে উঠতো। কখনও বা তা টের পাওয়া যেত না। কিন্তু ঝগড়া লেগেই ছিলো। এই শাসক-শোষক শ্রেণীর সঙ্গে শাসিত-শোষিত শ্রেণীর যে ঝগড়া, তাকেই বলে **'শ্রেণীসংগ্রাম' (Class Struggle)**। এই শ্রেণীসংগ্রামের ফলে অনেক বার সমাজে শাসক-শাসিত শ্রেণীর অদল বদল হয়েছে। যারা নীচে পড়ে ছিলো, তারা ওপরে উঠে গিয়ে শাসকশ্রেণীকে ধ্বংস করে নিজেরাই শাসকশ্রেণী হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের কথা তোমরা বোধ হয় শুনে থাকবে। এই ফরাসী বিপ্লব এমনি একটা শাসকশ্রেণী বদলের ঘটনা।

ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্র

ফরাসী বিপ্লবের আগে পর্যন্ত কৃষি কাজই সমাজের প্রধান পেশা ছিলো এবং উৎপাদন যন্ত্রের ভেতর জায়গা-জমিই ছিলো সবচেয়ে প্রধান। কাজেই এর মালিক যারা অর্থাৎ জমিদারই সমাজে রাজত্ব করতো। তারাই ছিলো সমাজের সবচেয়ে উচ্চ স্তরে। জমিদার, রাজা ও সামন্তদের কী করে জন্ম হল, তা আগের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা দেখেছি। তাদের নীচে আবার অনেকগুলি শ্রেণী ছিলো, যেমন বণিকশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ইত্যাদি। এইসব শ্রেণীর উপর মোড়লী করতো সামন্ত ও জমিদারশ্রেণী। সেই জন্যে এই যুগকে বলা হতো **'সামন্ততন্ত্র'** বা **'ফিউডালিজম'**।

এই ফিউডালিজমের ভেতর থেকেই বণিকশ্রেণী ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলো। তখন আমেরিকা ও ভারতবর্ষে যাতায়াতের সমুদ্রপথ আবিষ্কার হয়। দেখতে দেখতে এই সব দেশ থেকে সোনা-রূপো নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বণিকদের পুঁজি জমিদারদের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে গেল। আগে শ্রমিকরা কারিগরদের মতো নিজের নিজের কুটিরে বসে নিজে কাঁচামাল কিনে নিজেদের সামান্য উৎপাদন যন্ত্রের সাহায্যে পণ্য তৈরি করতো। আর বণিকরা তাদের কাছ থেকে এই সব পণ্য কিনে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতো। যখন বণিকদের পুঁজি বেশ খানিকটা বেড়ে গেল, তখন বণিকরা নিজেরাই কারখানা তৈরি করে মজুর লাগিয়ে পণ্য উৎপাদন শুরু করলো। এতে করে তাদের লাভ অনেক বেশি হতে লাগলো এবং যতোই এই লাভ বেড়ে যেতে লাগলো, ততোই তাদের পুঁজিও বাড়তে লাগলো। ফলে তাদের ক্ষমতাও বেশ বেড়ে গেল।

প্রথমে ছোট ছোট কারখানা খোলা হলো। দেখতে দেখতে সেগুলো বড় কারখানায় পরিণত হলো। তাতে নানা কল-কব্জা বসলো। বাষ্পের দ্বারা চালু কল আবিষ্কার হওয়ায় উৎপাদন-ক্ষমতা এতো বেড়ে গেল যে, হাজার হাজার পণ্য এই সব কারখানায় অতি অল্প সময়ে তৈরি হয়ে যেতে লাগলো। আর এই উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বণিকদলের শক্তি বাড়তে লাগলো। কারণ তাদের পুঁজি, টাকা-পয়সা বেড়ে গেল অনেক। কিন্তু তখনও রাষ্ট্র ছিলো জমিদারদের বা সামন্তদের হাতে। জমিদাররা নানা রকম ভাবে বণিকদের জব্দ করবার চেষ্টা করছিলো। এক জমিদারী থেকে অন্য জমিদারীতে মাল বিক্রি করার জন্য নিলেই তারা ট্যাক্স আদায় করতো। কৃষকরা যাতে জমি ছেড়ে কারখানায় চলে না যায়, তারও চেষ্টা করতো তারা। এমনি করে জমিদারদের হাতে রাষ্ট্র থাকায় বণিকদের অসুবিধা হতো খুবই। কাজেই তখন বণিকরা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। আর শ্রমিক-কৃষকরাও জমিদারদের উপর সন্তুষ্ট ছিলো না। তারাও বণিকদের সঙ্গে যোগ দিলো। এইসব শ্রেণী একসঙ্গে যোগ দিয়ে ফিউডালিজম ধ্বংস করলো। তার জায়গায় বসানো হলো বণিকদের রাজত্ব অর্থাৎ **'ক্যাপিটালিজম'**। বণিকদের ও দেশে বলতো 'বারগার্স' (Burghers), তা থেকে ক্যাপিটালিস্টদের নাম হয়েছে **'বুর্জোয়া'** আর শ্রমিকদের নাম হলো **'প্রোলেটারিয়েট বা 'সর্বহারা'**। জমিদারদের হাত থেকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাতে চলে যাওয়াই হলো ফরাসী বিপ্লবের আসল কথা।

ভারতীয় সমাজে শ্রেণী

ভারতবর্ষে শ্রেণীর উৎপত্তি কিছুটা ভিন্ন পথে হয়েছিলো। যার ফলে আজও আমাদের দেশে শ্রেণীসংগ্রাম কিছুটা বিকৃত রূপ নিয়ে থাকে। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই অসংখ্য আদিম ট্রাইবরা বসবাস করতো। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নাম তোমরা শুনে থাকবে। বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে এই দু'টো জায়গায় প্রায় ৩/৪ হাজার বছর আগেকার দু'টো প্রাচীন শহরের ঘরবাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে মাটির নীচে। এই জায়গায় মাটি খুঁড়ে হাড়ি-কুড়ি, যন্ত্রপাতি, বাড়ির কাঠামো ইত্যাদি যা পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝা যায় বেশ উন্নতিশীল ট্রাইবরা এই শহরের অধিবাসী ছিলো। ভারতের অন্যান্য জায়গার ট্রাইবরা অতোটা উন্নত না হলেও, পাথর এবং অনেক সময় তামার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে বেশিরভাগ ট্রাইবরা শিখেছিলো। তার প্রমাণ ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এই ট্রাইবরা যে ধীরে ধীরে সভ্যতার পথে এগুচ্ছিলো, তা তাদের যন্ত্রপাতি, হাড়ি-কুড়ি থেকে বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তাদের উন্নতির পথে হঠাৎ বাধা পড়লো ভারতবর্ষের পশ্চিম থেকে আসা আর্য ট্রাইবদের আক্রমণে। এ সব যুদ্ধে আর্যরা জয়ী হবার পরে ভারতবর্ষে দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিলো। জয়ী আর্যরা হলো শাসকশ্রেণী আর পরাজিত আদিম ট্রাইবের লোকেরা হলো দাসশ্রেণী।

ক্রমে ক্রমে আর্য সমাজেও সামন্ত আবির্ভাব হল। জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপিত হলো এবং উৎপাদনে শ্রমবিভাগ চালু হল। ফলে আর্যদের ভেতরও শ্রেণী-বিভাগ এসে গেল। ব্রাহ্মণ শ্রেণী নিজেদের শ্রেষ্ঠ শ্রেণী বলে জাহির করে দিলো এবং আইন-কানুন তৈরি ও আচার-বিচার ও ধর্ম নিজেদের হাতে থাকলো। তাদের অধীনে অনুগত হয়ে থাকল ক্ষত্রিয়শ্রেণী। রাজ্য রক্ষা ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা তৈরি আইন চালু করার দায়িত্ব থাকল তাদের উপর। এই দুই শ্রেণীর অধীনে থাকলো বৈশ্যশ্রেণী। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও উৎপাদন তাদের দায়িত্বে থাকলো। সবচেয়ে নীচে থাকলো পরাজিত ট্রাইবের লোকেরা নানা রকম শারীরিক পরিশ্রম করে এবং অপমান ও অত্যাচার সহ্য করে।

প্রাধান্য স্থাপন করে ব্রাহ্মণরা যে সমাজ-ব্যবস্থা চালু করলো, তা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তারা চালু করতে সমর্থ হলো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র- এই চার শ্রেণীর এই সমাজ ব্যবস্থাকে তারা নাম দিলো "বর্ণাশ্রম ধর্ম"। এই ব্যবস্থা একটা ভগবানপ্রদত্ত ধর্ম হিসেবে প্রচার করা হলো। প্রথম প্রথম

রাজশক্তি ব্যবহার করে জোর করে এই ব্যবস্থা চালু করা হলো। পরে ধীরে ধীরে সবাই এই ব্যবস্থা স্বীকার করে নিলো, উঁচু শ্রেণীর লোকেরা সুবিধাজনক বলে আর নীচু শ্রেণীর লোকেরা অনন্যোপায় হয়ে। প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদের এটা একটা বড় কৃতিত্বের বিষয় নিশ্চয়ই যে, তারা মানুষের মনকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার এই সব মতবাদগুলোকে- ভগবানের প্রদত্ত 'ধর্ম' বলে সফলতার সঙ্গে চালু করতে পেরেছিলো এবং মানুষের মনে ছোটবেলা থেকে নানা দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করে- যেমন জন্মান্তরবাদ, কর্মফলবাদ ইত্যাদি আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে পেরেছিলো। ফলে এইসব মতবাদ ও শ্রেণীব্যবস্থা লোকে নিজে থেকেই মেনে নিতো এবং আজও নিচ্ছে।

যতোই শ্রমবিভাগ বাড়তে লাগলো, ততোই এই চার বর্ণের ভেতর আবার ভাগ হতে লাগলো। ফলে ভারতের লোকেরা আজ অসংখ্য বর্ণে বা জাত-পাতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং কিছুতেই এই বর্ণ ধর্মের অন্ধতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারছে না।

মুসলমান আমলে হিন্দু রাজা বা সম্রাটের জায়গায় শুধু মুসলমান রাজা বা সম্রাট হল। কিন্তু ভারতীয় সমাজের যে মৌলিক কাঠামো তার কোনই পরিবর্তন হলো না এবং এখানে সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্য কোন শ্রেণী মাথা তুলতে পারলো না অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের মতো কোনো সমাজ-বিপ্লব ভারতীয় সমাজে ঘটলো না।

ক্যাপিটালিজম বা বুর্জোয়া সভ্যতা

ইউরোপের সব দেশেই এই রকম ছোট-খাট বিপ্লবের ভেতর দিয়ে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্র-ক্ষমতা পেল। রাষ্ট্র-ক্ষমতা পেয়ে তারা এবার পৃথিবীটাকে তাদের নিজেদের মতো করে গুছিয়ে-গাছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। আইন-কানুন বদলে গেল, সমাজের রীতিনীতি বদলে গেল। পুরানো ধারণাগুলো আর টিকলো না। এমনি করে শুধু যে পণ্য উৎপাদনের উপায় বদলে গেল- তা নয়, মানুষের জীবনের সব কিছুই ওলোট-পালট হয়ে গেল। এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হলো- **'বুর্জোয়া সভ্যতা'**।

বুর্জোয়ারা তাদের নিজেদের সুবিধে অনুযায়ী পৃথিবীটাকে গড়ে নিলো বটে, কিন্তু নিশ্চিন্তে বসে পৃথিবী ভোগ করা আর তাদের হয়ে উঠলো না। আমরা এক অধ্যায়ে দেখেছি ক্যাপিটালিজম মানেই হচ্ছে উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও ব্যক্তিগত লাভের জন্য এই উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহার করে পণ্য

উৎপাদন। কিন্তু উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করতে গেলে শ্রমিকদের সাহায্য ছাড়া তা হয় না। কাজেই লাভ সৃষ্টি করতে গেলে শ্রমিকদেরও সৃষ্টি করতে হয়। আর পুঁজি যতো বেড়ে যেতে থাকে শ্রমিকদের সংখ্যাও ততো বেড়ে যায়। আগে ছোট কারখানায় যেখানে ১০০ শ্রমিক কাজ করতো তখন সেখানে হয়তো হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে। কিন্তু শ্রমিকরা হাজার পরিশ্রম করা সত্ত্বেও শ্রেণী হিসেবে গরিব হয়ে যেতে থাকে। তার উপর থাকে আবার বেকার হয়ে গিয়ে যেটুকু তার সামান্য আয় তা-ও বন্ধ হয়ে যাবার ভয়।

তীব্রতর শ্রেণী সংঘর্ষ

এই সব কারণে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। ফলে তাদের একতাও বেড়ে যায়। প্রথম প্রথম তারা চাকরির জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু শীঘ্রই দেখতে পায় যে তাদের সকলেই সমান দুঃখে দুঃখী, তাদের সকলের ভাগ্যই এক সুতোয় গাঁথা, তারা সকলেই সমানভাবে কল মালিকদের দ্বারা অত্যাচারিত ও শোষিত। কাজেই তারা একতাবদ্ধ হয়ে তাদের সকলের যে শত্রু তার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্রতিজ্ঞা করে। এমনি করে একদিকে যেমন তাদের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে, তেমনি ক্যাপিটালিস্টদের সঙ্গে যুজতে যুজতে তাদের একতা বেড়ে যায়, তাদের শ্রেণীচেতনা বেড়ে যায়। ক্রমে ক্রমে তারা দেখতে পায় যে উৎপাদন-যন্ত্রে তাদের অধিকার স্থাপন না করা পর্যন্ত অবস্থার কোনো সত্যিকারের প্রতিকার সম্ভব নয় এবং রাষ্ট্র-ক্ষমতা না পাওয়া অবধি উৎপাদন যন্ত্রে অধিকার স্থাপন করা যায় না। তাই তারা তখন গভর্নমেন্ট দখল করার চেষ্টা করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর সামান্য অংশ তাদের শ্রেণীর সত্যিকার পরিচয় পেয়ে নিজেদের দল ছেড়ে শ্রমিকদের দলে যোগ দেয়। এমনি করে তারা ক্রমে শক্তিশালী হতে থাকে। ওদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীও সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। এই জন্য সমাজে তীব্র শ্রেণী-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

যে সব বুর্জোয়া দেশগুলোর কলোনি আছে, সে সব বুর্জোয়া দেশের ক্যাপিটালিস্টরা কলোনির লোকদের শোষণ করে তার এক অংশ দিয়ে নিজের দেশের শ্রমিকদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে। কিন্তু এ পন্থা বেশিদিন চলে না, কারণ কলোনির লোকেরাও গরিব হয়ে পড়ায় কলোনিতেও মাল বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। তখন কলোনি থেকেও বিশেষ কিছু আয় হয় না। আর যে সব দেশের

কলোনি নেই তারা তো এ উপায়ে শ্রমিকদের তুষ্ট করতে পারেই না। কাজেই শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে। তখন বুর্জোয়ারা খোলাখুলিভাবে জোর প্রয়োগ করে শ্রমিকদের ঠেঙিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ক্যাপিটালিজমের এই রূপের নাম আমরা বলেছি **ফ্যাসিজম**।

কিন্তু এ উপায়েও বেশিদিন শ্রেণীসংগ্রাম বন্ধ রাখা যায় না। কারণ রোগের যে মূল কারণ ক্যাপিটালিজম, তা দূর না হলে শুধু উপসর্গগুলোকে চেপে আর কয়দিন রোগ বন্ধ করা যায়? তাই ক্যাপিটালিজমের সব লক্ষণই আবার প্রকাশ পেতে থাকে। ব্যবসা-সংকট হতে থাকে, বেকার সংখ্যা বেড়ে যায়। এর ফলে শ্রেণীসংগ্রাম আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এমনি করে শ্রেণীসংগ্রাম চলতে চলতে এমন একটা সময় আসে যখন শ্রমিক শ্রেণী ক্যাপিটালিস্টদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ধ্বংস করে দিয়ে তার জায়গায় সমাজের সকলের অধিকারে এগুলোকে নিয়ে আসে এবং লাভের জন্য পণ্য তৈরি না করে, সকলের ব্যবহারের জন্য তৈরি করতে থাকে। এক কথায় সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠা করে।

সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্রের পরিচয়

ক্যাপিটালিজমের গোড়ার কথা যেমন উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার, তেমনি সোস্যালিজমের গোড়ার কথা হলো– উৎপাদন যন্ত্রে সমাজের সকলের সমান অধিকার। সোস্যালিস্ট সমাজে প্রধান উৎপাদন যন্ত্রগুলো ব্যক্তিবিশেষের থাকে না, জনসাধারণের সম্পত্তি হয়। ক্যাপিটালিস্ট সমাজে এই উৎপাদন যন্ত্রগুলো তাদের মালিকদের লাভের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সোস্যালিস্ট সমাজে এগুলো সকলের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক্যাপিটালিস্ট সমাজে জিনিসপত্র তৈরি হয় উৎপাদন যন্ত্রের মালিকদের লাভের জন্য। জনসাধারণের অভাব মেটানোর জন্য জিনিসপত্র তৈরি হয় না। জিনিসপত্র জনসাধারণের অভাব যদি মেটায় তবে সেটা কতকটা আকস্মিক ব্যাপারের মতো। সোসালিস্ট সমাজে লাভের কথাই ওঠে না। জিনিসপত্র সেখানে তৈরি হয়, যেহেতু এই সব জিনিসপত্র মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকবার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। এক কথায়, ক্যাপিটালিস্ট সমাজে জিনিসপত্র তৈরি হয় লাভের জন্য, সোস্যালিস্ট সমাজে তৈরি হয় ব্যবহারের জন্য।

সোস্যালিস্ট সমাজে উৎপাদন

এখন কথা হচ্ছে এই, সোস্যালিস্ট সমাজে কী করে জিনিসপত্র উৎপাদিত হয়? ক্যাপিটালিস্ট সমাজে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকরা উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহার করে পণ্য তৈরি করে। কারণ তাতে তাদের লাভ হয় যথেষ্ট এবং সেই সব জিনিসই তারা তৈরি করে যেগুলোতে তারা লাভের আশা রাখে। কিন্তু সোস্যালিস্ট সমাজে এই উৎপাদন যন্ত্রগুলো কারা চালু করবে এবং কী কী জিনিস তৈরি করা হবে, তাই বা কী করে ঠিক হবে?

তোমাদের আগে বলেছি, রুশ দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে এক বিপ্লব হয় এবং এই বিপ্লবের ফলে শ্রমিকরা সেখানে ক্ষমতা পেয়ে ধীরে ধীরে সোস্যালিজম স্থাপন করেছিলো। ওদের দেশে কীভাবে জিনিসপত্র তৈরি হতো, তা জানলেই সোস্যালিস্ট সমাজের জিনিসপত্র তৈরির রীতিনীতি জানা যাবে। সোভিয়েতে আইন তৈরি করার যে সভা ছিলো সেই সভা থেকে কয়েকজন নিয়ে, কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য লোক যাঁরা এ-সব ব্যাপার ভালো বোঝেন তাঁদের নিয়ে ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কয়েকজন নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হতো। এর নাম হতো 'কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশন' সংক্ষেপে একে বলা হত 'গস্‌প্ল্যান'।

এই গস্‌প্ল্যান দেশে কতো কাঁচামাল উৎপাদন হতে পারে, কতো শ্রমিক আছে, কতো ইঞ্জিনিয়ার আছে, উৎপাদন যন্ত্রের পরিমাণ কতো ইত্যাদির একটা মোট হিসাব করতো। তারপরে তার আগের আগের বছর কোন জিনিস কতো তৈরি হয়েছিলো, কোন জিনিস লোকেরা কতো বেশি পরিমাণে চায়, কোন জিনিস লোকদের বেশি পছন্দ, এই সব খোঁজ-খবর করে কী কী জিনিস আসছে বছর দরকার হবে এবং কতোটা দরকার হবে, তার একটা হিসাব করতো। তারপরে যতোটা উৎপাদন যন্ত্র তাদের আছে এবং যতোগুলো জিনিসপত্র দরকার হবে তার ভেতর একটা সামঞ্জস্য রেখে আসছে পাঁচ বছর কোন কোন কারখানায় বা কৃষি ফার্মে কতোটা জিনিস তৈরি করতে হবে তার একটা 'প্ল্যান' বা পরিকল্পনা তৈরি করতো। এটাকে বলে 'ড্রাফ্‌ট প্ল্যান' বা প্ল্যানের খসড়া। এই ড্রাফ্‌ট প্ল্যান তারপর প্রত্যেক জেলায় 'গস্‌প্ল্যানের' যে শাখা আছে, তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতো। তারা এটাকে ভালো করে দেখে কোথাও ভুল আছে কি'না, কোনো জিনিস তারা আরও বেশি করে সেই জেলা থেকে তৈরি করতে পারে কি'না বা কোনো জিনিস তাদের যা ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশি তৈরি করতে বলা হয়েছে কি'না।

এই রকমভাবে জেলা প্ল্যানিং কমিশনগুলো তাদের মতামত জুড়ে দিয়ে সেগুলোকে সব কারখানায় কারখানায় বা কৃষিফার্মে পাঠিয়ে দিতো। কারখানার শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দু'একজন কারখানার ম্যানেজার ও ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে আবার একটা ফ্যাক্টরী-কমিটি বসতো। সেই ফ্যাক্টরী-কমিটি তাদের কতো জিনিস তৈরির ভার দেওয়া হয়েছে এবং কী কী কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে, সেই সব দেখে তাদের মতামত ব্যক্ত করে সকল শ্রমিকদের একটি মিটিং করতো। সেখানে শ্রমিকদের ভেতর খোলাখুলিভাবে সব আলোচনা হতো। শুধু যে শ্রমিকদের সভায় এই পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানের খসড়া আলোচিত হতো- তা নয়, খবরের কাগজে এই সময়ে তুমুল আলোচনা চলতো এই প্ল্যান নিয়ে। এই বিষয়ে যার যতো আপত্তি আছে বা বলবার যা কিছু আছে সব খবরের কাগজ মারফত বা শ্রমিকদের এই খোলা মিটিং-এ বলতে পারতো। এই সব উৎপাদিত জিনিসপত্র ব্যবহার করে যারা, তাদের পক্ষ থেকেও আলোচনা হতো এবং তারা নানা রকম প্রস্তাব ও পরামর্শ দিতো। এমনিভাবে শ্রমিকদের খোলা মিটিং-এ সে আলোচনা শেষ হবার পর শ্রমিকদের মতামত যোগ করে দিয়ে ড্রাফটপ্ল্যানটা তারা ফেরত পাঠাতো জেলা প্ল্যানিং কমিশনের কাছে। তারা আবার পাঠিয়ে দিতো গস্‌প্ল্যানের কাছে, গস্‌প্ল্যান তখন সেইসব মতামত বিচার করে একটা শেষ ড্রাফট প্ল্যান রচনা করতো এবং সেটা আইনসভার কাছে রাখা হতো। আইনসভা সেটা নিয়ে আলোচনা করে প্রয়োজন মনে করলে কিছু অদল বদল করে সেটা পাশ করে দিতো। তখন সেই প্ল্যান অনুযায়ী দেশে জিনিসপত্র তৈরি হতো।

অনেকের ধারণা সোস্যালিস্ট সমাজের যারা কর্মকর্তা, তারা যা বলেন জনসাধারণকে তাই করতে হয়। তারা যদি বলেন, মেয়েরা সব লাল শাড়ি পরবে, কেউ নীল শাড়ি পরতে পারবে না, তাহলে লাল শাড়ি ছাড়া আর কোনো রকম শাড়ি তৈরি হবে না। কাজেই বাধ্য হয়ে ভালো না লাগলেও সবাইকে লাল শাড়ি পরতে হবে। প্ল্যান কী রকমভাবে তৈরি হয়, তা যদি বুঝে থাকো, তাহলে এ ধারণা যে ভুল, তা আর আলাদা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। কেননা এই প্ল্যান তৈরির সময় সবাই তাদের মতামত ব্যক্ত করার সম্পূর্ণ সুযোগ পায়। কাজেই তখন ব্যবহারকারীদের সভায় বা খবর কাগজ মারফৎ শুধু লাল শাড়ি তৈরির বিরুদ্ধে যে সব মেয়ে, তারা তাদের প্রতিবাদ জানাবে। এই প্রতিবাদের ফলে অন্যান্য রংয়ের শাড়িও তৈরি হবে। এমনিভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের মতামত নিয়ে জিনিসপত্র তৈরি হতে থাকে।

সোভিয়েট দেশে সব বড় বড় কারখানা এই গভর্নমেন্টের হাতে ছিলো এবং গভর্নমেন্টের অনেক কৃষিফার্মও ছিলো। এ ছাড়া যে সব শ্রমিক গভর্নমেন্টের কারখানায় কাজ করতে চায় না, তারা তাদের নিজেদের কো-অপারেটিভ কারখানা খুলতে পারতো। এই রকম অনেক কো-অপারেটিভ কারখানাও ওদেশে ছিলো। এগুলোকে ওরা বলত 'ইনকপস্' (Incops)। কৃষকরাও আবার নিজের নিজের জমি চাষ করতে পারতো বা অনেকে মিলে 'যুক্তফার্ম' (Collective Farms) খুলতে পারতো। এগুলোকে ওরা বলতো 'কোল্‌খস্' (Kolkhos)। এইসব ইনকপস্ বা কোল্‌খস্ তাদের নিজেদের পণ্য নিজেরাই বাজারে বিক্রি করতে পারতো এবং ক্রেতারাও যেখান থেকে ইচ্ছামতো কিনতে পারতো। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, সোভিয়েট দেশে উৎপাদন প্রণালীর কোথাও জোর করে কিছু করা হত না ব্যাপারটা সম্পূর্ণ জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল ও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক।

প্ল্যানিংয়ের ফল

ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র তৈরি হয় বলে এবং প্ল্যান করে সব তৈরি হওয়াতে ক্যাপিটালিস্ট উৎপাদন প্রথায় যেসব গোলমাল দেখা যায়, সোস্যালিস্ট উৎপাদন প্রথায় সেগুলো আর থাকে না। ধন-সম্পত্তি যা তৈরি হয় তার কিছুটা অংশ গভর্নমেন্ট দেশের শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা, উৎপাদন যন্ত্র আরও বাড়ানো এবং গভর্নমেন্ট চালাবার খরচ হিসেবে বাদ দিয়ে বাকিটা সব জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারে। কারণ জিনিসপত্র তো আর এখানে লাভের জন্য তৈরি হয় না যে, লাভ না হলে তা আর বিক্রি না করে গুদামে বন্ধ করে রাখা হবে বা নষ্ট করে দেওয়া হবে। এই জন্য সোস্যালিস্ট সমাজে কখনও অবিক্রিত জিনিসে বাজার বোঝাই হয়ে থাকে না এবং তার পাশেই লোক না খেতে পেয়ে, না পরতে পেয়ে মারা যায় না। জিনিসপত্র তৈরি হতে না হতেই মানুষ তা কিনে নেয়। এর ফলে কখনও ব্যবসা সংকট দেখা দেয় না। কারখানা দিনরাত চালু রেখেও লোকের চাহিদা মেটানো কষ্টকর হয়। শ্রমিকরা কখনও বেকার হয় না। তাদের অবস্থার উন্নতি হতেই থাকে।

এই জন্য গত ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত যখন সমস্ত ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলো ব্যবসা সংকটে ধসে পড়বার উপক্রম হয়েছিলো, সোভিয়েত দেশে তখন দিনরাত কাজ করে তাদের কারখানাগুলো লোকের চাহিদা মেটানোর মতো যথেষ্ট জিনিস তৈরি করে উঠতে পারছিলো না। সমস্ত পৃথিবীতে যখন

লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হয়ে যাচ্ছিলো, তখন সোভিয়েত দেশে শ্রমিকের অভাবে কারখানা আরও বাড়ানো যাচ্ছিল না।

সোস্যালিস্ট প্রণালীতে জিনিসপত্র তৈরির আর একটা বড় সুফল হচ্ছে এই যে, জিনিসপত্র দেশের বাজারে অবিক্রিত হয়ে পড়ে থাকে না বলে জিনিস বিক্রির জন্য কলোনিরও দরকার হয় না। সেই জন্য সোস্যালিস্ট দেশগুলোকে কলোনির জন্য অপর দেশের স্বাধীনতা নষ্ট করে তাদের শোষণ করবার দরকার হয় না। আর কলোনির দরকার হয় না বলেই কলোনির জন্য যুদ্ধের দরকার হয় না। এই জন্য যুদ্ধ দূর করবার প্রধান উপায় হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদ।

সমাজতন্ত্রবাদের আমলে মানুষের যে শুধু আর্থিক সুবিধা হয়- তা নয়, সব দিক দিয়েই তাদের সুবিধা হয়। শিক্ষা-দীক্ষার ভার রাষ্ট্র নেয় এবং স্ত্রী, পুরুষ সবাই শিক্ষালাভ করার সম্পূর্ণ ও সমান সুযোগ পায়। এর ফলে দারিদ্র্যের চাপে এখন যে রকম অনেক ভালো ভালো ছেলের মেধা নষ্ট হয়ে যায়, সে রকম হতে পারে না। শিক্ষা লাভ করে প্রত্যেকই তার নিজের নিজের বিশেষ যে সব ক্ষমতা বা প্রতিভা তা ফুটিয়ে তুলবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। এর ফলে মানুষ সত্যি সুখী হতে পারে এবং নিজের জীবন সার্থক করে তুলতে পারে। এই রকম সবাই সমান সুযোগ পায় বলে সোস্যালিস্ট সমাজেই মানুষ সত্যিকার স্বাধীনতা পায়।

এর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত সোভিয়েত সমাজের একটি ঘটনা থেকে তোমাদের বলছি। একটা কারখানায় একটি মেয়ে কাজ করতো। কিন্তু কারখানার কাজে তার কোনো উৎসাহই ছিলো না। বার বার সে কাজে ভুল করতো এবং যতোখানি কাজ তাকে দেওয়া হতো, তা সে কিছুতেই করে উঠতে পারতো না। কারখানার ম্যানেজার তাকে শোধরাবার অনেক চেষ্টা করলো। এক বিভাগ থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য বিভাগ দিলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। অবশেষে হতাশ হয়ে শ্রমিক সংঘের কাছে তাকে অন্য কারখানায় পাঠিয়ে দেবার অনুরোধ করে পাঠালো। শ্রমিক সংঘ মেয়েটিকে একটি মানসিক চিকিৎসাগারে পাঠিয়ে দিলো। সেখানে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, মেয়েটির মনের গঠন এরকম যে, সে কারখানার কাজ করবার সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং শিক্ষার কাজ সে ভালো পারবে। শ্রমিক সংঘ তখন তাকে একটা স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজ খুঁজে দিলো। দেখা গেল সে শিক্ষয়িত্রী হিসেবে সে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে বেশ নাম করে ফেললো। এ রকমভাবে প্রত্যেকটি মানুষের মনের সম্পূর্ণ বিকাশ হবার সুযোগ করে দেওয়ার দৃষ্টান্ত একমাত্র সোস্যালিস্ট দেশেই পাওয়া যাবে।

আর একটা ঘটনা বলছি। একদিন এক জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে একজন কাঠুরিয়ার পায়ের উপর একটা গাছ পড়ে তার পাটা জখম হয়ে যায় এবং খুব রক্তপাত হতে থাকে। লরিতে করে তৎক্ষণাৎ তাকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ততোক্ষণ তার এতো বেশি রক্ত ক্ষয় হয়ে গেছে যে, তার শরীরে দ্রুতই রক্ত না দিলে তাকে আর কোনোমতেই বাঁচানো যাবে না- এমন অবস্থা। কিন্তু এই ছোট্ট শহরের হাসপাতালে তার শরীরের উপযুক্ত রক্ত ছিলো না এবং এতো শীঘ্র রক্ত অন্য কারো শরীর থেকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখার সময় ছিলো না। সঙ্গে সঙ্গে বেতারে বড় শহরে খবর পাঠানো হলো জমাট রক্ত পাঠাতে। কয়েক মিনিটের ভেতর শহরের ওপর একটা এরোপ্লেন দেখা গেল এবং এই এরোপ্লেনটা থেকে ছোট্ট একটা প্যারাসুটে এক বোতল জমাট রক্ত নেমে এলো। ডাক্তার এই জমাট রক্তটা কাঠুরিয়ার শরীরে প্রবেশ করিয়া দিলেন, কাঠুরিয়া বেঁচে গেল। প্রত্যেক মানুষের জীবনকে সোস্যালিস্ট সমাজে এতো মূল্যবান বলে মনে করা হয়। আমাদের মত দেশে শত শত লোক অনাহারে রাস্তার ধারে মরে পড়ে থাকলেও লোক ভ্রুক্ষেপ করে না। যে সমাজ প্রত্যেকটি লোকের জীবনকে এতখানি মূল্য দেয় সে সমাজ নিশ্চয়ই আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে।

[পাঁচ]

সোস্যালিজম (সমাজতন্ত্রবাদ) ও কমিউনিজম (সাম্যবাদ)

এতোক্ষণ আমরা শুধু কী করে সোস্যালিস্ট সমাজে জিনিসপত্র তৈরি হয় তা দেখেছি। কিন্তু কী করে এই সব তৈরি জিনিসপত্র মানুষের ভেতর বণ্টন করা হয়, তা আমরা দেখি নি। কারখানাগুলোয় যে সকল জিনিস তৈরি হয় সেগুলো না হয় বাজারে নিয়ে যাওয়া হলো মানুষের কাছে বিক্রি করার জন্য। কিন্তু মানুষের পকেটে যদি পয়সা না থাকে, তবে তারা কিনবে কী করে? লোকদের হাতে পয়সা আসে কী করে, অর্থাৎ তাদের আয় হয় কী করে তা আমরা এখনও দেখি নি। এবার সে বিষয়ে তোমাদের একটু বলবো।

ক্যাপিটালিস্ট সমাজে মানুষের আয় দু'রকম ভাবে হতে পারে। এক হতে পারে পরিশ্রম করে অর্থাৎ শরীর খাটিয়ে বা মাথা খাটিয়ে লোকে কিছু আয় করতে

পারে। মজুর, কৃষক, কেরানী, শিক্ষক, অফিসার, উকিল, ডাক্তাররা এই রকম শরীর বা মাথা খাটিয়ে আয় করে। আর আয় হতে পারে সম্পত্তি থেকে। কারো যদি কোনো উৎপাদন যন্ত্র থাকে, তবে সেই উৎপাদন যন্ত্র অপরকে ব্যবহার করতে দিয়ে আয় হতে পারে। সময় সময় উৎপাদন যন্ত্রের মালিক অপরকে উৎপাদন যন্ত্র না দিয়ে নিজেই তা খাটায়। সে ক্ষেত্রে উৎপাদন যন্ত্রের মালিক ভাড়া হিসেবে তো কিছু পায়ই, উপরন্ত উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহার করে যা লাভ হয় তা-ও পায়। জমিদার, মহাজন, ব্যাঙ্কার, কল-মালিক, ক্যাপিটালিস্ট প্রভৃতি মানুষ এই ভাবে সম্পত্তি থেকে আয় করে। পরিশ্রম করে যে আয় হয়, তার চেয়ে সম্পত্তি থেকে আয়ের পরিমাণ অনেক বেশি। এই জন্যে দেখবে ক্যাপিটালিস্ট সমাজে সবাই টাকা-পয়সা জমিয়ে সম্পত্তি করার জন্য ব্যস্ত। কারণ সম্পত্তি থাকলে বসে বসে কোনো কাজ না করে যথেষ্ট আয় করা যায়। এমনকি, কোনো কাজ না করে যার যতো বেশি আয়, ক্যাপিটালিস্ট সমাজে তার ততো বেশি মান। সবাই তাকে দেখলেই সেলাম ঠোকে, বিশেষ সমীহ করে চলে। ক্যাপিটালিস্ট সমাজে বিদ্যা বলো আর বুদ্ধি বলো বা অন্য কোনো ভালো গুণই বলো, টাকা না থাকলে এ সব গুণের কোনো মর্যাদাই দেওয়া হয় না। এই জন্যই ক্যাপিটালিস্ট সমাজে সবাই ক্যাপিটালিস্ট হতে চায়।

সোস্যালিস্ট সমাজে আয়ের এই দ্বিতীয় উপায় নষ্ট করে দেওয়া হয়। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার থাকে না বলে, সম্পত্তি ভাড়া দিয়ে বসে বসে খাবার আর উপায় থাকে না। সবাইকে পরিশ্রম করে কাজ করে খেতে হয়। পরিশ্রম যে করে না, সোস্যালিস্ট সমাজে তার ভাত জোটে না। মাথার পরিশ্রমই হোক, আর গতর খাটিয়েই হোক, পরিশ্রম সবাইকে করতেই হয়। বসে বসে আরামে খাওয়া যায় না বলে ক্যাপিটালিস্টরা ও সম্পত্তিওয়ালা লোকেরা তাই সোস্যালিজমের এতো বিরোধী।

এখন প্রশ্ন করতে পারো, কেউ যদি কাজ না পায় তাহলে সে কী করে খাবে? ক্যাপিটালিস্ট সমাজে অনেক বেকার থাকে। আবার যারা চাকরি করে, যে কোনো মুহূর্তে তাদের চাকরি চলে যেতে পারে। চাকরি চলে গেলে লোকের দুঃখ-কষ্টের একশেষ হয়, না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হয়। কাজেই সবাই চাকরি যাওয়ার বড় ভয় করে এবং চাকরি গেলে যাতে কষ্টে না পড়তে হয়, তার জন্য বাধ্য হয়ে কিছু জমাবার চেষ্টা করে।

সোস্যালিস্ট সমাজে কিন্তু চাকরি না পাবার বা চাকরি যাবার কোনো ভয় থাকে না। কেননা উৎপাদন যন্ত্রে সকলেরই অধিকার থাকে বলে সবাই সেই উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহার করে কিছু আয়েরও অধিকারী হয়। সোস্যালিস্ট সমাজে আমরা

আগে দেখেছি, মানুষের অবস্থা দিন দিন ভালো হতে থাকে বলে জিনিসপত্রের চাহিদা খুব বেড়ে যেতে থাকে। সেই জন্য উৎপাদন যন্ত্র বেশি বেশি করে খাটাতে হয় এবং তার জন্য লোকজনেরও দরকার থাকে সব সময়। কাজেই 'এই কারখানায় লোক দরকার নেই', এ রকম নোটিশ যা ক্যাপিটালিস্ট দেশের কারখানাগুলোতে প্রায়ই ঝোলানো দেখা যায়, তা সোস্যালিস্ট দেশের কারখানায় থাকে না। তারপর ছোটবেলা থেকেই শিক্ষকরা পরীক্ষা করে দেখে, কোনো ছেলে বা মেয়ের কোন দিকে বেশি ঝোঁক আছে। তাকে সেই রকম শিক্ষা দিয়ে, শিক্ষা শেষ হবার পর সেই কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যেমন দেখা গেল, একটা ছেলের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে ঝোঁক বেশি তাকে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং শেখানো হলো এবং শিক্ষার পর এক কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার করে নেওয়া হল। এই জন্য সোস্যালিস্ট দেশে কেউ বেকার থাকে না, আর কেউ বেকার হয়ও না। তাছাড়া মনে করো, কোনো এক কারখানায় ম্যানেজারের সঙ্গে কোনো সাধারণ শ্রমিকের ঝগড়া হলো। ক্যাপিটালিস্ট দেশ হলে শ্রমিককে তৎক্ষণাৎ বিদায় নিতে হতো। কিন্তু সোস্যালিস্ট দেশে এই ঝগড়া ফ্যাক্টরী কমিটির কাছে যাবে বিচারের জন্য। ফ্যাক্টরী কমিটিতে শ্রমিকের মধ্যে থেকে কয়েকজন ও ম্যানেজারের পক্ষ থেকে কয়েকজন লোক থাকে। তারা যদি দেখে ম্যানেজার দোষী তাহলে ম্যানেজারকে শাসন করে, আর মজুর দোষী হলে তাকে শাসন করে। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, সে মজুর এই কারখানায় কোনো কাজেরই উপযুক্ত নয়, তাহলে তাকে শ্রমিক সংঘের (Trade Union) কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়। তারা তাকে সে যে কাজের উপযুক্ত সেই রকম কাজ খুঁজে তাতে লাগিয়ে দেয়। এই জন্যেও সোস্যালিস্ট দেশে কেউ বেকার হয় না।

এছাড়া কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে 'অসুস্থতার ভাতা' (Sick Insurance Benefit) দেওয়া হয় এবং চিকিৎসার সব বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। বুড়ো হলে সবাই পেনশন পায়। কাজেই না খেয়ে মরার ভয় আর সোস্যালিস্ট দেশে থাকে না। এই জন্যে পুঁজি করারও দরকার হয় না।

অনেকের ধারণা, সোস্যালিস্ট দেশে সকলের সমান মাইনে। এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। সমান মাইনে দেওয়া সম্ভবও হয় না, আর ন্যায়ের দিক থেকে উচিতও নয়। সম্ভব না এই জন্যে যে, কঠিন পরিশ্রম করে কেউ যদি যে কম পরিশ্রম করে তার সমান মাইনে পায় তবে কঠিন পরিশ্রম কেউ করতে চাইবে না। এর ফলে জিনিসপত্র উৎপাদন হবে না ঠিক মতো। আবার এ রকম নিয়ম অন্যায়ও হবে। মনে করো, দু'জন লোক সমান মাইনে পাচ্ছে। একজন লম্বা চওড়া মস্ত জোয়ান, আর একজন বেটে ও রোগা। যে জোয়ান তার খাওয়া বেশি দরকার

হবে, পরা বেশি দরকার হবে, সবকিছু তার বেটে লোকটির চেয়ে বেশি লাগবে। এদের দু'জনকে যদি সমান মাইনে দেয়া হয়, তাহলে পালোয়ানের উপর অন্যায় করা হবে। সেই জন্য সোস্যালিস্ট সমাজে সবাইকে সমান মাইনে দেওয়া হয় না। যার যে রকম কাজ তাকে সেই রকম মাইনে দেওয়া হয়। তবে এটা সত্যি যে, ক্যাপিটালিস্ট সমাজে যেমন কেউ কেউ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে খুব কম মাইনে পায়, আর কেউ শুধু দু'একটা সই দিয়ে তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি মাইনে পায় এ রকম আকাশ-পাতাল তারতম্য থাকে না সোস্যালিস্ট সমাজে। সবচেয়ে বেশি মাইনে এবং সবচেয়ে কম মাইনের মধ্যে যে পার্থক্য, তা ক্যাপিটালিস্ট সমাজ থেকে অনেক কম হয়।

কমিউনিস্ট সমাজ (সাম্যবাদী সমাজ)

ফিউডাল সমাজ থেকে জন্ম নিয়েছে ক্যাপিটালিস্ট সমাজ। ক্যাপিটালিস্ট সমাজ থেকে জন্ম নেয় সোস্যালিস্ট সমাজ এবং সোস্যালিস্ট সমাজই উন্নত হতে হতে কমিউনিস্ট সমাজে রূপান্তরিত হবে। কমিউনিস্ট সমাজটা কী রকম হবে? কমিউনিস্ট সমাজে সোস্যালিস্ট সমাজের মতোই প্ল্যান করে জিনিসপত্র তৈরি হবে। কিন্তু বণ্টনের নিয়মটা বদলে যাবে। সোস্যালিস্ট সমাজে বণ্টনের নিয়ম হচ্ছে, যে যেরকম কাজ করে সে সেই রকম আয় করে। কিন্তু কমিউনিস্ট সমাজে আয়ের নিয়ম আবশ্যকতা অনুযায়ী। যার যে রকম জিনিসপত্রের দরকার সে সেই রকম পাবে। ক্যাপিটালিস্ট সমাজে থেকে থেকে মানুষকে আত্মরক্ষার জন্যই ভয়ানক স্বার্থপর হতে হয়। স্বার্থপর থাকার জন্য সোস্যালিস্ট সমাজে বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়। মানুষের মন এই রকম স্বার্থপর থাকার জন্য সোস্যালিস্ট সমাজেও আবশ্যকতা অনুযায়ী বণ্টনের নিয়ম কাজে লাগানো যায় না। কারণ, তা হলে লোকে কাজকর্ম কিছু না করে সব জিনিসপত্র নিজেদের দরকার বলে ভোগ করতে চাইবে। সোস্যালিস্ট সমাজে থেকে থেকে সোস্যালিস্ট শিক্ষার ফলে মানুষের মন যখন যথেষ্ট উন্নত হবে ও সমাজের স্বার্থ বড় করে দেখবে এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে যখন সমাজে উৎপাদন ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যাবে, এতো বাড়বে যে, মানুষের আর অভাবের ভয় থাকবে না, তখন আবশ্যকতা অনুযায়ী বণ্টনের নিয়ম কাজে লাগানো যাবে। তার আগে সম্ভব হবে না। এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এ রকম স্বচ্ছলতার দিন সোভিয়েত দেশে এসেছিলো, তারপর ঘটনাচক্র অন্যদিকে মোড় নেয়- তা আমরা পরে দেখবো।

কমিউনিস্ট সমাজের সঙ্গে সোস্যালিস্ট সমাজের কিন্তু আরেকটি পার্থক্য আছে। তা হলো এই যে, কমিউনিস্ট সমাজে রাষ্ট্র থাকবে না। আমরা দেখেছি, সমাজে শ্রেণী থাকলেই রাষ্ট্র থাকে। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে শাসন করবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবহার করে। সোস্যালিস্ট সমাজে উৎপাদন যন্ত্রে সকলের অধিকার থাকে এবং ক্ষমতা থাকলে সবাই সমাজের যে কোনো কাজ করতে পারবে। এমনিভাবে সুযোগ সমান পাবে বলে ধীরে ধীরে শ্রেণীগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। শ্রেণী আর থাকবে না। তখন ছোটলোক বড়লোক বলে, উঁচু নীচু বলে মানুষে মানুষে কোনো বিভেদও থাকবে না। শ্রেণী যখন লোপ পেয়ে যাবে, তখন রাষ্ট্রেরও আর আবশ্যকতা কিছু থাকবে না। রাষ্ট্রও ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে। তখন আইন-কানুন সবাই মিলে করবে এবং সবাই তা স্বেচ্ছায় পালন করবে। তার জন্য পুলিশ, গুপ্তচর, সৈন্য, কয়েদখানার কিছু দরকার হবে না। জোর দেখাবার কোনো আবশ্যকতাই থাকবে না। তখন রাষ্ট্রের জায়গায় 'জনসাধারণের কমিটি' গোছের একটা কিছু থাকবে মাত্র। কিন্তু দু'একটি দেশ এরূপ এগিয়ে গেলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যদি ক্যাপিটালিজম থাকে, আর তারা যদি সোস্যালিস্ট দেশের সঙ্গে শত্রুতা করতে থাকে তাহলে সেই সোস্যালিস্ট দেশগুলোর রাষ্ট্র সৈন্য-সামন্ত, পুলিশ এসব ত আর তুলে দেওয়া যায় না। কাজেই রাষ্ট্র একেবারে উঠে যেতে পারবে তখন, যখন পৃথিবীর সোস্যালিস্ট দেশের শত্রু আর বেশি থাকবে না। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই হবে তখন সোস্যালিস্ট।

সমস্ত পৃথিবীর সেই ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলো মিলে তখন একটা মাত্র দেশের মতো হয়ে যাবে। বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের কমিটিগুলো মিলেমিশে আলোচনা করে নিজেদের বিষয়-কর্ম নির্বাহ করবে- এই রকম একটা কিছু হবে কমিউনিস্ট সমাজ।

ডেমোক্র্যাসি বা গণতন্ত্র

রাজা যেখানে আইন তৈরি করে এবং দেশ শাসন করে সেখানকার গভর্নমেন্টকে বলা হয় 'রাজতন্ত্র'। আর যেখানে জনসাধারণ দ্বারা মনোনীত লোকেরা আইন তৈরি করে ও দেশ শাসন করে সেখানকার গভর্নমেন্টকে বলা হয় 'গণতান্ত্রিক' গভর্নমেন্ট। গণতন্ত্র এই ধারণার উপর স্থাপিত যে, দেশের গভর্নমেন্ট সকলের মত নিয়ে করা উচিত এবং আইন-কানুনও সকলের মতামত নিয়ে রচনা করা উচিত। কারণ জনসাধারণের মতামত না নিয়ে যদি আইন-কানুন তৈরি করা হয় বা দেশ শাসন করা হয়, তাহলে যারা দেশ শাসন করে এবং আইন তৈরি করে তারা তাদের স্বার্থের জন্যই আইন-কানুন তৈরি করবে এবং দেশ শাসন করবে। জনসাধারণের স্বার্থের দিকে তারা দৃষ্টি দেবে না। এ রকম শাসনের ফলে জনসাধারণের উপর অন্যায় অবিচার হবার খুব সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের স্বাধীনতা লোপ পায়। কাজেই গভর্নমেন্ট জনসাধারণের মত নিয়ে করা উচিত। এরূপ গভর্নমেন্টের কাঠামোকে বলে ডেমোক্র্যাসি বা প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র।

বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাসি (ধনিকের গণতন্ত্র)

বর্তমানে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ইত্যাদি যে সব দেশকে 'ডেমোক্র্যাটিক দেশ' বলা হয়, সেগুলো আসলে 'বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক দেশ'। এগুলো সব ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ও পরে স্থাপিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী যখন দেখলো যে তারা সংখ্যায় খুব কম, ফিউডাল বা জমিদারশ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা একা একা নিতে পারবে না, তখন 'সব মানুষ সমান', 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য' ইত্যাদি বুলি আউড়ে শ্রমিক-কৃষকদের সাহায্য লাভ করে। কিন্তু ক্ষমতা যখন তারা পেল, তখন ঐ সব বুলি সত্য করে কাজে লাগাবার জন্য তাদের তেমন উৎসাহ রইলো না। শুধু শ্রমিক ও কৃষকদের চাপে পড়ে আইনের চোখে সবাই সমান', এই বলে কর্তব্য শেষ করলো। গভর্নমেন্টও আর কোনো একজনের হাতে রইলো না। ভোট দিয়ে প্রতিনিধি মনোনয়ন করে সেই প্রতিনিধিদের দিয়ে গভর্নমেন্টের কাজ চালানো হতে লাগলো। কিন্তু 'আইনের চোখে সবাই সমান' হলে কী হবে, কাজের বেলায় ক্ষমতা

বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই থেকে গেল। কারণ উৎপাদন যন্ত্র তাদের হাতে থেকে যাওয়ায়, তাদের মুখ চেয়েই শ্রমিক-কৃষকদের থাকতে হলো। এসব দেশে শ্রমিক-কৃষক এমন কিছু করতে সাহস পায় না, যাতে বুর্জোয়ারা অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের চাকরি খেয়ে দেবে। তারপরে বুর্জোয়ারাই টাকাকড়ির মালিক, খবরের কাগজগুলো তাই বুর্জোয়াদের হাতেই থেকে গেল। এর ফলে শ্রমিক ও কৃষকদের ভুল বুঝিয়ে বিপথে নিয়ে গিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়ে নেবার কোনো অসুবিধা থাকলো না। শ্রমিক-কৃষকদের এমন কিছু শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার সুবিধা করা হলো না, যাতে তারা গভর্নমেন্টের কাজকর্ম নিজেরাই চালিয়ে নিতে পারে। কাজেই সব দিক থেকেই বুর্জোয়াদের মুখ চেয়ে তাদের অধীন হয়ে রইলো। এমনকি আইন আদালতেও টাকা না থাকলে বিচার বিবেচনা পাওয়া যায় না। এইজন্য ওসব পুরানো ডেমোক্র্যাসিগুলোতে আইনত যদিও সবাই সমান হল, কিন্তু আসলে সমস্ত ক্ষমতা বুর্জোয়াদের হাতেই থেকে গেল। সেই জন্য এই সব ডেমোক্র্যাসিকে সত্যিকার ডেমোক্র্যাসি বলা চলে না, এগুলো হচ্ছে 'ধনিকের গণতন্ত্র'।

জনগণের ডেমোক্র্যাসি (শ্রমিক-কৃষকের গণতন্ত্র)

সত্যিকার ডেমোক্র্যাসি কাকে বলে মার্কিন দেশেরই প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন মোটামুটি তার একটা ভালো সংজ্ঞা দিয়েছেন– 'ডেমোক্র্যামি হচ্ছে জনতার উদ্দেশ্যে জনতার দ্বারা পরিচালিত জনতার সরকার।' এরূপ পূর্ণাঙ্গ ডেমোক্র্যাসি স্থাপন করতে হলে, উৎপাদন যন্ত্রে সকলের সমান অধিকার দেওয়া দরকার। কারণ, তা না হলে উৎপাদন যন্ত্রে যাদের বেশি অধিকার থাকে, তারা সমাজে বেশি শক্তিশালী হয়ে পড়ে। গভর্নমেন্ট তাদের হাতে চলে যায় এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, জীবনে সকলের সমান সুযোগ দেওয়া দরকার। কারণ কোনো শ্রেণীর লোক যদি অপর শ্রেণী থেকে বেশি সুযোগ পায়, তাহলে যারা বেশি সুযোগ পেল তারা স্বভাবতই যারা কম সুযোগ পেল তাদের উপর রাজত্ব করবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ডেমোক্র্যাসি না হলে ওরূপ রাজনৈতিক ডেমোক্র্যাসি ফাঁকা হয়ে যায়। এই জন্য সমাজে শ্রেণী থাকলে, ডেমোক্র্যাসি সফল বা সম্পূর্ণ হতে পারে না। অবশ্য তাছাড়াও ডেমোক্র্যাসি সফল করে তোলার জন্য সকলকে লেখাপড়া শেখার সমান সুযোগ দেওয়া দরকার। সকলেরই যাতে একটা কিছু কাজ থাকে এবং কাজ

হারিয়ে কেউ বেকার না হয়ে পড়ে, তার ব্যবস্থাও করা দরকার। শুধু কাজ দিলেই যথেষ্ট হয় না, রাজনীতিতে যোগ দেবার সুযোগ ও সামর্থ্য অর্জন করবার জন্য যথেষ্ট সময় ও ছুটিও তাকে দেওয়া চাই। যে সব দেশে তিন চার বছর পরে পরে এক একবার ভোট দেবার মাত্র অধিকার আছে, তা-ও ভোট দিতে হয় এ দলের বা ও দলের কোনো প্রার্থীকে। তারপর যে প্রতিনিধির আর কোনো পাত্তা মেলে না। সেসব দেশে সাধারণ মানুষ দেশের শাসনে কোনো অধিকারই পায় না, অভিজ্ঞতাও লাভ করে না।

সোস্যালিজম কী তা যদি বুঝে থাকো, তবে দেখতে পাবে, সোস্যালিজম সব মানুষের জীবনে সমান সুযোগ ও অধিকার সম্ভব করে তোলে। কাজেই সোস্যালিজমের মধ্যে দিয়ে তথাকথিত ডেমোক্র্যাসি পূর্ণ ডেমোক্র্যাসিতে পরিণত হতে পারে। তা না হলে শুধু মুখে বলে দিলাম সব মানুষ সমান, কিন্তু কাজের বেলা যে ছোট তাকে ছোট করেই যদি রাখি, তাহলে ডেমোক্র্যাসি হয় না, ঠিক তার উল্টো হয়। এ রকম অবস্থায় জনসাধারণের হাজার সুযোগ সুবিধা আইনে লেখা থাকলেও সেগুলো কখনও কাজে প্রয়োগ হয় না।

উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার থাকলেই সমাজে শ্রেণী থাকবে এবং সমাজে শ্রেণী থাকলেই শ্রেণীসংগ্রাম থাকবে। এই শ্রেণীসংগ্রাম যখন খুব গুরুতর আকার ধারণ করে এবং যখন শ্রমিকশ্রেণী গভর্নমেন্ট হস্তগত করবার উপক্রম করে, তখন বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে আর ডেমোক্র্যাসির মুখোস রাখা সম্ভব হয় না। তখন তারা ডেমোক্র্যাসির মুখোস ফেলে দিয়ে খোলাখুলিভাবে শ্রমিকদের নিস্পেষন আরম্ভ করে, অর্থাৎ ফ্যাসিজম চালু করে। এইজন্য শ্রেণীবিভক্ত বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাসি কখনও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। শ্রেণীসংগ্রামের ধাক্কায় এর পতন অনিবার্য। শ্রেণীহীন সমাজেই শুধু ডেমোক্র্যাসি পূর্ণ ও সফল হতে পারে।

তাহলে 'ডেমোক্র্যাসি' সম্পূর্ণ হতে পারে সোস্যালিজমের আমলে। আর, 'সোস্যালিজম'-এর কথা বুঝলে এটাও আমরা বুঝি, শ্রমিকেরা দেশে সর্বপ্রধান শক্তি হলে তবেই শ্রমিকবিপ্লব ও সোস্যালিজম স্থাপন সম্ভব হয়। কিন্তু যে দেশে কল-কারখানা বেশি বৃদ্ধি পায় নি, শ্রমিকেরা সেখানে সংখ্যায়ও অধিক হতে পারে না, রাজনীতিতেও প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। অথচ এমন দেশ তো পৃথিবীতে অনেক আছে, যেখানে এখনো সাম্রাজ্যবাদীরা শাসন ও শোষণ করছে। যেমন সেদিনও পরাধীন ছিলো ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ। তাছাড়া এমন দেশও অনেক আছে, যা ঠিক পরাধীন না হলেও সাম্রাজ্যবাদীরাই যার উপর আর্থিক, সামরিক প্রভৃতি নানা দিকে আধিপত্য

করে। যেমন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের চীন, পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশ, আর বর্তমানের আরব, মিশর, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সব দেশ। সাম্রাজ্যবাদের অধীনে বা সাম্রাজ্যবাদের আওতায় এসব দেশ 'স্বদেশী' ক্যাপিটাল ও 'স্বদেশী' কল-কারখানা গড়ে উঠতে পারে না। 'কলোনিয়াল' বা 'সেমি-কলোনিয়াল', 'উপনিবেশিক' বা 'আধা-উপনিবেশিক' ব্যবস্থা চলে, অর্থাৎ এসব সমাজে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে 'ফিউডাল' বা 'আধা-ফিউডাল' রাজা-রাজরা, সামন্ত-জায়গীরদার-জমিদাররাই জমির মালিক থাকে। 'বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাসি'ও এখানে পুরো জয়লাভ করতে পারে নি। এ সব দেশের পক্ষে প্রথম ও প্রধান কাজ অবশ্য পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। তার অর্থ সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়িত করা ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার জমিদার জায়গীরদারদের থেকে জমির মালিকানা নিয়ে কৃষকের হাতে জমি দেওয়া।

আগেকার যুগে বুর্জোয়ারাই এই স্বাধীনতার যুদ্ধ করতো। তারপরে নিজেদের বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাসি স্থাপন করে শাসন ও শোষণ চালাতো। কিন্তু এ যুগে ঠিক তেমনভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব না। কারণ বুর্জোয়া যুগ এখন সাম্রাজ্যবাদের স্তরে, পতনের দিকে। অন্যদিকে পৃথিবীতে সোস্যালিস্ট বিপ্লবও ঘটেছে, শ্রমিকশক্তি এখন উত্থানের মুখে। এর ফলে এসব পশ্চাৎপদ দেশও তাই স্বাধীনতা লাভের নতুন পথ ও ডেমোক্র্যাসির একটা নতুন রূপ এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আবিষ্কার করতে পেরেছে। বুর্জোয়া নেতৃত্বে বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাসি গড়ার প্রশ্নও আর ওঠে না।

আর পশ্চাৎপদ দেশ একবারে কল-কারখানা না গড়েই এক লাফে শ্রমিক নেতৃত্বে সোস্যালিস্ট ডেমোক্র্যাসিও গড়তে পারে না। তারা শ্রমিক-পার্টির নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রকামী সকল দলকে ও মানুষকে একত্রিত করে স্বাধীনতা আয়ত্ত করে, এবং তারপর সেই সম্মিলিত গণতন্ত্রীদের সরকার গঠন করে। এসব গণতন্ত্রীদের মধ্যে শ্রমিকরা তো থাকেই, কৃষকরাও থাকে। দরিদ্র মধ্যবিত্ত, দোকানী পশারী কিংবা বুদ্ধিজীবী মাস্টার, ডাক্তার প্রভৃতিও থাকে, এমনকি 'স্বদেশী' বুর্জোয়ারাও থাকে। সাধারণভাবে তাই এ হচ্ছে 'জনগণের সংযুক্ত দল'। এরূপ গণতন্ত্রী দলের নাম হয় 'পিপলস্ ফ্রন্ট', 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট', 'ডেমোক্র্যাটিক যুক্তফ্রন্ট' প্রভৃতি। কিন্তু কথা হলো এই যে, এই সব সম্মিলিত শক্তির নেতৃত্ব সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী বলে শ্রমিক শক্তিকেই নিতে হয় এবং শ্রমিকের রাজনীতিই হয় তার মুখ্য রাজনীতি। এরা জমিদারী জায়গীরদারী বাতিল করে কৃষকের হাতে জমি দেয়, তাকে কৃষির উন্নতি করতে

সাহায্য করে। আর রাষ্ট্র এক নতুন নতুন কল কারখানা গড়তে থাকে। 'স্বদেশী শিল্পপতি' বা 'স্বদেশী বুর্জোয়ার' সাহায্যেও কল-কারখানা বাড়িয়ে তোলে, তাতে দেশে ফিউডালিজম চুকে যায়, শিল্প সমৃদ্ধি বাড়ে, শ্রমিক প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। ফলে সোস্যালিজমের দিকে দেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারে।

ঠিক এরূপ ডেমোক্র্যাসিই স্থাপিত হয়েছিলো চীনে (১৯৪৯ এর ১লা অক্টোবর থেকে)। এইরূপ ডেমোক্র্যাসিই স্থাপিত হয়েছিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলোতে- পোল্যান্ডে, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, রুমানিয়ায়, হাঙ্গেরিতে, বুলগেরিয়ায়, আলবেনিয়ায়, এমন কি জার্মানিতেও। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে অবশ্য একটু স্তরভেদ ছিলো। যারা যতো কল-কারখানায় অগ্রসর ছিলো, তারা ততো সোস্যালিজমের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যাচ্ছিলো। আর যারা পিছনে ছিলো, তারাও দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলো। দুঃখের বিষয় নানা রকম ভুল-ভ্রান্তির ফলে ১৯৯০ নাগাদ পূর্ব-ইউরোপের এই গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর পতন হয় এবং পুঁজিবাদীরা আবার দেশে তাদের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। পূর্ব-ইউরোপের ও সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কীভাবে পতন হলো, তা আমরা পরে আলোচনা করবো।

ইম্পেরিয়ালিজম যে ক্যাপিটালিজমের মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসা অনিবার্য ফল, এ তোমরা আগেই বুঝতে পেরেছো। আর ইম্পেরিয়ালিজম ও ফ্যাসিজম দু'টোও আলাদা জিনিস নয়, ক্যাপিটালিজমেরই দু'রকম রূপ। ক্যাপিটালিজম যে সব সমস্যার সৃষ্টি করে, বুর্জোয়াশ্রেণী সেসব সমস্যার সমাধান করবার জন্য ইম্পেরিয়ালিজম ও ফ্যাসিজমের আশ্রয় নেয়।

কিন্তু আমরা দেখেছি, ইম্পেরিয়ালিজম ও ফ্যাসিজম কিছুদিনের জন্য মাত্র এই সব সমস্যাগুলো ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারে, সম্পূর্ণ সমাধান করতে পারে না। এর সমাধান হয় সোস্যালিজমের ভেতর দিয়ে। সোস্যালিজমই হলো ক্যাপিটালিজমের শেষ ফল। এই ফলের জন্ম দিয়ে ক্যাপিটালিজম মরে যায়। কিন্তু সোস্যালিজমের জন্ম দিতে অনেক সংঘর্ষের দরকার হয়, অনেক রক্তপাতও হয় এবং অনেক উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কারণ, বুর্জোয়ারা প্রথম থেকেই সৈন্য-পুলিশ দিয়ে আইনের নামে শ্রমিক-শক্তির উপর জুলুম করে, গুলি চালায়, রক্তপাত করে ও সব রকম প্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে। এদের এই হিংস্রতার থেকে আত্মরক্ষার দায়েই শ্রমিক-শক্তিকে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। বুর্জোয়ারা যতোখানি হিংস্র হয়, শ্রমিকের আত্মরক্ষার শক্তিও ততোখানি না হলে নয় এবং যদি জনসাধারণ সোস্যালিজমের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তবে সময়ও অনেক দিন

লাগে। এই সব রক্তপাত ও সংঘর্ষ অনেক কম করে দেওয়া যায় যদি লোকে সোস্যালিজম যে দরকার এবং একদিন তা আসবেই, এটা বেশ ভালো করে বোঝে এবং সোস্যালিজম যাতে শীঘ্র আসতে পারে, তার জন্যে চেষ্টা করে। বুর্জোয়ারা গুলি-বন্দুক ও সৈন্য-প্রহরী দিয়ে এভাবে জনগণকে দমন না করলে এরূপ বিপ্লবে রক্তপাতও হয় না। কিন্তু বুর্জোয়ারা মুখে বললেও, কাজে অহিংসা মানে না, তা বলাই বাহুল্য। যতো বেশি লোক সোস্যালিজমের কথা ভালো করে বুঝবে এবং এর জন্য চেষ্টা করবে ততোই মানুষের এই অনাবশ্যক দুঃখভোগ কমে যাবে।

[সাত]

জাতীয়তাবাদ, মৌলিকতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা

জাতি শব্দের নানা অর্থ

বাংলা ভাষায় 'জাতি' কথাটা প্রধানত তিন রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় 'বর্ণ' বা 'জাত-পাত' অর্থে যেমন 'ব্রাহ্মণ', 'কৈবর্ত', 'নমঃশূদ্র' ইত্যাদি। জাতি এখানে ইংরেজি ভাষায় 'Caste' (কাস্ট) অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আমরা 'জাতি' কথাটা ইংরেজি Race (রেস) অর্থেও ব্যবহার করে থাকি। পুরাতন মানব সভ্যতা নিয়ে যারা আলোচনা করেন, তারা পৃথিবীর মানুষের প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেন। যথা, সাদা জাতি বা ককেসিয়ান রেস, কালো জাতি বা নিগ্রয়েড রেস, এবং হলুদ জাতি বা মঙ্গোলয়েড্ রেস। এরা মানুষের চামড়ার রঙ, শরীরের গঠন, চুল, চোখ, ঠোঁট, মাথার খুলি গড়ন ইত্যাদি দিয়ে মানুষকে বিভিন্ন জাতিভুক্ত করেন। তৃতীয়ত, জাতি কথাটা আমরা ইংরেজিতে 'Nation' (নেশন) বা 'Nationality' (নেশনালিটি) অর্থেও ব্যবহার করি। 'নেশন' কথাটার কোনো বাংলা বা হিন্দী বা সংস্কৃত প্রতিভাষা নেই। তা থেকেই বোঝা যায় 'নেশন' জিনিসটা আমাদের দেশে বেশি দিনের নয়। আমরা এই বইয়ে জাতি কথাটা 'নেশন' অর্থেই ব্যবহার করবো এবং 'জাত-পাত' কথাটা ইংরেজি 'কাস্ট' (Caste) কথার পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করবো।

নেশন বা জাতি কী?

কোনো সমাজকে 'জাতি' (Nation) হতে গেলে তার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। প্রথমত, তাদের একটা নিজেদের দেশ থাকা চাই। দ্বিতীয়ত, তাদের একটা বিশিষ্ট ভাষা থাকা চাই। তৃতীয়ত, তাদের ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতি, আচার-বিচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি এক রকম হওয়া চাই। চতুর্থত এবং সব চেয়ে বড় কথা, ঐতিহাসিক কারণে এদের ভেতর একটা ঐক্যবোধ গড়ে ওঠা চাই। যেমন কোনো বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে দেশের সব লোক একতাবদ্ধ হয়ে লড়তে থাকে তাহলে তাদের ভেতর একটা ঐক্যবোধ জন্মায়, যে ঐক্যবোধটাকে আমরা বলি জাতীয়তাবোধ। এই জাতীয়তাবোধ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে দৃঢ়তা লাভ করে এবং দেশকে স্বাধীন করতে সাহায্য করে। তখন এই দেশের লোকেরা একটা স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়।

জাতি হতে গেলে দেশ, ভাষা, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য, কৃষ্টি, ধর্ম, আচার-বিচার, মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির একতা দরকার। এই সবগুলি সব সময় যে থাকতে হবেই এমন কোনো কথা নেই। মোট কথা এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে যে একতাবোধ জন্মায়, সেই একতাবোধ যখন ঐতিহাসিক কারণে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে তখনই দেশের লোকেরা একটা জাতিতে পরিণত হয়। যেমন ধরো সুইজারল্যান্ড। এই দেশে তিন ভাষাভাষী লোক আছে– জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান। কিন্তু এই ভাষার বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তারা সুইস জাতিতে পরিণত হয়েছে বহু বছর একত্র হয়ে পরাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই তিন ভাষার লোকেরা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক থেকে, এক ভাষাভাষীর লোকেরা অন্য ভাষাভাষীদের উপর কোনো রকম অন্যায় অত্যাচার বা জোর-জুলুম খাটায়নি বলে তাদের একতা বোধ ক্ষুণ্ন হয় নি, বরং নানা ঐতিহাসিক কারণে আরও দৃঢ়তর হয়েছে। এর ফলে তাদের ভেতর বিভিন্ন ভাষা থাকা সত্ত্বেও তারা এক জাতিতে পরিণত হয়েছে এবং তাদের একতাবোধ অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে।

জাতীয়তাবোধের জন্মকাল

জাতীয়তাবোধ ও পুঁজিবাদের জন্মের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। পুঁজিবাদ জন্মাবার আগে জাতীয়াবোধ বলে কিছু ছিলো না। ইউরোপে তখন

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হতো রাজ্য নিয়ে। ক্যাথলিক ধর্ম আর প্রটেস্টান ধর্ম নিয়ে কে দরিদ্র চাষীদের শোষণ করবে তাই নিয়ে। পুঁজিবাদের জন্ম হবার পর বুর্জোয়া শ্রেণী জাতীয়তার নাম করে এক দেশের ও এক ভাষাভাষী সব শ্রেণীর মানুষকে একতাবদ্ধ করলো সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এবং তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিজেদের ক্ষমতায় বসাতে তারা ডাক দিলো স্বাধীনতার, সাম্যের ও জাতীয় ভ্রাতৃত্বের। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই ডাকে সাড়া দিলো কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কেননা তারাও জমিদার ও সামন্ত রাজাদের হাতে নিষ্পেষিত হচ্ছিলো। এই জাতীয়তার জাগরণে নেতৃত্ব দিলো বুর্জোয়া শ্রেণী। বিদ্রোহের সাফল্যের পর বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের শাসন কায়েম করলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র স্থাপন করে।

ভারতে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব

আমাদের দেশেও ইংরেজ শাসনের আগে এবং দেশি বুর্জোয়া শ্রেণী জন্মানোর আগে জাতীয়তাবোধ বলে কিছু ছিলো না। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের প্রদেশের সামন্ত রাজাদের অধীনে থাকতো। যেমন প্রাচীন বাংলায় গৌড়, বরেন্দ্র, হরিকেল (শ্রীহট্ট), চন্দ্রদ্বীপ ইত্যাদি রাজ্য ছিলো। তেমনি অন্যান্য প্রদেশেও অসংখ্য ছোট ছোট রাজন্য কখনও বড় রাজার অধীন কখনও স্বাধীনভাবে থাকতো। সমগ্র ভারতবর্ষের লোকের যে এক জাতি, এক প্রাণ সে অনুভূতি তখন তাদের ছিলো না। বড় রাজা এক একজন মাঝে মাঝে অন্যান্য প্রদেশের ছোট ছোট রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করে দিল্লী কিংবা পাটনা বা ইন্দ্রপ্রস্থে তাদের রাজধানী স্থাপন করে বড় সম্রাট হতেন। কিন্তু কোনো সাম্রাজ্যই ছোট ছোট রাজাদের বিদ্রোহের জন্য ভারতবর্ষকে বেশিদিন ঐক্যপাশে বাঁধতে পারেনি। এর ফলে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ জন্মায়নি।

ইংরেজরাই প্রথম সমগ্র দেশটাকে জয় করে এক দৃঢ় সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিলো। তাদের নিজেদের ব্যবসার তাগিদে তারা ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দালালি বা এজেন্সি দিতে বাধ্য হয়েছিলো। এই দালালির সুযোগ নিয়ে ভারতের প্রাচীন ব্যবসায়ী শ্রেণী বেশ দু'পয়সা কামিয়ে ফেলে। এদিকে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করে কয়েকজন বড় বড় জমিদার, রাজা ও তাদের তাঁবেদারের হাতে জমির মালিকানা অর্পণ করে, এর ফলে যদিও অধিকাংশ জমিদার ও রাজারা বৃটিশের পক্ষে থাকে, তথাপি কিছু কিছু জমিদার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইউরোপের স্বাধীনতা আন্দোলনের

সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। ফলে এরাই ভারতবর্ষে প্রথম জাতীয়তার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন তাঁদের ভেতর সবচেয়ে অগ্রণী।

দেশের স্বল্প সংখ্যক ইংরেজি জানা লোক যেমন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছিলো, অন্যদিকে ব্যবসায়ীরাও ক্রমে ক্রমে কল-কারখানার দিকে ঝুঁকছিলো এবং ইংরেজদের বিরোধিতার ফলে ক্রমেই ইংরেজ-বিরোধী হয়ে উঠছিলো ও দেশকে স্বাধীন করে ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে কল-কারখানা স্থাপন করে প্রচুর মুনাফা তোলার স্বপ্ন দেখছিলো। বোম্বাই, গুজরাট ও রাজস্থানের বহু প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠী বা বণিকরা এই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে প্রথম এগিয়ে এসেছিলো। তারাই ভারতের প্রথম বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম দিলো।

ইংরেজ শাসনের সময়ই কল-কারখানা স্থাপন করে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্য এরা এবার পুরোপুরি জাতীয় আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করলো। বুর্জোয়া নেতারা প্রথম প্রথম শুধু ইংরেজি শিক্ষিত বুর্জোয়া ও পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে তাদের জাতীয় আন্দোলন সীমাবদ্ধ রেখেছিলো। কিন্তু এতে বেশি সুবিধা হচ্ছে না দেখে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর ভেতরও ছড়িয়ে দিলো। এর ফলে ভারতবর্ষেও বিভিন্ন কৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা নিজেদের বিভেদ ও বিভিন্নতা ভুলে এক বিরাট জাতিতে পরিণত হলো এবং ইংরেজ-বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে তাদের ভেতর সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠল। এইভাবে ভারতে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন পোষাক-আশাক ও আচার-বিচার থাকা সত্ত্বেও এক ঐক্যবদ্ধ বিরাট জাতি তৈরি হলো।

ভারতের জাতীয়তা সমস্যা

স্বাধীনতার পর থেকে কিন্তু এই জাতীয় ঐক্যের বাঁধ ক্রমেই শিথিল হয়ে যাচ্ছে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে এমনকি ভারত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবার দাবিও ক্রমেই সোচ্চার হচ্ছে। অন্যদিকে জাতপাতের দাবি ও ধর্মের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক ও মৌলিকতাবাদের দাবিও জোরদার হচ্ছে এবং ধর্মের নামে রাজনীতি করার ঝোঁকও খুব বাড়ছে।

ঠিক তেমনি বাড়ছে রাজনীতিতে আঞ্চলিকতা বা প্রাদেশিকতার ঝোঁক অর্থাৎ এই অঞ্চল আমাদের, অন্যদের মারো কাটো হঠাও। যারা থাকবে তাদের সব সুবিধা বঞ্চিত করে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখো।

ভারত থেকে আলাদা হয়ে যাবার আন্দোলনকে বলা হয় বিচ্ছিন্নতাবাদ (Separatism)। জাতপাতের দাবি নিয়ে যে আন্দোলন করা হয়, তাকে বলা হয় জাতপাত আন্দোলন বা 'কাস্টইজম'। ধর্মের ভিত্তিতে যে রাজনৈতিক আন্দোলন করা হয়, তাকে বলা হয় সাম্প্রদায়িকতাবাদ (Communalism) বা মৌলিকতাবাদ (Fundamentalism)। আর প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্বার্থকে প্রবল করে তুলে যে সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতি তার নাম প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতাবাদ (Provincialism)। এইসব আন্দোলনগুলোই সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ দুর্বল হয়ে যাবার ফলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

জাতীয় ঐক্যবোধ দুর্বল হবার প্রথম কারণ
পুঁজিবাদের অসম বিকাশ

জাতীয়-ঐক্যবোধ দুর্বল হবার তিনটে প্রধান কারণ সহজেই চোখে পড়ে। সর্বপ্রধান কারণ হলো– ভারতে পুঁজিবাদের অসমান বিকাশ। পুঁজিবাদের এক গুরুতর দুর্বলতা হলো, দেশের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প ও কল-কারখানা উন্নতি সমানভাবে করতে না পারা। যেহেতু পুঁজিপতির ব্যক্তিগত লাভ করাই পুঁজিবাদী উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য, সেই কারণে যেখানে কল-কারখানা বসালে বেশি লাভ করার সম্ভাবনা, সেইখানেই আগে পুঁজিবাদী কল-কারখানা স্থাপিত করবে। যেহেতু বোম্বাই, গুজরাট, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম অংশে প্রাচীনকাল থেকেই শ্রেষ্ঠী বা বণিক সম্প্রদায়ের বাস ছিলো এবং এই সব রাষ্ট্রে তাদের প্রচুর ক্ষমতা ছিলো, তাই স্বাধীনতার পর এই সব জায়গায়ই নতুন নতুন কল-কারখানা তারা স্থাপন করতে লাগলো। ফলে এইসব জায়গাগুলোতে শিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করতে লাগলো। তাছাড়া এইসব জায়গায়ই ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনী ও সবচেয়ে শক্তিশালী বড় বুর্জোয়াদের অধিবাস এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরই হাতে, কাজেই এইসব প্রদেশে যে দ্রুত কল-কারখানা বসবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবন্ধকতা ও নিরুৎসাহের ফলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলো পেছনে পড়ে থাকলো। নীচে যে তালিকা দেওয়া হলো, তা থেকে প্রমাণ হবে গত ২০ বছরে রাজস্থানে শহরবাসীর সংখ্যা সবচেয়ে দ্রুত বেড়েছে। শহরবাসীর সংখ্যা বাড়া মানেই কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়া। তারপরই গুজরাট। তৃতীয় স্থান কর্ণাটক। এখানে অবশ্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের প্রসারই বেশি হয়েছে।

চতুর্থ মধ্যপ্রদেশ। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো এদের পেছনে পড়ে আছে। সবচেয়ে পেছনে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। শহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দিয়ে কল-কারখানার ও শিল্পের বৃদ্ধির পরিমাণ সঠিক বোঝা যায়।১*

বড় শহরের ২* লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার

ক্রম	রাজ্য	[১৯৬১ থেকে ১৯৮১ অবধি বৃদ্ধির শতকরা হার]
১	রাজস্থান	১১৬%
২	গুজরাট	১১২%
৩	কর্ণাটক	১১০%
৪	মধ্যপ্রদেশ	১০৯%
৫	কেরালা	১০৩%
৬	জম্মু-কাশ্মীর	১০২%
৭	অন্ধ্র	৯৬%
৮	পাঞ্জাব	৯১%
৯	মহারাষ্ট্র	৯০%
১০	তামিলনাড়ু	৮৮%
১১	বিহার	৫৬%
১২	উত্তর প্রদেশ	৪৫%
১৩	পশ্চিমবঙ্গ	১৮%

১* কারখানা শিল্প ও কৃষির যে সংখ্যাতত্ত্ব সরকারি রিপোর্টগুলোতে পাওয়া যায় তা এতো অসঙ্গতিপূর্ণ যে তা থেকে কোনো যুক্তিযুক্ত ও পরস্পর বিরোধহীন সিদ্ধান্তে আসা প্রায় অসম্ভব। একমাত্র জন-সংখ্যাতত্ত্ব (Census) কিছুটা সঙ্গতিপূর্ণ বলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এখানে আলোচনা করা হল।

২* বড় শহর অর্থে ১৯৬১ সালে ২ লক্ষের বেশি লোকসংখ্যা যে শহরের ছিলো সেই শহরগুলো।

সুতরাং তোমরা দেখতে পাচ্ছো, ভারতের কয়েকটা রাজ্য খুব দ্রুত শিল্পে এগিয়ে যাচ্ছে। আর অন্য রাজ্যগুলো এদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। এই অসমান বৃদ্ধির ফলে যারা পিছিয়ে পড়ছে তারা স্বভাবতই অসন্তুষ্ট হচ্ছে। এই পিছিয়ে পড়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করছে।

এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলকে শোষণ করে

বোম্বাই, গুজরাট ও রাজস্থানীয় পুঁজিপতিরাই ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী পুঁজিবাদী এবং ভারতের শাসন-যন্ত্রের আসল কর্ণধার এরাই। এরা নিজেদের যেখানে প্রতিপত্তি বেশি সেই সব জায়গায় বেশি পুঁজি খাটাবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। শুধু তাই নয়, এরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে কাঁচামাল সস্তায় নেবার সুব্যবস্থাও করে নিয়েছে। শুধু কাঁচামাল নয়, সে সব জায়গায় যদি বা কিছু উদ্বৃত্ত পুঁজি সঞ্চিত হয় তাও বীমা কোম্পানি, ইউনিট ট্রাস্ট, ব্যাংক ও পোস্ট অফিসের মারফৎ সে সব টাকা নিজেদের প্রদেশে নিয়োগ করার সুচারু ব্যবস্থা করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সাকরেদি স্থাপন করে এদের রাজ্যগুলিকে দ্রুত সম্পদশালী করে তুলতে পেরেছে এবং অন্যান্য রাজ্যগুলিকে পেছনে ঠেলে দিয়েছে।

তোমরা হয়তো লক্ষ করে থাকবে, পুঁজিবাদের এই অসমান বিকাশ অবিকল সাম্রাজ্যবাদের মতোই রূপ নিচ্ছে। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি, সাম্রাজ্যবাদ তাদের পেছনে পড়ে থাকা কলোনিগুলো থেকে কাঁচামাল, টাকা-পয়সা ও খাদ্য সংগ্রহ করে নিজেদের দেশকে ধনী করে তোলে। ভারতবর্ষেও, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের পুঁজিপতিরা দেশের পেছনে পড়ে থাকা প্রদেশগুলোকে তাদের কলোনির মতই শোষণ করছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থক কারা

কিন্তু পেছনে পড়ে থাকা প্রদেশের বুর্জোয়ারা স্বভাবতই এই ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজি নয়। স্বাধীনতার পর কিছুটা শিল্প ও শিক্ষার প্রসার হওয়ায় এই সব প্রদেশগুলোতে নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম হয়েছে। তারা তাদের বিকাশের পথ বন্ধ দেখে স্বভাতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এবং তাদের ভাষা ও

প্রদেশকে আশ্রয় করে নিজেদের এক ভিন্ন জাতীয় ঐক্য ও ঐতিহ্য স্থাপন করার দাবি তুলছে। পাঞ্জাবের 'খালিস্থানী'রা ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের বাইরে চলে যাবার দাবিও করছে।

এই উগ্র-বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবির পেছনে সাধারণত বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত থাকে। বিশেষ করে আমেরিকার সি-আই-এ নামক গুপ্তচর বিভাগের এক বহুদিনের চক্রান্ত ভারতকে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে ভাগ ভাগ করে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করা। কেননা ছোট ছোট দেশগুলো দুর্বল থাকে বলে টাকা-পয়সা ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে তাদের দেশের বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীকে সহজেই কিনে ফেলা যায়। যেমন তারা কিনে ফেলেছে থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি দেশগুলো।

আঞ্চলিকতাবাদ বা স্থানীয় জাতীয়তাবাদ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যেতে এই স্থানীয় বুর্জোয়া শ্রেণী চায় না। তাদের উদ্দেশ্য কেন্দ্রের ক্ষমতা খর্ব করে নিজেদের ক্ষমতা বাড়ানো, নিজ নিজ রাজ্যে অন্তত নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখা এবং শ্রমিক-কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থানীয় ভাষা, কৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নতির নাম করে তাদের নেতৃত্বের আওতায় নিয়ে আসা। এই স্থানীয় জাতীয় একতার ধুয়া তুলে শ্রমিক-কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠনগুলোকে দুর্বল করে দিয়ে তাদের শোষণের পথ সহজ করে নেওয়াই এদের লক্ষ্য। অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুতে ও আসামে এই রকম স্থানীয়-জাতীয়তাবাদ আন্দোলন বা প্রাদেশিকতা সফল হয়েছে। একদিকে যেমন এরা শ্রমিক-কৃষকদের শ্রেণী সংগঠনগুলোকে দুর্বল করে দিতে পেরেছে, তেমনি আবার বৃহত্তর শক্তিশালী বুর্জোয়াদের হাত থেকে অন্তত স্থানীয় রাজ্য সরকার দখল করে লুটপাটের কিছুটা সুবিধা করে নিয়েছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্বিতীয় কারণ
পুঁজিবাদের পৃথিবীজোড়া সংকট

বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রথম কারণ আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি, পুঁজিবাদের অসমান বিকাশ। বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, পুঁজিবাদের পৃথিবীজোড়া সংকট। স্বাধীনতা পাবার পর থেকে ১৯৮০ সাল অবধি অর্থাৎ ৩৩ বছর ভারতের পুঁজিবাদীরা বেশ মনের সুখে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, নিত্য নতুন নতুন কল-কারখানা চালিয়ে শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের প্রাণ খুলে শোষণ করতে পারছিলো। কিন্তু ১৯৮০ সাল থেকে সমস্ত পৃথিবীজোড়া ব্যবসা-সংকট দেখা দেয়। তার ঢেউ ভারতবর্ষেও এসে পড়ে। ফলে ভারতবর্ষে লাভের খরতর স্রোত মন্দা হয়ে আসে। দেশের অনেক কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। হাজার হাজার মজুর ও কেরানী বেকার হয়ে পড়ে। ফলে স্থানীয় বুর্জোয়াদের কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন ভারতের বড় বুর্জোয়াদের উপর বিদ্বেষ আরও বেড়ে যায়। নিম্ন-মধ্যবিত্তদের ভেতর চাকরি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় ভয়ানকরূপে। ফলে অন্য প্রদেশের ভাষাভাষী চাকুরিওয়ালাদের উপর তাদের আক্রোশ গিয়ে পড়ে। তারা তখন ভাষা বা ধর্ম বা জাতপাতের নাম করে অন্য ভাষাভাষী বা অন্য ধর্মাবলম্বী বা অন্য জাতপাতের লোকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দাঙ্গা শুরু করে। এই সব কারণে বোম্বাই শহরে 'শিবসেনার' উৎপত্তি হয়েছে। বোম্বাইয়ের পাতি-বুর্জোয়া ও ছোট ছোট বুর্জোয়া শ্রেণী উচ্চবর্ণের লোকদের সংঘবদ্ধ করে ছোট জাতপাতের লোকদের তাদের জীবিকার ও মুনাফার উপর হস্তক্ষেপ করা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে শিবসেনা নামক এই উগ্রপন্থীসংগঠন সৃষ্টি করে। নিম্ন জাতপাতের ভেতরও বেশ কিছু বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে ইদানিংকালে। তারা আবার 'দলিত' নামে এক পাল্টা সংগঠন তৈরি করে নিম্ন জাতপাতের শ্রমিক-কৃষকদের দলে টেনে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। এইভাবে 'শিবসেনা' ও 'দলিত'দের সংঘর্ষে শ্রমিক-কৃষকদের শ্রেণী সংগঠনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাঝখান থেকে তারা সংগঠনের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায় বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের অবাধে শোষণ করার সুযোগ পাচ্ছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদের তৃতীয় কারণ
গ্রামে ধনী চাষীর হঠাৎ ধনবৃদ্ধি

বিচ্ছিন্নতাবাদের তৃতীয় কারণ হলো– গ্রামে ধনী চাষী শ্রেণীর হঠাৎ ধনবৃদ্ধি। ভারতবর্ষে বড় বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতায় আসার পরে রাজা, মহারাজা, জমিদার ও সামন্তদের উৎখাত করে দিলো বটে, কিন্তু গ্রামের জমি ছোট ছোট চাষীদের ভেতর বণ্টন করে দিলো না। বরং তারা গ্রামের বড় চাষীদের সঙ্গে জোট বেঁধে তাদের সাহায্যে ভোট যোগাড় করে ভারতবর্ষে রাজত্ব করতে লাগলো। এরপর তারা কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য 'সবুজ বিপ্লব' চালু করলো বড় চাষীদের সাহায্যে। প্রচুর ভর্তুকি দিয়ে সস্তায় রাসায়নিক সার ও উন্নত ধরনের ফসলের বীজ ও অল্প সুদে টাকা ধার দিয়ে ট্রাক্টর ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করে দিলো ধনী কৃষকদের জন্য। এর ফলে বড় চাষীরা আরো ধনী হয়ে উঠলো এবং তাদের হাতের প্রচুর পয়সা জমা হয়ে গেল। নানা রকম বিলাসিতার জিনিসপত্র, রেডিও, টি.ভি, স্কুটার ইত্যাদি কিনেও তারা তাদের টাকা পুরোপুরি খাটাবার সুযোগ পাচ্ছিল না। এদিকে তাদের ছেলেরা কলেজে পড়াশুনা করে দু'চারটা ডিগ্রী নিয়ে বেকার বসে থাকতে লাগলো। যথেষ্ট পরিমাণে কল-কারখানা স্থাপিত না হওয়ায়, এরা চাকরি পাচ্ছিলো না আর বাড়তি টাকাটাও খাটাতে পারছিলো না। এই অবস্থায় এসে এরা বড় পুঁজিপতি ও তাদের দখলে থাকা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর খুবই চটে যাচ্ছিলো। শেষ অবধি পাঞ্জাবের চাষীরা ও তাদের ছেলেমেয়েরা ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবার দাবি তুলে দিলো। পাঞ্জাবের 'খালিস্থান' আন্দোলনের এটাই মূল কারণ। 'শিখ ধর্ম বিপন্ন' ইত্যাদি ধর্মের নামে শ্লোগানগুলো বাহানা মাত্র। সব শ্রেণীর শিখদের তাদের দাবির পেছনে একত্রিত করার চেষ্টা মাত্র। এক্ষেত্রেও ভারতের বড় পুঁজিবাদীদের কল-কারখানা ভারতের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে না দিয়ে শুধু নিজেদের প্রদেশের ভেতরই সীমাবদ্ধ করে রাখা এবং নিজেদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে রাখার জন্য ভূমি-সংস্কারের কাজ মাঝ পথে বন্ধ করে দিয়ে ধনী কৃষকদের মদদ দেওয়ার নীতি ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য দায়ি।

লক্ষ্য করার বিষয় বিচ্ছিন্নতাবাদী ছোট বুর্জোয়ারা কখনো বলে না যে, তারা তাদের মুনাফা বজায় রাখার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী দল গঠন করছে বা চাকরিতে বহাল হবার জন্য আন্দোলন করছে। তারা কখনো ধর্মের নামে কখনো জাতপাতের নামে, কখনো ভাষা ও কৃষ্টির নামে, কখনো নিজেদের স্বাধীন সত্তার (Identity) নামে তাদের আন্দোলন চালায়। কারণ এই সব স্লোগানে সাধারণ মানুষ যাদের রাজনৈতিক চেতনা কম, তাদের ভুলিয়ে কাজে লাগান যায় সহজে। এইভাবে আমরা দেখি মুসলমান শ্রমিক-কৃষকদের মুসলমান বুর্জোয়া শ্রেণী 'বাবরি মসজিদ' বা 'ইসলামের শরিয়তের' নাম করে উত্তেজিত করে। আবার অন্যদিকে হিন্দু ছোট বুর্জোয়ারা 'রাম-জন্মভূমি' বা 'হিন্দু-ধর্ম বিপন্ন' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে হিন্দু শ্রমিক-কৃষকদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। এইভাবে ধর্মের নাম করে যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায় তাদের বলা হয় 'মৌলিকতাবাদী' বা 'ফান্ডামেন্টালিস্ট।' সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছো যে, ক্ষুদে জাতীয়তাবাদ বা মৌলিকতাবাদ হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা খেলা। জাতীয়তা বা ধর্মের নাম করে বা জাতপাতের নাম করে বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিক-কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের দলে টেনে নিতে চায় নিজেদের স্বার্থে। অবশ্য খণ্ড জাতীয়তাবাদের ভেতর কিছুটা ভাষার ও কৃষ্টির প্রতি দরদ থাকে, কিছুটা সত্যিকার দেশপ্রেমও থাকে, যেগুলোকে শ্রমিক শ্রেণী অবশ্যই তাদের ভাষা ও কৃষ্টি উন্নতির জন্য উৎসাহিত করবে। কিন্তু শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীকে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যাতে করে ক্ষুদে জাতীয়তা বা ধর্মের নামে বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের শ্রেণী চেতনাকে বিভ্রান্ত করে দিয়ে নিজেদের স্বার্থে তাদের কাজে না লাগায়।

তোমরা এখন বুঝতে পারছো– পুঁজিবাদী অসমান বিকাশের ফলে ও পুঁজিবাদী সংকটের ফলে জাতীয়তাবাদের সমস্যা গুরুতর আকারে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে বহু ভাষা-ভাষী ও বিভিন্ন কৃষ্টি সম্পন্ন বহু প্রদেশ আছে। পিছিয়ে পড়ে থাকা প্রদেশে ভাষার ভিত্তিতে জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে ঐ সব প্রদেশের নবজাত অপেক্ষাকৃত দুর্বল বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে। তামিলনাড়ুর 'দাবিদ' আন্দোলন, অন্ধ্রের 'অন্ধ্রদেশম' আন্দোলন, পাঞ্জাবের 'খালিস্থান' আন্দোলন, আসামের 'অহমিয়া' আন্দোলন, দার্জিলিং-এর 'গোর্খাল্যান্ড' আন্দোলন ও আদিবাসীদের 'ঝাড়খন্ড' আন্দোলন

প্রভৃতির মূলে রয়েছে এইসব জায়গার নবজাত ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণীর আরও বিকাশের দাবি, শিক্ষিত বেকার যুবকদের আরও চাকরির দাবি, ব্যবসা বাণিজ্যের আরো সুযোগ, ভারতের শক্তিশালী বড় পুঁজিবাদীদের দ্বারা একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এক কথায় নিজেদের প্রদেশের শ্রমিক-কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের শোষণ করার একচ্ছত্র অধিকার। যেহেতু সংখ্যায় কম কাজেই ভাষা ও কৃষ্টি বা ধর্মের দোহাই দিয়ে ও জাতীয়তার নাম করে অন্য সব শ্রেণীর মানুষকে এদের নেতৃত্বের নীচে জড় করে নিজেদের কাজ হাসিল করে নেওয়াটাই হলো এই স্থানীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আসল উদ্দেশ্য। এটাই হলো বিচ্ছিন্নতাবাদের আসল কথা।

জাতি গঠনের প্রধান উপাদান হলো ভাষা এবং দেশ ও দেশের কৃষ্টি। ভাষার উন্নতি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও দেশের কৃষ্টির উন্নতি সবাই চায়, বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের লোকেরা যারা খেটে খায় তারা। কারণ এ সবের যথাযথ উন্নতি হলে, তারাই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়। এই দিক থেকে এসব খণ্ড জাতীয়তা আন্দোলনের একটা উন্নতিমূলক দিক আছে, যেটাকে শ্রমিক-কৃষক ও সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষ সমর্থন করবে। কিন্তু স্থানীয় বুর্জোয়া শ্রেণী যখন নিজের স্বার্থে এই সব উন্নতিমূলক দাবি ব্যবহার করে শ্রমিক-কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের নিজেদের সংস্থাগুলোকে ভেঙ্গে তাদের অধীনে সংঘবদ্ধ হতে বলে, তখন তাদের সমর্থন করা অর্থ গরিব মানুষের স্বার্থে আঘাত করা।

প্রতিকার কী?

বিচ্ছিন্নতাবাদী স্থানীয় জাতীয়তা আন্দোলনের প্রতিকার তাহলে কী রকমভাবে হতে পারে? প্রথমত, স্থানীয় শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের সংস্থাগুলোকে আগে ভাগেই দাবি তুলতে হবে যাতে ভারতের একচেটিয়া বড় পুঁজিপতি স্থানীয় সম্পদ ও শ্রমশক্তির অবাধ ও অগাধ শোষণ বন্ধ করে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ভাষাভাষীর ও পেছনে-পড়ে-থাকা জন-সমষ্টিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যাতে তাদের উন্নতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাদের নিজেদের হাতেই থাকে।

অবশ্য শুধু বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের শোষণ বন্ধ করা ও স্বায়ত্তশাসন দিলেই স্থানীয় জাতীয় সমস্যার সমাধান হয় না। লেনিনের স্পষ্ট নির্দেশ-দুর্বল ও পেছনে-পড়ে-থাকা জাতি বা সম্প্রদায়ের লোকদের মন থেকে সন্দেহ, ভয় ও অভিমান দূর করে উন্নত জাতির শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের তাদের প্রতি

সদাসর্বদা মমতা, সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার প্রয়োজন। তাদের প্রতি যে এতোদিন অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে, তার জন্য উন্নত জাতির প্রকৃত খেদ ও অনুতাপ থাকা দরকার। এটাই স্থানীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের একমাত্র সমাধান। ভারতবর্ষকে এক করে ধরে রাখতে গেলে জোর করে, বল-প্রয়োগ করে তা বেশিদিন সম্ভব হবে না। স্বায়ত্তশাসন, দ্রুত উন্নতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ তার একমাত্র উপায়।

[আট]

পৃথিবীর রাজনীতি : বিপ্লবের পর্ব : মুক্তিযুদ্ধের পর্ব

কোন শ্রেণীর রাজনীতি?

রাজনীতির গোড়ার কথা অর্থাৎ রাজনীতির মূলের অর্থনীতি ও স্বার্থের কথা এতোক্ষণ বলেছি। তা থেকে এ কালের রাজনীতির সমস্ত চেহারা ভেবে-চিন্তে দেখলে ব্যাপারটা সঠিক বোঝা যায়। যেমন, এটা বুঝতে পারি-ক্যাপিটালিজম পেকে উঠে ইম্পেরিয়ালিজমের রূপ নেয়। আবার সেই ক্যাপিটালিজম থেকেই সোস্যালিজম-এর উদ্ভব হয়। তাহলে এ কালের রাজনীতির প্রধান কথাটা হলো এই যে, (১) ক্যাপিটালিজমের বা ইম্পেরিয়ালিজমের সঙ্গে একদিকে সোস্যালিজম-এর সংঘর্ষ, আবার (২) ইম্পেরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী জাতিদের বিদ্রোহ। এই দুই সংগ্রামের একটা মূলগত যোগ আছে, তাকে বলতে পারা যায় শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম, শোষণ অবসানের সংগ্রাম। অবশ্য তাছাড়াও যে (৩) ইম্পেরিয়ালিস্ট ক্যাপিটালিস্টদের নিজেদের মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষ আছে– তা তো বলেছি।

কিন্তু এই রাজনীতির চেহারাটা আরো সহজে বুঝতে পারা যায়, যদি আমরা একটু ইতিহাসের দিকে তাকাই। তাহলে দেখি, উৎপাদন পদ্ধতি বদলে গিয়ে কেমন করে নতুন ভাবে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, আর শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে কেমন করে এই সব রাষ্ট্রের ভাঙ্গা-গড়া বা পরিবর্তন ঘটছে। রাজনীতির মানেই হলো সমাজের এই পরিবর্তনকে ঠিক মতো বুঝে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করা। তাই সমাজে যখন যারা শাসক তারা তাদের শাসন পাকা করার জন্য যে সব

নীতি পদ্ধতি গ্রহণ করে, তা হলো তাদের রাজনীতি– শাসকের রাজনীতি। কিন্তু সমাজে যারা শোষিত, শাসিত তারা স্বার্থ বুঝে নিজেদের রক্ষার জন্য যে নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করে, তা হলো তাদের নিজেদের রাজনীতি– শাসিতের রাজনীতি। অর্থাৎ শাসকের রাজনীতি ও শাসিতের রাজনীতি এক নয়– যতোক্ষণ সমাজে শাসক ও শাসিত দু'শ্রেণী আছে। ধনিকের রাজনীতি আর শ্রমিকের রাজনীতিও তাই একবারে বিপরীত। ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনীতি আর শ্রমিক-কৃষকদের রাজনীতিও একবারে উল্টো। রাজনীতি বললেই তাই ভাবা উচিত– কোন শ্রেণীর রাজনীতি।

পৃথিবীর অসমান বিকাশ

আর একটা কথাও আমরা দেখছি– একালেও সব দেশে এখন পর্যন্ত ক্যাপিটালিজম উদ্ভূত হতে পারে নি। যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের চাপে অনেক ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশ এখনো ফিউডাল বা আধা-ফিউডাল স্তরে ঠেকে রয়েছে। পৃথিবীর দু-এক কোণে এমনকি আমাদের দেশেও আদিম সমাজও আছে, তাদের অবস্থা আরো খারাপ। তবে এরূপ আদিম সমাজ এদিকে গুরুতর নয়। অধিকাংশ ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশে যন্ত্রশিল্পও নেই, কেনাবেচার মত পণ্যও বিশেষ উৎপাদিত হয় না। এদের প্রধান উৎপাদন হচ্ছে জমি থেকে ফসল। আর জমির মালিক হচ্ছে জমিদার, জায়গীরদার, সামন্ত, রাজা প্রমুখ। কখনো কখনো মোহান্ত বা মহাজনরাও এরূপ জমির মালিক। তবে জমি চাষ করে, ফসল ফলায় চাষীরা। কিন্তু তারা জমির মালিক নয়, ফসলের মালিক নয়। কখনো ফসলের একটা অংশ মাত্র চাষীরা পায়, ফসল জমা দিতে হয় জমিদার, মোহান্তের খামারে, রাজবাড়িতে। এমনি করে তন্তুবায়, কর্মকার, চর্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার ও মিস্ত্রি প্রভৃতি কারিগররাও এসব মালিকদেরকেই জিনিস জোগায়, তাদের থেকে সেজন্য পায় 'চাকরাণা' জমি। গ্রামের কৃষকের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় দ্রব্যও কর্মকার, কুম্ভকাররা যোগায়, জমিদারদের প্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্যও কিছু কিছু উৎপন্ন করে। দ্রব্যের কেনাবেচা সামান্যভাবে চলে বেণে-ব্যবসায়ীদের মারফৎ– তারা জিনিসের বদলে জিনিস যোগায়, শিল্পী-কারিগর ও মিস্ত্রিদের দাদন দেয়। আবার শিল্পীদের উৎপন্ন বস্ত্র, মসল্লা প্রভৃতি বিদেশে চালান দেয়। মোটামুটি বলতে গেলে এই হলো সামন্ততন্ত্রের রূপ। অর্থাৎ এই জমিদার-মহাজন আর কৃষিজীবী ছোট কারিগর-ব্যবসায়ী ও বেণে নিয়ে এই সমাজ।

আমরা আমাদের দেশে এতোদিন এরূপ সমাজই দেখতাম। কারণ এই দেশ ছিলো সাম্রাজ্যবাদের আওতায় আধা-ফিউডাল দেশ। এদেশের মধ্যেও ফিউডাল শাসন বা সামন্তদের আধিপত্য এখনও বেশি আছে রাজস্থানে এবং পূর্বেকার দেশিয় রাজাদের রাজ্যগুলিতে। তার চেয়েও বেশি তা নেপালে রয়েছে। আসলে এশিয়ায় (জাপানকে বাদ দিলে), আফ্রিকায়, এমনকি দক্ষিণ আমেরিকায়ও এই সামন্ততন্ত্রেরই এ স্তর বা অন্য স্তর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও বজায় ছিলো। এখন সাম্রাজ্যবাদ লোপ পেতে থাকায় অবস্থা বদলাতে আরম্ভ করেছে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি– একটি হলো, পৃথিবীর সব দেশ বা সব অঞ্চলের উৎপাদন-ব্যবস্থা এখনো এক রকম নয়, যদিও সকলের উপরে এখনো আধিপত্য করছে ক্যাপিটালিস্ট উৎপাদন-ব্যবস্থা। কিন্তু তার আধিপত্যও ভাঙতে আরম্ভ করেছে, কারণ সমাজতন্ত্রী উৎপাদনও এখন প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। তবে ঐ কথাটাই মনে রাখার মতো যে, পৃথিবীর অর্থনৈতিক বিকাশ অসমান, কোনও অঞ্চল এগিয়ে এসেছে, কোনও অঞ্চল পিছিয়ে আছে। তাই যদিও মোটের উপর এটা সোস্যালিজম–এর যুগের সূচনা হয়েছে, তবু সোস্যালিজমের স্তরে পৌঁছাতে এসব প্রতিটি দেশই আবার নিজের বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী কেউ এগিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ পিছিয়ে যাচ্ছে।

তবে যে সব দেশ ফিউডাল অবস্থায় আছে তারাও অন্যদের দৃষ্টান্ত দেখে এখন দ্রুততর গতিতে এগিয়ে যেতে পারে। পৃথিবীতে মধ্যযুগের ফিউডাল শক্তির হাত থেকে বুর্জোয়ারা প্রথম ক্ষমতা দখল করে ব্রিটেনে ১৬৪০-১৬৮৮'র মধ্যে। তাই তারাই তখন হয় পৃথিবীতে অগ্রগামী জাতি। এই তিন শ' বছর সেখানে বুর্জোয়া ব্যবস্থা চলছে। তাই বলে সব দেশ অমন তিন শ' বৎসর বসে বুর্জোয়া ব্যবস্থার তাঁবেদারী না করলে তারা সোস্যালিজমের স্তরে পৌঁছাবার যোগ্য হবে না– এমন আজগুবি কথা কেউ বলে না। বরং অনেক আগেকার সুসভ্য দেশ যেমন ফিউডাল ব্যবস্থায় আটকে গিয়ে আর অগ্রগামী হতে পারে নি, তেমনি ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বুর্জোয়া শাসিত দেশগুলিরও এখন হয়েছে ঠিক সেই অবস্থা। তারা ধনিকতন্ত্রের পচা জলের ডোবায় আটকে পড়েছে, এগিয়েও এগুতো পারছে না। অথচ পৃথিবীতে ক্যাপিটালিজম-এর যুগ ফুরিয়ে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক যুগের সূচনাও হয়ে গিয়েছে ১৯১৭-এর 'অক্টোবর বিপ্লবে'। পৃথিবীর একালের রাজনীতি আজও এই ঘটনাটি ঘিরে আবর্তিত, ওই তারিখ থেকে তার সূত্রপাত।

সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের যুগ

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে বলশেভিক দলের নেতৃত্বে রুশদেশে বিপ্লব হয়। সে বিপ্লবের অধিনায়ক ছিলেন লেনিন। বলশেভিকদের নেতৃত্বে সারা দেশে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকেরা একযোগে নীচে থেকে উপর পর্যন্ত ছোট ছোট সমিতি বা সোভিয়েত গড়ে রাষ্ট্রভার সে সব সোভিয়েতের হাতে দেয়। এভাবে ধনিক শ্রেণীর হাত থেকে সে দেশের গভর্নমেন্ট শ্রমিক ও দরিদ্র জনসাধারণের হাতে চলে যায়।

রুশদেশে শ্রমিকদের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ায় সমস্ত পৃথিবীর পুঁজিবাদীরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে। কারণ রুশদেশের শ্রমিকদের দেখাদেখি তাদের দেশের শ্রমিকরাও যদি উৎসাহিত হয়ে বিপ্লব ঘটিয়ে বসে, সেই ভয়ে তারা ধনীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য রুশদেশের শ্রমিকদের বেশ কিছু শিক্ষা দিয়ে অঙ্কুরেই শ্রমিক-কৃষকের শাসন বিনাশ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মানি, জাপান, আমেরিকা, পোল্যান্ড, রুমানিয়া প্রভৃতি ১১টি পুঁজিবাদী দেশ তখন (১৯১৭-১৯২০) রুশ দেশে সৈন্য পাঠায় শ্রমিকশ্রেণীকে ধ্বংস করে দিতে। কিন্তু বিপ্লবীদের লাল ফৌজের বিক্রমের কাছে এরা কেউ টিকতে পারে না। তাছাড়া ঐ সব দেশের শ্রমিকরাও দাবি করতে থাকে যে, রুশদেশ থেকে সৈন্যসামন্ত সব ফিরিয়ে আনা হোক। এই দুই কারণে পুঁজিবাদীরা তখনকার মতো রুশদেশ থেকে 'পরে দেখে নেবো' বলে পরম বিক্রমে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ করে 'ছোট লোকের' দেশ রুশিয়াকে ঠাণ্ডা করতে না পারলেও পুঁজিবাদীরা তখন অর্থনৈতিক বয়কট করে তাকে জব্দ করার চেষ্টা করতে থাকে। রাশিয়ার সঙ্গে মালপত্র কেনাবেচা করা, টাকা ধার দেওয়া ইত্যাদি সব বন্ধ করে রাশিয়াকে 'ভদ্র' পুঁজিবাদী সমাজ থেকে একঘরে করে রাখে। এর ফলে রাশিয়াকে কষ্ট পেতে হয় খুব। তিন বছর যুদ্ধ, তার উপর দুবছর গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি কারণে রুশদেশের উৎপাদন খুব কমে যায় এবং দেশে দুর্ভিক্ষ হয়ে অনেক লোক মারা পড়ে।

পুঁজিবাদীরা ভেবেছিলো, এবার সোভিয়েত দেশ সাবাড় হলো। কিন্তু দুর্ভিক্ষকেও ক্রমশ সোভিয়েত দেশ পরাস্ত করে দিলো। গৃহযুদ্ধ ও বিদেশিদের আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলো, উৎপাদন সামান্য, যানবাহন সব ভাঙা-চোরা। তাই এ সময়ে (১৯২১) উৎপাদন বাড়াবার জন্য এবং দেশের জীবনযাত্রা গুছিয়ে নেওয়ার জন্য কৃষকদের ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের লাভের

সুযোগও দেওয়া হয়। ওটা সমাজতন্ত্র নয়। শুধু অবস্থা সামলাবার জন্য একটু পিছু হটা সাময়িকভাবে। এই নীতিকে বলা হয় 'নয়া আর্থিক নীতি' বা 'নেপ'। এর ফলে সব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে রুশদেশ দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করতে থাকে। ক্রমে বহু দেশ ও জাতিকে স্বাধীনতা দিয়ে একত্র করে তারা গড়ে তুললো সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত সংঘ।

এই অক্টোবর বিপ্লবে তাই পৃথিবীর রাজনীতিতে নতুন এক জিনিস জন্ম নিলো, তার নাম সোভিয়েত সমাজতন্ত্র। পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পশ্চিমে বালটিক সাগর পর্যন্ত নানা জানি নানা দেশের মানুষ নিয়ে এই সোভিয়েত সংঘ। এতোদিন পুঁজিবাদীদের নিজেদের ভেতর রেষারেষি, সাম্রাজ্য লাভের ইচ্ছা, পুঁজিবাদী দেশের আক্রমণের ভয় ইত্যাদি ছিলো। এখন তাছাড়াও আর এক নতুন উপসর্গ এসে জুটলো, তা হচ্ছে 'বলশেভিক ভীতি'। রুশদেশের শ্রমিক বিপ্লবের নাম ছিলো বলশেভিক বিপ্লব। বলশেভিক রুশিয়ার সাফল্য দেখে, তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি পুঁজিবাদীদের নিজের দেশের শ্রমিকশ্রেণী বলশেভিকদের মতো বিপ্লব করে বসে- এই ভয় পুঁজিবাদীদের সন্ত্রস্ত করতে থাকে।

ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর রাজনৈতিক চালবাজির মোটামুটি উদ্দেশ্য ছিলো সাম্রাজ্যহীন দেশগুলোর আক্রমণ থেকে নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষা করা এবং শ্রমিক-বিপ্লব যাতে নিজেদের দেশে না ছড়িয়ে পড়ে তার চেষ্টা করা। জার্মানি, ইতালি, জাপান প্রভৃতি সাম্রাজ্যহীন দেশগুলির উদ্দেশ্য ছিলো নিজেদের দেশ থেকে ও অন্যান্য দেশ থেকে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে দূর করা এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার করা। তাই সাম্রাজ্য বিস্তারের বিষয় নিয়ে কলোনিহীন ও কলোনিওয়ালা পুঁজিবাদী দেশগুলোর ভেতর রেষারেষি বাড়তে থাকে। ১৯২৯ সালের ব্যবসা সংকটের ফলে এই রেষারেষি চরমে ওঠে। ব্যবসা সংকটের ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলোর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করে। অসংখ্য কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং কোটি কোটি মানুষ বেকার হয়ে পড়ে।

এর ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলোর ভেতর ঝগড়া আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কলোনিহীন ফ্যাসিস্ট দেশগুলো- জার্মানি, ইতালি ও জাপান এক সঙ্গে হয়ে একটা জোট তৈরি করে। তার নাম হলো 'এক্সিস শক্তি' বা 'অক্ষ শক্তি'। এরা কলোনি আদায় করার জন্য যুদ্ধ করার সবরকম প্রস্তুতি নিতে থাকে। জার্মানির নাৎসিরা ইউরোপের একটার পর একটা দেশ দখল করে সেই সব দেশের ধন-সম্পদ ও কাঁচামাল যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম উৎপাদনের কাজে লাগাতে থাকে।

জাপানিরাও মাঞ্চুরিয়া ও চীনের অনেক শহর দখল করে নিতে থাকে এবং ইটালি আবিসিনিয়া জয় করে আফ্রিকার দিকে নজর দেয়।

এদিকে ব্রিটিশ ও ফরাসীরা প্রধান সাম্রাজ্যবাদী কলোনিওয়ালা দেশ। তারা ফ্যাসিস্টদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য অন্য আর এক জোট তৈরি করে। তার নাম হলো 'এলায়েড শক্তি' বা 'মিত্র শক্তি'। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি বাড়তে বাড়তে উভয় পক্ষই এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছায় যে, যুদ্ধ ছাড়া তাদের আর উপায় থাকে না। অবশেষে ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। রাশিয়া এক দারুণ কূটনৈতিক চাল খেলে হিটলারের সঙ্গে এক সন্ধি করে এই যুদ্ধের বাইরে থেকে যায় এবং বুর্জোয়া রাজ্যগুলোর নিজেদের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে শক্তি ক্ষয় করায়। কিন্তু রাশিয়া বেশিদিন এ সুযোগ ব্যবহার করতে পারে নি। ১৯৪১ সালের ২২ শে জুন হিটলার সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করে। ফলে সোভিয়েতও মিত্র শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকে হিটলারের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য। ক্রমে এই মিত্রশক্তির পক্ষে আমেরিকাও এসে যোগ দেয়।

এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ফলাফল তোমরা জানো। যুদ্ধে এক্সিস শক্তির দেশগুলো হেরে যায়। হিটলার আত্মহত্যা করে। মুসোলিনীকে শ্রমিকরা হত্যা করে। জাপান যুদ্ধের হেরে গিয়ে আত্মসমপর্ণের কথা ভাবছিলো। এমন সময় আণবিক বোমা পরীক্ষা করার জন্য আমেরিকা জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসিকি নামক দুটো শহরে দুটো আণবিক বোমা ফেলে। এই আণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে মুহূর্তের ভেতর হিরোসিমা ও নাগাসিকির কয়েক কোটি নিরীহ শহরবাসী জ্বলে পুড়ে মারা পড়ে এবং বাকিরা চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে যায়। এরূপ নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো ঘটে নি। পুঁজিবাদীরা নিজের মুনাফা ও কলোনির জন্য যে কোনো অমানুষিক কাজ করতে কুণ্ঠিত হয় না, এই আণবিক বোমা অপ্রয়োজনে নিক্ষেপ তার প্রমাণ।

যুদ্ধের পর জার্মান, ইটালি ও জাপানের বুর্জোয়া শ্রেণী যে শুধু দুর্বল হয়ে পড়লো তা নয়, যুদ্ধে জয়ী ব্রিটেন ও ফরাসীরাও সমান কাবু হয়ে পড়লো। শুধু আমেরিকার বুর্জোয়া শ্রেণী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। যুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রি করে আমেরিকার বুর্জোয়া শ্রেণী প্রচুর লাভবান হয়েছিলো। এবার তারা সমগ্র পৃথিবীর বাজার দখল করে নিলো। অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী কিছুটা তাদের তাঁবেদার হয়ে থাকলো।

যুদ্ধের রাজনৈতিক ফল

(১) পিপলস রিপাবলিকসমূহের জন্ম : ব্রিটিশ ও আমেরিকার পুঁজিবাদীরা যদিও সাম্রাজ্য রক্ষার দুশ্চিন্তায় ও জনমতের চাপে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো, তথাপি যুদ্ধে জয়লাভ করে সোভিয়েত দেশ তার শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করুক- এ তারা চাইত না। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, যখন যুদ্ধ শেষ হবে তখন সমস্ত কলোনিগুলো নিজেরা দখল করে নেবে এবং যুদ্ধশেষে তাদের পক্ষীয় প্রতিক্রিয়াশীলরাই ইউরোপের দেশগুলোর শাসক হবে। কিন্তু সে সব দেশের মানুষ ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে নিজেদের মুক্তিসংগ্রামে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য গণতন্ত্রী দলের সঙ্গে একত্রিত হয়েছিলো। একসঙ্গে মিলে এরা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুললো। তাই বিজয়ী লালফৌজ যখন পোল্যান্ডে, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, যুগোশ্লাভিয়ায়, হাঙ্গেরিতে, রুমানিয়ায়, বুলগেরিয়ায়, আলবেনিয়ায় এসে পৌঁছালো তখন এই মুক্তিযোদ্ধারা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে স্বীয় 'জনতার গণতন্ত্রী সরকার' স্থাপন করতে সমর্থ হল। এইটি যুদ্ধের প্রধান একটি কথা। পূর্ব-ইউরোপের জনতার গণতন্ত্রী সরকার অবশ্য বেশিদিন টেকে নি। কী কী কারণে এই গণতন্ত্রী সরকারগুলো ধ্বংস হলো, তা আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

(২) এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন : ইউরোপে যেভাবে নাৎসীদের পরাজয়ের ভেতর দিয়ে গণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে, এশিয়াতেও তেমনি জাপানের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এশিয়ার ঘুমন্ত মানুষ হাজার হাজার বছরের ঘুম কাটিয়ে জেগে উঠেছে। ইউরোপের মতোই চীন, ফিলিপাইন, আনাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশেও শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং এইসব দেশের জনগণ জাপানি ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে খুব শক্তিশালী সংগঠন ও সৈন্যবাহিনী তৈরি করে ফেলে। ইংরেজ, ওলন্দাজ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা শত চেষ্টা সত্ত্বেও এদের আর যুদ্ধের ওপর চেপে রাখতে পারে নি। এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তাই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সার্থকতার দিকে এগিয়ে যায়, এটাও এ যুদ্ধের প্রধানতম একটি ফল।

(৩) চীনে জনায়ত্ত গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চীনে যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হলো, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের বহু আগে থেকেই সেদেশে চিয়াং-কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে

কমিউনিস্টদের গৃহযুদ্ধ চলছিলো। যুদ্ধের সময় চিয়াং-কাই-শেক ও তার জাতীয়তাবাদী কুমোনিটাং দল জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অজস্র মার্কিন ডলার ও অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে। কিন্তু তারা তা জমিয়ে রাখে মাও-সে-তুং ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বলে। মাও কিন্তু জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সকল চীনের সম্মিলিত প্রতিরোধ রচনা করতে থাকেন এবং সেই প্রতিরোধে চিয়াং-কাই-শেককেও যোগ দিতে বাধ্য করেন। যুদ্ধের পর তাই মাও ও কমিউনিস্টরাই হয়ে দাঁড়ালো চীনের স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্রী মানুষের প্রিয় নেতা। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নতুন চীনের অভ্যুদয়ের আয়োজনটি সম্পূর্ণ হয়। যুদ্ধ শেষে কমিউনিস্টদের কাছে চিয়াং পরাস্ত হলে ১লা অক্টোবর ১৯৪৯ সালে 'চীনা জনায়ত্ত গণতন্ত্রী প্রজাতন্ত্রে'র প্রতিষ্ঠা হয়। তা শুধু যুদ্ধের কেন, পৃথিবীর একটা প্রধানতম ঘটনা।

(৪) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন : যুদ্ধের বহু আগে থেকেই সব কলোনিগুলোতে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চলছিলো। যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা যখন দুর্বল হয়ে পড়লো, তখন আর তাদের চেপে রাখা গেল না। বিশেষ করে ভারতের জনগণ আর একদিনের জন্যও বৃটিশ শাসন বরদাস্ত করতে রাজি হলো না। সমস্ত দেশে তুমুল অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়লো। যুদ্ধকালে ব্রিটিশ বিরোধিতা ভারতবর্ষে একেবারে তুঙ্গে ছিলো। ভারতের স্বাধীনতাকামী জনগণ অনেকটা 'শত্রুর শত্রু' বলেই যুদ্ধকালে জাপানী জার্মানির সহায়তা নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি। বিদেশে সুভাষচন্দ্র এই কারণেই আজাদ-হিন্দ-ফৌজ গঠন করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেণ। দেশের অভ্যন্তরে ১৯৪২-এর ৯ই আগস্ট জাতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করলো, 'ইংরেজ ভারত ছাড়', 'কুইট ইন্ডিয়া'। এ সময় জাতীয় নেতাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা গ্রেপ্তার করলে দেশের জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে ব্রিটিশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ ব্যবস্থায় দেশে দুর্নীতি ও দুর্ভিক্ষ ভয়ঙ্কর হয়। এ সব মিলে যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ বারুদের স্তুপের মতো হয়ে থাকে।

যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ১৯৪৫ এর নভেম্বরে আজাদ-হিন্দু-ফৌজের মামলা উপলক্ষ করে এই গণমুক্তির চেতনা বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করতে থাকে। অবশেষে ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহে এর প্রচণ্ড প্রকাশ দেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সত্যি সত্যি বুঝতে পারলো যে ভারতকে আর অধীন করে রাখা যাবে না। যতোটা পারা যায় ব্রিটিশ স্বার্থ বজায় রেখে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে দ্রুতই একটা রফা করে ফেলা তারা যুক্তিযুক্ত মনে করলো। সমগ্র দেশ যে

একটা সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, একথা তারা বেশ টের পাচ্ছিলো। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর বড় বড় নেতারা দেশের এই বিপ্লবের দিকে দ্রুত গতি দেখে উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন। দেশে বিপ্লব হলে শুধু ইংরেজ রাজত্বই শেষ হবে না, দেশি বুর্জোয়াদের কর্তৃত্বও খতম হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই তারাও ব্যগ্র হয়ে উঠলো যে করেই হোক, যে কোনো শর্তে ইংরেজদের সঙ্গে একটা রফা করে ফেলা। ধূর্ত ইংরেজ ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর এই দুর্বলতার কথা টের পেয়ে ভারতকে ভাগ করে দুটো দুর্বল রাষ্ট্র তৈরি করার চক্রান্ত করলো। ভারতের ইংরেজদের পুঁজি সম্পূর্ণ রক্ষা পাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বুর্জোয়া নেতারা খণ্ডিত ভারতের শাসনাধিকার কিনে নিলো।

পৃথিবীজোড়া মুক্তিসংগ্রাম

ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজয়ে অনেক জাতি ইউরোপে স্বাধীন হলো। এশিয়ার ব্রিটিশ, ফরাসী ও ডাচ সাম্রাজ্যবাদের অধীন উপনিবেশগুলি এবং তাদের 'আশ্রিত' জাতিগুলিও যুদ্ধের পরে স্বাধীন হতে চেষ্টা করলো। এসব অনেক দেশ জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রিটিশ, ফরাসী, ডাচ প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদীদের তাড়িয়ে কেড়ে নিয়েছিলো। জাপান পরাজিত হলে ব্রিটেন, ফরাসী ও ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের চেষ্টা ছিলো যুদ্ধের আগের অবস্থা পুনর্বহাল করা। কিন্তু যুদ্ধের আলোড়নে ঐসব দেশ তখন মুক্তি-সংগ্রামে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। জাপানী, ব্রিটিশ, ফরাসী, ডাচ ও মার্কিন কোনো সাম্রাজ্যবাদীকেই তারা আর বরদাস্ত করবে না। ব্রহ্ম, মালয় নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাই বিব্রত হয়ে পড়লো, ভারতবর্ষে, সিংহলে তাদের বিপদ ছিলোই। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ইন্দোচীন উদ্ধারের কোনো পথ খুঁজে পেল না। ইন্দোনেশিয়া (যবদ্বীপ) স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলো। ডাচ সাম্রাজ্যবাদ কৌশলে সেখানে গিয়ে আবার নিজের দখল জাহির করতে চাইছিলো। সৈন্য দিয়ে আর এসব দেশকে জয় করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠছে। তাই সাম্রাজ্যবাদীদের একদিকে চেষ্টা হলো মার্কিন সাহায্য নিয়ে দেশগুলিতে নিজেদের দখল রাখা আর প্রত্যেক দেশের মধ্য থেকে সে দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত করে তাদের মারফত স্বনামে বা বেনামে সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার শাসন কায়েম করা। কিন্তু এটা বোঝা গেল, পরাধীন জাতির মুক্তি-সংগ্রাম অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে- সাম্রাজ্যবাদীদেরও আর সে দিন নেই যে, তা অস্ত্রবলে সর্বত্র দমন করবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে সব দেশ স্বাধীন হলো তার মধ্যে আমরা- ভারত ও পাকিস্তান আছি। আর জনগণতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠা করে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে গেল, যারা তার মধ্যে চীন পড়ে, উত্তর কোরিয়া পড়ে, আর কিছু পরে হলেও উত্তর ভিয়েতনামও পড়ে। তাদের স্বাধীনতার ও মুক্তি সংগ্রামের ঢেউ আর থামলো না। এশিয়া ছাপিয়ে তা আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়লো এবং দক্ষিণ আমেরিকাকেও স্পর্শ করলো। ফলে দেখতে না দেখতে প্রথমেই স্বাধীন হলো পশ্চিম আফ্রিকার ঘানা রাজ্য। তারপরে সেই ঢেউ সমস্ত আফ্রিকাকেই প্রায় ভাসিয়ে দিয়ে যায়। একভাবে না একভাবে আজ উত্তর আফ্রিকার মিশর, সুদান, লিবিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রায় সকল আরব জাতির মানুষেরা স্বাধীন হল, এবং সাহারার দক্ষিণের আফ্রিকায়ও অধিকাংশ জাতি স্বাধীন হতে লাগলো (সাধারণভাবে এই সাহারার দক্ষিণের আফ্রিকাকেই বলে 'কৃষ্ণ আফ্রিকা') তথাপি তখনো সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শোষণবাদীরা অনেক জাতিকে পদানত করে রেখেছিলো। যেমন, মার্কিন বেলজিয়ান শোষকরা কঙ্গোর লমুম্বার মতো নেতাকে হত্যা করে কঙ্গোকে কার্যত তাঁবেদার করে রেখেছিলো। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা 'এঙ্গোলা' কে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলো। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা 'রোডেশিয়া' দখল করে বসেছিলো। কিন্তু বেশিদিন তারা এ সব দেশ ও লোককে অধীনে রাখতে সফল হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় অবশ্য এখনও শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা পুরোপুরি হিটলারী কায়দায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের প্রায় বিলুপ্ত করতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু সেখানেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। অবশ্য আরেকটা কথাও আছে, এসব নতুন স্বাধীন জাতিরাও এখনো নানা উপজাতিতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে আবার উপজাতিক সর্দার ও তাদের বংশধররা চায় দেশের উপর তাদের শোষণ বজায় থাক। কাজেই সাম্রাজ্যবাদীরা সর্দারদের মধ্যে নানা চক্রান্ত চালাচ্ছে। স্বাধীন হলেও এসব কোনো কোনো রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে বিদ্রোহ, বিভেদ লেগে আছে। অন্য দিকে অবশ্য সোভিয়েত প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী দেশগুলো চেষ্টা করেছে ওসব দেশের যুবকদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাড়াতাড়ি স্বদেশ গঠনের উপযোগী করে তুলতে। তারা তখন ছিলো ওসব দেশের প্রকৃত ভরসা।

ভিয়েতনাম ও কিউবার মুক্তিসংগ্রাম

মুক্তিসংগ্রামে যে দেশ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে পৃথিবীর অত্যাচারিত ও নিপীড়ত জনগণকে সবচেয়ে বেশি উদ্দীপিত করতে পেরেছে সে হলো ভিয়েতনাম। যখন মাত্র তিন কোটি দশ লক্ষ লোকের এই ছোট্ট দেশের জনগণ বিশাল ও শক্তিশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের তাঁবেদার শ্রেণীকে দেশ থেকে যুদ্ধে পরাজিত করে বিতাড়িত করলো, তখন সমগ্র পৃথিবীর মানুষ একান্ত বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারেনি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়ে, সব রকম মারণাস্ত্র ব্যবহার করেও ভিয়েতনামের ছোট ছোট রোগা মানুষগুলোকে দমাতে পারেনি। নাপালাম নামে এক রকম বোমা ফেলে গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করেছে। বিষাক্ত গ্যাস ফেলে সমস্ত প্রাণী ধ্বংস করেছে। জঙ্গলে যাতে গেরিলা যোদ্ধারা লুকিয়ে থাকতে না পারে, তার জন্য নানা রকম বিষাক্ত ঔষধ ছড়িয়ে গাছপালা ধ্বংস করেছে। অত্যন্ত বর্বরতার ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। আমেরিকার সাধারণ মানুষদের স্বভাবত দয়ালু স্বভাব নষ্ট করে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা ভিয়েতনামে তাদের পশুর পর্যায়ে এতোটা নামিয়ে দিয়েছিলো তারা মেয়েদের গা থেকে জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া খুলে নিতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু এতো অত্যাচারের ফল উল্টোই হয়েছে। ভিয়েতনামীদের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা আরও বেড়েছে এবং আরও মরিয়া হয়ে তারা তাদের স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রবাদের জন্য জীবন পণ করে লড়েছে। দীর্ঘ ৩০ বছর অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার, সাহসিকতা ও আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করে তারা আমেরিকার মতো দুর্ধর্ষ শত্রুকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। আজ তাই পৃথিবীর সকল দেশের সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক আন্দোলন অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভিয়েতনামকে স্মরণ করে। সকল দেশের পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা 'ভিয়েতনাম' শুনলেই ভয়ে কম্পমান হয়ে ওঠে।

ভিয়েতনাম গত মহাযুদ্ধের আগে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কলোনি ছিলো। যুদ্ধের সময় জাপানীরা সহজেই ফরাসীদের তাড়িয়ে ভিয়েতনাম দখল করে। জাপানীদের বিরুদ্ধে হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকে। যুদ্ধের পর ফরাসীরা আবার অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ফিরে আসে তাদের কলোনি দখল করার জন্য, কিন্তু কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুদ্ধে তারা

পরাস্ত হয়। দিয়েন-ভিয়েন-ফু নামে একটা জায়গায় যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যরা এমন ভাবে পরাস্ত হয় যে তাদের প্রাণ নিয়ে পালাবারও অবকাশ পায় না। সমগ্র ভিয়েতনাম কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাচ্ছে দেখে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে 'বাও দাই' নামে তাদের এক তাঁবেদারকে রাজা বলে দাঁড় করায়। বাও দাই –এর অপদার্থতা প্রমাণিত হতে বেশি দিন লাগে নি। বাও দাইকে সরিয়ে আমেরিকানরা একজনের পর একজন সেনাপতিকে একচ্ছত্র শাসক নিযুক্ত করে, কিন্তু কিছুতেই কিছু লাভ হয় না।

শেষ অবধি আমেরিকান সৈন্যরা নিজেরাই বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক, কামান ও নানা প্রকার রাসায়নিক বোমা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়ে। কিন্তু তাতেও কিছু হয় না। আমেরিকার সৈন্যেরা এতো বেশি বেশি সংখ্যায় মরতে থাকে যে তাদের দেশের মানুষ শান্তির জন্য জোর আন্দোলন আরম্ভ করে। অপরদিকে আমেরিকার তাঁবেদার ভিয়েতনামী সেনাপতিরা আমেরিকার টাকা, সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে আলাদা ঘোষণা করে উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতাকামী গেরিলা যোদ্ধাদের সঙ্গে যে যুদ্ধ চালাচ্ছিলো তাতে ক্রমেই পিছু হটতে থাকে। পিছু হটতে হটতে তারা শেষ অবধি দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সাইগনে আশ্রয় নেয়। উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যরা গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সাইগন অবরোধ করে ফেললো এবং সাত দিনের ভেতর শহর দখল করে ফেললো। আমেরিকান ও তাদের দালালদের যে যেভাবে পারে পালালো। আমেরিকানরা হেলিকপ্টারে দলে দলে আমেরিকার দূতাবাসের ছাদ থেকে পালালো। তাদের হেলিকপ্টারে ঝুলে ঝুলে তাঁবেদাররা কিছু কিছু পালাতে পারলো। জাহাজে নৌকায় করেও কিছু কিছু পালালো। যারা পালাতে পারলো না, তারা গা ঢাকা দিয়ে থাকলো। কিন্তু বেশির ভাগই আত্মসমর্পণ করলো। এই সব সৈন্য ও সেনাপতিদের এবং ঘুষখোর ও দুর্নীতি পরায়ণ সরকারি কর্মচারীদের কমিউনিস্ট সরকার ৩ মাস থেকে ১ বছরের জন্য শিক্ষাশিবিরে নিয়ে গিয়ে তাদের নতুন ভাবে জনসেবায় আত্মনিয়োগের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললো। এইভাবে তারা দক্ষিণ ভিয়েতনামীদের অত্যাচারের বদলা না নিয়ে তাদের চরিত্র সংশোধন করে দেশ পুনর্গঠনের কাজে তাদের লাগাবার চেষ্টা করলো।

আর একটা ছোট্ট দেশ যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয়েছে- সেটা হলো কিউবা। আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট ও তাঁবেদার ডিক্টেটার বাতিস্তার বিরুদ্ধে অসীম সাহসের সঙ্গে মাসের পর মাস গুহায় কাটিয়ে ফিডেল ক্যাস্ট্রোর

অসাধারণ নেতৃত্বে কিউবার নিষ্পেষিত জনগণ সশস্ত্র বিদ্রোহ সফল করে এবং বাতিস্তাকে তার সাঙ্গ-পাঙ্গ ও অন্যান্য মার্কিনি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেশ থেকে বিতাড়িত করে এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করে।

আজ কিউবার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার ছোট বড় সব দেশেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠছে। সেখানকার দরিদ্র, অত্যাচরিত ও যুগ যুগ ধরে শোষিত চাষী-মজুররা আর জমিদার, জোতদার ও মালিক শ্রেণীর শাসন মানতে চাইছে না। তাই আমরা দেখতে পাই, নিকারাগুয়ার মতো ছোট দেশ– একমাত্র কলা রপ্তানি করে যারা বেঁচে থাকতো, তারাও আজ প্রকাশ্যে আমেরিকা ও তার তাঁবেদার স্থানীয় শাসক শ্রেণীকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে এবং শাসন-ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয় নি যেখানে

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে সব দেশেই সফল হতে পেরেছে- তা নয়। অনেক দেশেই জনগণের বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান কঠোরতার সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণী দমন করতে সমর্থ হয়েছে এবং সাময়িকভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে অনেকটা দুর্বল করে ফেলতে পেরেছে। এই সব বিফল আন্দোলনের ভেতর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো দক্ষিণ আমেরিকার চিলির আন্দোলন ও পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়ার আন্দোলন। দক্ষিণ আমেরিকায় মাত্র ২টা দেশ ছাড়া (উরুগুয়ে ও চিলি) আর সব দেশেই বুর্জোয়া একনায়কত্ব ছিলো। চিলিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্র চালু ছিলো এবং ভোটের জোরে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আলেন্দে প্রেসিডেন্টের পদে জয়লাভ করেন। কিন্তু তিনি বুর্জোয়া শ্রেণী যে নামে মাত্র গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং প্রয়োজন হলে গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে নিষ্ঠুর মিলিটারীরাজ স্থাপন করে সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে যখন বুর্জোয়া শ্রেণী দেখলো যে, তারা শাসন-ক্ষমতা হারাতে বসেছে। তখন আমেরিকার সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত করে বড় বড় সেনাপতি ও তাদের অনুচর সৈন্যদের হাত করে ফেললো। আমেরিকার বড় বড় ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো ও খনির মালিকরা এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলো ও প্রচুর অর্থ সাহায্য করলো। তারপর একদিন হঠাৎ আলেন্দের বাড়ি ঘেরাও করে তাঁকে হত্যা করলো এবং হাজার হাজার শ্রমিক ও কৃষক নেতাদের হত্যা করলো। এইভাবে শ্রেণীসংগ্রামের জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে চিলিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শাসন-ক্ষমতা দখল করেও তা হারিয়ে ফেললো।

ইন্দোনেশিয়ায়ও কমিউনিস্ট আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। ইন্দোনেশিয়ার জনপ্রিয় নেতা সুকর্ণো একদিকে যেমন কমিউনিস্টদের কিছুটা প্রশ্রয় দিতেন, তেমনি আবার আমেরিকার তাঁবেদার বড় বড় সেনাপতিকে অসন্তুষ্ট করতে চাইতেন না। এই দুই বিরুদ্ধপক্ষের দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করে তিনি নিজের কাজ হাসিল করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু বেশিদিন এভাবে রাজত্ব তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। আমেরিকার দূতাবাস বড় বড় সেনাপতিদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের প্রধান আড্ডা হয়ে উঠলো। কী করে সুকার্ণোকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে কমিউনিস্টদের শেষ করা যায় তারই চক্রান্ত তারা করেছিলো। ষড়যন্ত্রের কথা টের পেয়ে সুকার্ণোর কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনানায়ক চক্রান্তকারী সেনানায়কদের অতর্কিত আক্রমণ করে কয়েক জনকে হত্যা করে ফেললো। এই আক্রমণের সুযোগ নিয়ে চক্রান্তকারী আমেরিকার তাঁবেদার সেনাপতিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করে নিলো এবং সুকার্ণোকে বন্দী করে রাখল। তারপর চললো তাদের কমিউনিস্ট নিধনযজ্ঞ। কয়েক লক্ষ কমিউনিস্টকে তারা হত্যা করলো। গ্রামে গ্রামে বড় চাষী, জমিদার, জোতদাররা (এদের বেশির ভাগকে বলতো 'হাজী' অর্থাৎ যারা অনেক পয়সা খরচ করে মক্কায় গিয়ে 'হজ্ব' বা তীর্থ করে এসেছে) তাদের ভাড়াটে গুণ্ডাদের ও সৈন্যদের দিয়ে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের হত্যা করলো। এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করতে পারলো না। চিলির মতো এ ক্ষেত্রেও তারা শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলো না। যদিও তাদের লোকবল ছিলো অনেক, তথাপি বুর্জোয়া শ্রেণীর সশস্ত্র আক্রমণের সম্ভাবনাকে তারা বিশেষ আমল দিতে চায় নি। বুর্জোয়া শ্রেণী যে প্রয়োজন হলে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বিদেশিদের সাহায্য নিয়ে নিজেদের দেশের লোকদের হাজারে হাজারে হত্যা করতে পারে- একথা তারা বিশ্বাস করতে চায় নি। ফলে সেনাপতিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই তারা করে নি। ৫ লক্ষ কমিউনিস্ট ও তাদের সমর্থক ও কৃষক ও শ্রমিক নেতাদের বুর্জোয়া ফ্যাসিস্ট সেনাপতিদের হাতে প্রাণ বলি দিতে হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলন ইন্দোনেশিয়ায় বহু বছরের জন্য পিছিয়ে গেছে।

এই দুটো বড় দেশে কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত ছিলো এবং ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছিলো। যেসব দেশে গণতন্ত্র প্রথা দেশের সাধারণ মানুষের চেতনায় গভীর ভাবে শেকড় গাড়তে

পেরেছিলো, যেমন পূর্ব ইউরোপ সেসব দেশে গণতান্ত্রিক প্রথায়ই দেশের লোকেরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগুচ্ছিলো। যে সব দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের একনায়কত্ব চালিয়ে বল প্রয়োগ করে সমাজতন্ত্রের কণ্ঠরোগ করতে চাইছিলো, সে সব দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছিলো। গত মহাযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রের এই অব্যাহত অগ্রগতির পথে কিছুদিন হলো সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক কারণে সমাজতন্ত্রের একটা বিপর্যয়ও ঘটে গেল। সে কথা আমরা পরে দশ অধ্যায়ে এ আলোচনা করেছি এবং সেখানে এই বিপর্যয়ের কারণগুলোও বলতে চেষ্টা করেছি।

[নয়]

পৃথিবীর রাজনীতি : নয়া সাম্রাজ্যবাদ : নতুন যুদ্ধচক্র

নয়া সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদের আসল কাজ হলো কলোনিগুলো থেকে পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা তোলা ও কাঁচামাল সংগ্রহ করা। সে কাজটা বজায় থাকলে, সরাসরি শাসন করার ঝুঁকি না নেওয়াই সুবিধা। সরাসরি শাসন করতে পারলে সোজা লুঠের ভাগটা বেশি থাকে বটে, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমনে রাখাও একটি কঠিন সমস্যা। যুদ্ধের পর থেকে এই কারণে সাম্রাজ্যবাদ এক নতুন কায়দায় কলোনিগুলোকে শোষণ করার নীতি গ্রহণ করেছে। এই নীতির নাম 'নয়া সাম্রাজ্যবাদ'। এই নতুন বেশে সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি কলোনিগুলির শাসনকর্তা থাকে না। কলোনিগুলোতে টাকা খাটিয়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে পরোক্ষভাবে এদের সম্পদ লুঠ করতে থাকে। এই লুঠের একটা অংশ অবশ্য এরা স্থানীয় বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীকে দেয়। যার ফলে বুর্জোয়া শাসক শ্রেণী এদের দেশে টাকা খাটাতে ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে দেয়। যুদ্ধের পর থেকে অধিকাংশ কলোনিগুলোতে এই ধরনের নয়া সাম্রাজ্যবাদ চালু হয়েছে।

কলোনিগুলোকে শোষণ করার আর একটা কৌশল এরা ব্যবহার করে সেটা হলো সেনাপতিদের হাত করে রাখা। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা এই কৌশলটা খুব সফলতার সঙ্গে এ অবধি ব্যবহার করে আসছে। এই সব

সেনাপতিরা সাধারণত সামন্তশ্রেণী থেকে আসে যাদের ধ্যান-ধারণা সবই সামন্ত যুগের থাকে। ফলে বড় রাজাদের তোষণ আর প্রজাদের শোষণ করাই এদের একমাত্র কাজ হয়। এ যুগের সবচেয়ে বড় রাজা হচ্ছে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা। তাদের তোষণ করা ও তাদের কাছ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ও টাকা পয়সা নিয়ে দেশের লোকদের শোষণ করা ও দাবিয়ে রাখা হলো এদের ধর্ম। এরা দেশের লোকদের বশে রাখার জন্য পুলিশ, গুপ্তচর ও সৈন্যবাহিনীকে তো ব্যবহার করেই, বিশেষ করে ধর্ম ও ধর্মযাজক ও মৌলভী-মোল্লাদেরও সব সময় ব্যবহার করে।

এ কৌশলটা ব্যবহার করতে হলে, কলোনিগুলোর সেনাপতিদের হাত করতে প্রথম প্রথম সাম্রাজ্যবাদীদের বেশ বেশি টাকা ঢালতে হয়। তাদের আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেবার নাম করে আমেরিকার তৈরি অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করা শিক্ষা দিয়ে এই সব নতুন ধরনের অস্ত্রপাতি বিক্রি করার একটা বাজার তৈরি করে নেয়। এই ভাবে সেনাপতিদের দিয়ে ফৌজি শাসন কায়েম করে গণতন্ত্রকে রোধ করে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শোষণ অব্যাহত রাখে। এশিয়ার অনেক দেশ, যেমন থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সব কটা দেশ, আফ্রিকার বহুদেশ এই প্রথায় সাম্রাজ্যবাদীরা, বিশেষ করে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা, পরোক্ষভাবে সেনাপতিদের সাহায্যে হস্তগত করে রেখেছে।

মার্কিন মালিক-রাষ্ট্রের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা

গত মহাযুদ্ধের ফলে সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রীদের তুলনায় পুরানো সাম্রাজ্যবাদীরা দুর্বল হলেও, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের ফলে আর্থিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল না হয়ে অধিক পরাক্রান্ত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় নি। তাই যুদ্ধের ধ্বংস ও দুর্দশা কিছুই তাদের বিশেষ সহ্য করতে হলো না। বরং এই সুযোগে তারা সকলকে টাকা ধার দিয়ে ও অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রি করে পুরনো সাম্রাজ্যবাদীদের মহাজন হয়ে বসেছে। আর যুদ্ধের প্রয়োজনে শিল্পোৎপাদন বিপুল আকারে বৃদ্ধি করে প্রায় নিজেদের দ্বিগুণ মুনাফা বাড়িয়ে ফেলেছে। ওদিকে অস্ত্র-শস্ত্রে, সামরিক আয়োজন একেবারে সকলকে ছাড়িয়ে গিয়ে নিজেকে সর্বপ্রধান সামরিক শক্তি করে তুলেছে। তাই যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেও অসমতা বেড়ে গিয়েছে। সকলে যেমন দুর্বল হয়েছে, মার্কিন মালিকরা তেমনি হয়েছে প্রচণ্ড রকমে প্রবল।

তবু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামনে সমস্যা রয়ে গিয়েছে, নতুন সমস্যাও দেখা দিয়েছে। প্রথমেই বাজারের সমস্যা। মার্কিন ক্যাপিটালিস্টদের চেষ্টা হলো যুদ্ধের শেষেও যুদ্ধকালের মতো উচ্চ হারের মুনাফা বজায় রাখা। যুদ্ধের সময় অন্যেরা তাদের মাল কিনতো। সর্বত্রই তাই তাদের মালের চাহিদাও ছিলো। যুদ্ধের শেষে সে চাহিদা আর থাকবার কথা নয়। কাজেই মুনাফাও কমতে বাধ্য। মার্কিন পুঁজিপতিরা তাই, সেই মুনাফা ও চাহিদা অক্ষুন্ন রাখবার জন্য সে সব দেশে নিজেদের 'বাজার' রাখতে চায়। উপরন্তু তাদের বর্ধিত উৎপাদনের জন্য চাই আরও নতুন নতুন 'বাজার'। অথচ যুদ্ধে অধিকাংশ দেশের মানুষ এতো গরিব হয়েছে যে, প্রয়োজন থাকলেও জিনিসপত্র কিনবার শক্তি তাদের নেই।

মার্কিন রাষ্ট্রের ঘরে পৃথিবীর সোনা গিয়ে মজুত হয়েছিলো। তাই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক থেকে, 'আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার' থেকে মার্কিন রাষ্ট্র ওসব দেশকে ১,৯০০ কোটি ডলার প্রথম কয় বছরেই ধার দেয়। যুদ্ধের আগে জার্মানি, ইতালি ও জাপানের মালিকেরা পৃথিবীর বাজারের অনেকটা নিজেদের পণ্য দিয়ে দখল করে রেখেছিলো। যুদ্ধের পরে তাদের সে অবস্থা ছিলো না, মার্কিন মালিকরা সে সব বাজার দখল করে বসলো। ব্রিটেনের, ফ্রান্সের বাজারের উপরও ভাগ বসালো। নিউইয়র্কের 'ওয়াল স্ট্রীটের' মালিকরা এইরূপে নিজেদের ডলার ঋণের চাপে ও 'বাজার' বাড়াবার তাগিদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বগ্রাসী আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য করলো। এই নীতির উদ্দেশ্য হলো– পৃথিবীর মার্কিন ক্যাপিটালের একচেটিয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। জার্মানি ও জাপান তো গিয়েছেই, ব্রিটেন ও ফ্রান্সকেও চেপে রাখা চাই। এই আসুরিক নীতি অনুযায়ী মার্কিনের সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও আসুরিক হল। যেসব দেশে তার অর্থনৈতিক প্রাধান্য প্রয়োজন সে সব দেশে মার্কিনের বাধ্য তাঁবেদারী সরকার স্থাপন করা চাই। শুধু জার্মানি, ইতালি ও জাপানের মতো 'শত্রুদের' দেশেই এরূপ 'তাঁবেদারী' শাসক তৈরি হলো এমন নয়, নিরপেক্ষ দেশেও তাঁবেদারী শাসন স্থাপন করা চললো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নীতির অর্থ তা হলে কী? তার অর্থ, মার্কিন পুঁজির একচেটিয়া অধিকার আরও পাকা করতে হবে। এবং অন্যদের তো কথাই নেই, তার পুঁজিবাদী ভাগীদারদেরও মার্কিন পুঁজির অনুগত তাঁবেদার ও মুখাপেক্ষী করে ফেলতে হবে।

মার্কিনের পথে বাধা

মার্কিনের বিশ্বগ্রাসী নীতির পক্ষে প্রথম বাধা হলো- সমাজতন্ত্রী দেশসমূহ ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রবল শক্তি বৃদ্ধি। সোভিয়েত সংঘ ছিলো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, যুদ্ধের পরে রাজনীতিতে ও সংস্কৃতিতে তার সুনাম ও প্রভাব অতুলনীয় হয়ে উঠেছিলো। তার লক্ষ্য হলো- বিশ্বব্যাপী শান্তি, গণতান্ত্রিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক প্রগতি। মার্কিনের পথে দ্বিতীয় বাধা দাঁড়ালো- পূর্ব ইউরোপের পিপল্স্ রিপাবলিকগুলি, পূর্ব জার্মানির এবং চীনের, উত্তর কোরিয়ার ও ভিয়েতনামের, এমনকি দক্ষিণ আমেরিকার নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র 'কিউবা'র মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ। তারা তাঁবেদার হতে চায় না, চায় শান্তির পথে দেশ গঠন করতে। সোভিয়েটকে নিয়ে এ সব সমাজতন্ত্রী দেশের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ১৭। তৃতীয় বাধা হল– প্রত্যেক স্বাধীন দেশের মানুষ এবং এখনও স্বাধীন হয় নি এমন সব স্বাধীনতাকামী দেশের মানুষ। তারা মার্কিনের অধীনতা চায় না– অবশ্য এদের কোনো কোনো দলকে হাত করে মার্কিন তাদের তাঁবেদারও সৃষ্টি করেছে। চতুর্থ বাধা হলো– সকল দেশে শ্রমিক-সাধারণ এবং জনসাধারণ, এমনকি আমেরিকার শ্রমিক ও মেহনতি জনতাও। মার্কিনের বিশ্বগ্রাসী নীতি সার্থক হলে প্রকৃতপক্ষে জনতার বিরুদ্ধে মালিকদের ক্ষমতাই জয়ী হবে। তাই এই মার্কিন-নীতির বিরোধী হলো, পৃথিবীর সাধারণ মানুষ আর তাদের নানাভাবে প্রতারিত করাই হলো মার্কিন মালিক পক্ষের প্রচারকদের সর্বপ্রধান কাজ।

মার্কিন-নীতির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হলো তাই যুদ্ধোত্তর সোভিয়েটদেশ। তারপর নতুন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ, সকল দেশের মুক্তি-আন্দোলন এবং সমস্ত দেশের শ্রমিক সাধারণ। ছলে, বলে, কৌশলে, নানাভাবে এই সব রাষ্ট্র ও শক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি মার্কিনের একটা প্রধান কৌশল।

নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার দলবল সঙ্গে নিয়ে প্রায় জঙ্গিবাদী পথে জঙ্গিবাদী কৌশলেই প্রচারে ও যুদ্ধ আয়োজনে নামলো। হিটলার মনে করতো, কাইজারের ভুলগুলো শোধরাতে পারলেই অস্ত্রের জোরেই তার জয় অনিবার্য হবে। এখন মার্কিন মালিকরাও মনে করলো হিটলারের ভুলগুলো শুধরে নিলেই মারণাস্ত্রের দৌলতে তাদের জয় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এই মালিক-দানবদের মাথায় এই কথাটা কিছুতেই ঢোকে না যে, আজকের দুনিয়াতে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাটাই হচ্ছে মারাত্মক

ভুল। এই কারণেই ভিয়েতনামের মতো ছোট দেশের কাছে আমেরিকা হেরে গেছে। তবু অবশ্য মালিকতন্ত্রীদের নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য আয়োজন করতে হয়- তা দেখেছি। কারণ, নইলে তাদের মুনাফা-শিকার বজায় থাকবে না। দেশের মধ্যেই শ্রমিকরা বিপ্লব করবে। অন্যদিকে শান্তি অব্যাহত থাকলে সোভিয়েট দেশ শিল্পে, বাণিজ্য, সম্পদে এগিয়ে যাবে। তার অনুকরণে জনায়ত্ত গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিও দ্রুত অগ্রসর হবে। তাছাড়া এশিয়া-আফ্রিকার নতুন স্বাধীন দেশগুলি নিজেদের উন্নত করে ঔপনিবেশিকদের দুর্বল করবে এবং পরাধীন দেশগুলোও মুক্তি সংগ্রামে জয়ী হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতেই তাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আবার যুদ্ধের জন্য হিটলারী কায়দায় প্রস্তুত হতে লাগলো। প্রতমতই সে ধুয়া তুললো যে, তার উদ্দেশ্য 'স্বাধীন দুনিয়াকে কমিউনিজমের কবল থেকে রক্ষা করা, আক্রমণ নয়।' এই 'স্বাধীন দুনিয়ার' অর্থ, যারা মালিকের মুনাফা-নীতি মানে শুধু তারাই নয়, যারা মার্কিনের প্রভাবাধীন তারাও। পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ার মালিক-শাসক-গোষ্ঠী দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এই মার্কিন মালিক-কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে- যেমন, হিটলারের কর্তৃত্ব তারা কেউ কেউ পূর্বে মেনে নিয়েছিলো। এ সব সাম্রাজ্যবাদীর তাঁবেদাররা মার্কিন সহায়ে এভাবে নিজেদের ধনিকতন্ত্রী সংকট এড়াবার আশা রাখে। আর মার্কিনকে ভাগ দিয়ে আশা করে নিজেদের শোষণ ও শাসন টিকিয়ে রাখবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও আবার ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালীর শাসক-গোষ্ঠীর সহায়ে ইউরোপে এশিয়ায়, আফ্রিকায় নিজের ঘাঁটি বা যুদ্ধচক্র বাঁধতে চেষ্টা শুরু করলো।

জার্মান সমস্যা

ইউরোপের সম্ভাব্য তৃতীয় যুদ্ধের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ক্ষেত্র জার্মানি। পূর্ব জার্মানি সোভিয়েত প্রভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়ে উঠেছিলো। যুদ্ধবাজদের পক্ষে এই পূর্ব জার্মানি প্রধান বাধা ছিলো। পশ্চিম ইউরোপ ছিলো মার্কিন-ব্রিটিশ-ফরাসী তদারকে, তারা এই পশ্চিম জার্মানিকে পূর্ব জার্মানি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এখানে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়েছিলো। ক্রুপ প্রভৃতি মালিক গোষ্ঠীদের নিয়ে তারা যুদ্ধোপযোগী কল-কারখানা আবার চালু করেছিলো। পুরাতন নাৎসী নেতাদের নিয়ে তারা সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করেছিলো, 'নাটো' প্রসঙ্গে তা বলবো।

অতএব, দেখা গেল এখন পর্যন্ত মার্কিন যুদ্ধবাজদের এসব চক্রান্ত ইউরোপে বেশি সফল হয় নি। তৃতীয় মহাযুদ্ধ সেখানে বাঁধানো গেল না। ফলে ভিয়েতনাম বা এশিয়ার অন্য কোথাও, যেমন কোরিয়া, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, লিবিয়া ইত্যাদি দেশে যুদ্ধ বাধানোর পথও তাদের দেখতে হয়েছে।

অবশ্য, একথা বলাই বাহুল্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষা বড় সামরিক প্রয়াস হচ্ছে তার নিজের প্রয়াস পৃথিবীর সর্বত্র তার যুদ্ধ ঘাঁটি। বহুদেশে তার সামরিক মিশন, তার নিজের বাহিনী ও বিপুল অস্ত্রসজ্জা। আণবিক বোমা থেকে জীবানু অস্ত্র পর্যন্ত সকল অস্ত্রই সে তৈরি করে চলেছে এবং নানা অজুহাতে এসব কোনো অস্ত্রই সম্বরণ করা, নিয়ন্ত্রণ করা বা বন্ধ করার প্রস্তাব মার্কিন কর্তৃপক্ষ নাকচ করে দিচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘে এসব কথা উঠলেও মার্কিনরাই তা ধামাচাপা দেয়- এমনকি, বীজাণু যুদ্ধের কথা পর্যন্ত।

মার্কিন যুদ্ধচক্র

এই যুদ্ধচক্র বাঁধার জন্য ১৯৪৭ থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একটা যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে ফেলে 'কোল্ড ওয়ার' চালায়। তিনটি পদ্ধতি তারা এজন্য তখন অবলম্বন করেছিলো।

(১) অর্থনৈতিক 'মার্শাল প্ল্যান' (১৯৪৭-১৯৫১) : এই মার্শাল প্ল্যানের উদ্দেশ্য ছিলো ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিকে সাহায্য দানের নাম করে নিজেদের তাঁবেদার এনে মার্কিন মালিকদের বশংবদ লোকের হাতে সেসব দেশের রাষ্ট্রভার অর্পণ করা। এইভাবে পশ্চিম জার্মানির সম্মিলিত প্রজাতন্ত্র ও জাপান রাষ্ট্র সমৃদ্ধিশালী ধনিকতন্ত্রী দেশ হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু ধনিকতন্ত্রী হয়ে উঠেই তারা এখন আর পুরোপুরি মার্কিন চক্রের তাঁবেদার থাকতে চাইছে না। তবে ছাড়তেও পারছে না। মার্কিন নীতির তারা এখনো ঘাঁটি।

মার্শাল প্ল্যানে যেমন ইউরোপের দেশগুলিকে মার্কিনের উপনিবেশে পরিণত করা হয়েছে, এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে তেমনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে ট্রুম্যানের 'পয়েন্ট ফোর প্রোগ্রাম' বা চতুর্দফার প্রোগ্রামের নামে। এর ঘোষিত উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে সব জাতি পশ্চাদপদ তাদের অর্থনৈতিক সাহায্য দেবে মার্কিন রাষ্ট্র এশিয়াতে কমিউনিজম ঠেকাবার জন্য। বলাবহুল্য, এ সাহায্য তারাই পাবে যারা মার্কিন তাঁবেদার। আর এ সাহায্যের উদ্দেশ্য হলো, মার্কিনদের ডলারের ছিটে-ফোঁটা দিয়ে এশিয়া জুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্য ও সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা। এরূপ

'সাহায্যে'র প্রায় বারো আনাই অবশ্য পাচ্ছিল চিয়াং-কাই-শেক। ব্রহ্ম, ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ এশিয়ার ভাগ্যেও এরূপ সাহায্য জুটবে, এরূপ আশ্বাস মার্কিন শাসকেরা দিতো। সেই অনুযায়ী 'কলম্বো প্ল্যান' প্রণীত হয়। আবার সেই 'কলম্বো প্ল্যানের' সূত্র ধরেই রচিত হয়েছিলো ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। তবুও মার্কিন সাহায্য ভারত সরকার সে তুলনায় বিশেষ পায়নি। কারণ ভারত সরকার যুদ্ধ বিষয়ে মার্কিন শাসকদের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি বিধান করতে পারে নি। পাকিস্তানী জঙ্গিরাজ তা বেশ পেরেছিলো।

(২) সামরিক ও রাজনৈতিক : এদিকে প্রথম ধাপ হলো (১৯৪৯ থেকে) উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংগঠন বা ন্যাটো (NATO) বলে একটি যুদ্ধজোট গঠন। এই যুদ্ধজোট সোভিয়েতের বিরুদ্ধেই তৈরি করা হয়। মার্কিন রাষ্ট্রই এর নেতা। আটলান্টিকের তীরবর্তী ইউরোপের রাজ্যগুলি ছাড়া গ্রীস ও তুর্কী এই নাটোর অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধ বাধাবার জন্য এসব দেশই মার্কিন ঘাঁটি।

তাই দ্বিতীয় ধাপ হলো– উত্তরে গ্রীনল্যান্ড থেকে এই সমস্ত পশ্চিমী যুক্ত জোটের দেশ গ্রীসে, তুরস্কে মার্কিনের বিমান ও নৌঘাঁটি স্থাপন করা। তারপরে, আরেকটা ধাপ- ফ্রান্স, ইটালী, ব্রিটেন, মার্কিন ও পশ্চিমে জার্মানি শুদ্ধ একটা 'ইউরোপীয় বাহিনী' গঠন। জার্মানদের না হলে এ বাহিনী দিয়ে পূর্ব ইউরোপের ও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব। তার জন্যই মার্কিন কর্তারা পশ্চিম জার্মানির পুরানো নাৎসী সেনাপতি ও নেতাদের মুক্তি দিয়ে এই বাহিনী গঠনে নিযুক্ত করেছিলো। এই পশ্চিম জার্মানির নেতারা চায় আণবিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হতে। কিন্তু তাদের এতোটা বিশ্বাস করতে মার্কিন মালিকরা তখনো রাজি নয়। তাহলে এই জার্মান যুদ্ধবাজরা আরও অনর্থ ঘটাবে। ফ্রান্স জার্মান-বাহিনী গঠনের ভয়ানক বিরোধী। পশ্চিম জার্মানির সাধারণ মানুষও আবার চায় না মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাবার বড়ে হতে, চায় না তারা নাৎসী জঙ্গীবাদের দৌরাত্ম্য সইতে। এদিকে পশ্চিম জার্মানিও তখন ফ্রান্সের সঙ্গে শত্রুতা বাড়াতে চায় না। ইউরোপে মিলেমিশে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখা তাদের প্রয়োজন।

ঠিক ন্যাটোর মতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়াতেও তাদের সামরিক চক্র গড়েছিলো। এটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, তার নাম 'সিয়াটো'। পাকিস্তান তার এক সদস্য ছিলো। প্রায় প্রথম থেকে পাকিস্তানে জঙ্গিরাই রাজত্ব করেছে। অন্য দেশের বিপ্লব দমনেও, যেমন আফগানিস্তানে এরা সাহায্য করেছে প্রচুর। গোপন মার্কিনি প্রশ্রয়ে এরা আণবিক বোমাও বানিয়ে ফেলছে। আর

একটি তৃতীয় যুদ্ধচক্র ছিলো মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়ায়, নাম ছিলো 'সেন্টো'। মধ্য প্রাচ্যের ইসরাইল প্রভৃতি দেশ তার সদস্য। এসকলেরই উদ্দেশ্য ছিলো গণতন্ত্র নিধন ও পুঁজিতন্ত্র পোষণ এবং যুদ্ধশেষে সোভিয়েটেকে কাবু রাখা। কিন্তু এশিয়ার দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের ফলে 'সিয়াটো' ও 'সেন্টো' পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হয়। তৃতীয় ধাপটা আরও কুটিল। এটি হলো সোভিয়েত ও জনায়ত্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে ও অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রেও (যেমন, তুরস্ক ভারত ইত্যাদি) নিজেদের চর সৃষ্টি করে সেসব দেশের অভ্যন্তরে নিজ গোপন ঘাঁটি সৃষ্টি করা। এভাবে সাধারণভাবে মার্কিন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কৌশল ঠিক করেছিলো। পূর্ব ইউরোপে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মার্কিন কর্তা ডালেস্ এজন্য প্রাণপণে বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলো। হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ হয়, বিদ্রোহ হয় পোল্যান্ডেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটাই টেকে নি। পূর্ব ইউরোপের জন-গণতন্ত্র তখন স্থায়ী হয়। এসব দেশে ডালেস্-এর মত উৎকট পথ না ধরে মার্কিন চক্র চেষ্টা করে প্রত্যেক দেশে প্রতি-বিপ্লবীদের উস্‌কে দিতে যেমন ইউরোপে, তেমনি এশিয়ায়, তেমনি আফ্রিকায়।

(৩) মতাদর্শ প্রচার : মতাদর্শ প্রচার, মতবাদ প্রচারের জন্য মিথ্যা, অর্ধসত্য- এতো অজস্র উপায় মার্কিন রাষ্ট্র গ্রহণ করছে যে, পৃথিবীতে এর পূর্বে কেউ তা কল্পনাও করতে পারতো না। সোভিয়েতে ও তার অনুসারী দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই। সোভিয়েত দেশে ভগবৎ বিশ্বাসীদের বড় দুরবস্থা। সোভিয়েত দেশে রাষ্ট্রীয় অপরাধীদের অমানুষিক পরিশ্রম করানো হয়। সোভিয়েত দেশের নরনারী অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মার্কিন ও তার অনুগৃহীত রাজ্যের মুখ চেয়ে আছে- এরকম নানা ভূয়া চিঠিপত্র, চিত্র, প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। তবে এসব পুরনো হয়ে গিয়েছিলো। তখন প্রধান প্রচার হলো, সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদী; কমিউনিজম-এর নিয়ম অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়া; কিংবা সোভিয়েত টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্র। সোভিয়েত প্রাধান্যে পোলান্ড, চেকোশ্লোভকিয়া, এমনকি চীন প্রভৃতি দেশগুলি গোলামী করছে। প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্টরা তাদের দেশের উপর সোভিয়েতের প্রাধান্য চাপিয়ে দিতে চায়। এগুলিও অবশ্য ক্রমে পুরনো কথা হয়ে পড়লো।

এই সব প্রচারের কাজে অবশ্য আমেরিকার নানা প্রতিষ্ঠান আছে। কোনো কোনোটি প্রকাশ্যেই সেসব প্রচার চালায়। যেমন, মার্কিন সংবাদপত্র, মার্কিন রেডিও, মার্কিন ফিল্ম (এটি মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটাবারও একটা উপরকণ)। বিভিন্ন মার্কিন সরকারি ও বেসরকারি, যেমন কার্নেগী, রকফেলর,

ফোর্ড প্রভৃতির অর্থপুষ্ট জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। এরা অন্যদের ভালো করার জন্য জাল ছড়িয়ে বসে, জেনে না জেনে অনেকেই তাতে মার্কিন প্রচারের শিকার হয়ে ওঠে। মার্কিন অধ্যাপক, ভ্রমণকারী, কারিগর, বিশেষজ্ঞরা এসব কাজে কম চতুর নয়। নানা প্রচ্ছন্ন ব্যবস্থাও আছে, যেমন বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পিছনে থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এরূপ প্রচারে বই লেখায়, ছাপায়, সংবাদপত্রে ঘুষ দেয়। অধ্যাপক ও সাংবাদিকদের বৃত্তি দিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ করায় ইত্যাদি। এসব অনেক ব্যাপারের পিছনে আছে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি-আই-এ, তা মার্কিন এখন স্বীকার করে। বিপ্লবী ও অতিবিপ্লবীদের মধ্যেও সি-আই-এ'র গোপন চর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য হলো, সমাজতন্ত্রের ঐক্য ও বামপন্থীদের ঐক্য ভেতর থেকে ভেঙ্গে দেওয়া।

জাতিসংঘ

কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রচারের সব থেকে বড় প্রতিষ্ঠান তারা তৈরি করেছিলো 'ইউ.এন.ও' বা জাতিসংঘ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে 'পট্‌স্‌ডাম চুক্তি' অনুযায়ী এই মহাপ্রতিষ্ঠান পরিকল্পিত হয়।

প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯৪৫ এর ২৪শে অক্টোবর। এ প্রতিষ্ঠানের একটা সূত্র হলো এই যে, পৃথিবীর শান্তি যখন বৃহৎ শক্তিদের উপরেই প্রধানত নির্ভর করে, তখন মার্কিন রাষ্ট্র, সোভিয়েট, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন (তখনো চীনে ছিলো চিয়াং-এর কর্তৃত্ব, আমেরিকারই প্রভাব) এই পঞ্চশক্তি একমত না হলে কোনো মূল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে না। কিন্তু এরা সবাই নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য। কোনো প্রস্তাবে এদের কেউ ভেটো দিলে অর্থাৎ 'নারাজি' বললে সে প্রস্তাব পাশ হলেও, প্রযোজ্য হবে না। এতে ভোটাভুটির অপেক্ষা ঐকমত্যের ওপর আস্থা রাখা হলো। নইলে সবাই জানে সোভিয়েত একা, আর বাকি রাষ্ট্রগুলি সব মালিক রাষ্ট্র। কিন্তু যখন চীনে সত্যই জনায়ত্ত প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলো, তখন ভেটোর জোরেই মার্কিন রাষ্ট্র সে রাষ্ট্রকে সম্মিলিত জাতিসংস্থায় ঢুকতে দিলো না। ভোটের জোরে সেখানে পাশ করে নিয়েছিলো, চিয়াং এর প্রতিনিধিই হবে চীনের প্রতিনিধি। এরূপে আণবিক অস্ত্র বর্জন, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও শান্তির সকল প্রস্তাবই ভেটোর জোরে মার্কিন রাষ্ট্র বানচাল করে দিয়েছে। গত ৪০ বছরে অনেক নতুন জাতি স্বাধীন হয়েছে, তারাও অনেকে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় আসন পেয়েছে। পরে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকেও জাতিসংঘে স্থান দিতে

হয়েছে। এখন তার সদস্য সংখ্যা ১৪০-এর বেশি। কিন্তু এসব জাতির মধ্যে বিভেদ আছে। আর তাই মূল ক্ষমতা এখনো মার্কিন কর্তাদের হাতে। কিন্তু এই জাতিসংঘের মার্কিন প্রতিপত্তি আজ জাতীয় আন্দোলনের মোকাবিলায় পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে।

শান্তির শিবির, যুদ্ধের শিবির

মোটের উপর সব জুড়ে আজ পৃথিবীর যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে ক্যাপিটালিজমের বাজার দখলের চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদীদের বীভৎস চক্রান্ত। এ চক্রান্ত হচ্ছে মুনাফার রাজত্ব বজায় রাখার চক্রান্ত। অবশ্য অন্য দিকে আছে পৃথিবীর সাধারণ মানুষের শান্তির আকাঙ্ক্ষা, প্রগতির আকাঙ্ক্ষা, গণতান্ত্রিক সুস্থ জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা।

মুক্তির শিবির ও সাম্রাজ্যবাদী শিবির এই দুই শিবিরে পৃথিবী এখনো বিভক্ত। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নায়ক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তারই অনুচর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ, জার্মান ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহ (দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ এবং ফরমোজা, দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়াও আটলান্তিক-গোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলি) আর অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদাররা। তাদের নানারকম পৃথিবীজোড়া জঘন্য প্রয়াস আমরা দেখেছি। কিন্তু এ দেখে যদি আমরা মনে করি যে, সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝি ঐক্যবদ্ধ তাহলে মস্ত ভুল হবে। কারণ, আমরা জানি এক সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে আর এক সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থের সংঘাত লেগেই আছে। মোটামুটিভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ভিতর বর্তমানে তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির প্রতিযোগিতা তীব্রভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়।

সবচেয়ে শক্তিশালী ও আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী দেশ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। যতোদিন সোভিয়েত শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তার আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করছিলো, ততোদিন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিছুটা সংযত ছিলো। কিন্তু সম্প্রতি সোভিয়েত দেশে এক আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় হয়ে গেছে। এর কথা আমরা পরের অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করে বলেছি। সোভিয়েত দেশে এই বিপর্যয়ের পর মার্কিনি আগ্রাসন নীতি চরমে উঠেছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলোকে তারা কথায় কথায় ধমকাচ্ছে। কোথাও কোথাও সৈন্য পাঠিয়ে যারা বিন্দুমাত্র বিরোধিতা করছে, তাদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে

তাদের বিতাড়িত করে, নিজেদের অনুগত লোকদের ক্ষমতায় বসিয়ে দিচ্ছে। এমনকি ভারতবর্ষের মতো বড় দেশকে চাপ দিয়ে তাদের সুবিধাজনক অর্থনৈতিক নীতি চালু করতে বাধ্য করছে। ভারতের বুর্জোয়া শাসকেরা সোভিয়েতের শক্তি পেছনে না থাকায়, সম্পূর্ণরূপে মার্কিনদের শরণাগত হয়ে পড়ছে এবং ধীরে ধীরে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর মতো আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী দ্বিতীয় শক্তি যেটা আজ পৃথিবীর বাজারে বেশ ভালো করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটা হলো ইউরোপীয় দেশগুলির সম্মিলিত 'ইউরোপীয়ান অর্থনৈতিক জোট' (European Economic Community) বা সংক্ষেপে 'EEC'। গত মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপের দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে কয়লা ও ইস্পাত শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে সব দেশেই আর্থিক পুনর্গঠন কঠিন হয়ে পড়ে। এরা দেখলো আমেরিকার ইস্পাত শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে ছোট ছোট ইস্পাতের কারখানা করে তা সম্ভব নয়। হাজার হাজার টন ইস্পাত তৈরি করতে পারলেই উৎপাদন খরচ কম করা যাবে এবং বাজারে আমেরিকার ইস্পাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা যাবে। কিন্তু তাদের ছোট ছোট দেশের ছোট ছোট বাজারে এতো বেশি ইস্পাত তৈরির জন্য বড় বড় কারখানা স্থাপন করা সম্ভব নয়। তাই তারা ঠিক করলো, সব দেশ মিলে একটা বড় বাজার তৈরি করে যেখানে কয়লা ও খনিজ লোহা পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণে শুধু সেই সব দেশেই বড় বড় কয়েকটা ইস্পাত তৈরির কারখানা করবে। অন্যান্য দেশগুলো অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরি করবে এবং বিনা শুল্কে একে অন্যের বাজারে তা বিক্রি করতে পারবে।

এই ভাবে শুল্কের প্রাচীর তুলে দেওয়ায়, প্রত্যেকটা জিনিসের বাজার খুব বড় হয়ে গেল এবং প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন সস্তায় কম খরচে হতে লাগলো। শুধু যে ইউরোপের বাজার এরা মার্কিন প্রতিযোগিতার হাত থেকে কেড়ে নিলো তা নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বাজারেও এরা নিজেদের দখল স্থাপন করলো। ফলে মার্কিন বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে ইউরোপের বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা বিরোধ উপস্থিত হলো এবং আমেরিকার কথায় কথায় এরা আর উঠতে বসতে রাজি হলো না। অবশ্য সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করার বেলায় এরা এক সঙ্গে হাত মেলাতে কুণ্ঠিত হলো না। সমান তালে সোভিয়েতের ও পূর্ব ইউরোপের সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলির ধ্বংসের কাজ ও সেই বিস্তীর্ণ জায়গায় নিজেদের বাজার ও পুঁজি খাটাবার সুবিধা করে নেবার কাজে উৎসাহের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছিলো।

গত মহাযুদ্ধের পর তৃতীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেটা উঠলো, সেটা হলো জাপানী সাম্রাজ্যবাদ। মহাযুদ্ধের আগে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ খোলাখুলি পুরানো সাম্রাজ্যবাদের কায়দায় আশে-পাশের দেশগুলোকে জয় করে সেখানকার কাঁচামাল ও খাদ্য-সামগ্রী লুণ্ঠন করতো। কিন্তু যুদ্ধের পর আর এ রকম খোলাখুলি লুণ্ঠন চললো না। তারা সস্তায় মাল তৈরি করে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের বাজারের একটা বড় অংশ দখল করে নিলো। উচ্চ শুল্কের প্রাচীর ও অন্যান্য নানা প্রকার বাধা নিষেধ সত্ত্বেও। আজ তাদের পুঁজির পরিমাণ এরূপ বেড়েছে যে, আমেরিকাকেও জাপানের কাছে পুঁজি ও বাজারের জন্য হাত পাততে হয়েছে।

যুদ্ধের পর জাপানের এই উন্নতির প্রথম সোপান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই তৈরি করে দিয়েছিলো। জাপানের জমিদার জায়গীরদার শ্রেণীকে বলা হতো 'সামুরাই'। এরাই সারা দেশের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ ও শাসন করতো ও সাম্রাজ্যবাদের প্রধান কর্ণধার ছিলো। যুদ্ধে জয়লাভ করে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা দেখলো এ শ্রেণীটাকে ধ্বংস করতে পারলে, এশিয়া মহাদেশে তাদের বাজার ও রাজত্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বীত্ব কেউ ঘুচাতে পারবে না। তাই এই সামুরাই শ্রেণীকে নির্মূল করার জন্য, জেনারেল ম্যাক আর্থারের নেতৃত্বে আমেরিকানরা জাপানে ভূমি-সংস্কার চালু করলো এবং সামুরাই মালিকদের সব জমি-জমা চাষীদের ভেতর ভাগ করে দিলো। এর ফলে যেমন চাষের উন্নতি হলো, তেমন কারখানা শিল্পের বাজার খুব বেড়ে গেল। বোমাবাজির ফলে গত যুদ্ধের সময় জাপানের কল-কারখানা বহুলাংশে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। এখন বাজারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন কল-কব্জা কিনে ও শিল্প-কৌশল কিনে এরা নতুন উৎপাদন প্রণালীতে নতুন নতুন কল-কারখানা চালু করলো। জাপানের ঘড়ি তৈরি, ক্যামেরা, রেডিও, টি.ভি ইত্যাদি শিল্পের দ্রুত প্রসার লাভ করলো। এমনকি ছোট মোটর গাড়ি তৈরিতে জাপান সমস্ত পৃথিবীতে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলো।

এই ভাবে বিদেশ থেকে কলা-কৌশল কিনে সেগুলোকে নিজেদের চেষ্টায় আরো অনেক উন্নত করে যে কল-কারখানা তারা স্থাপন করলো আমেরিকা ও ইউরোপের কল-কারখানা তার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। জাপানীদের সরল জীবনযাত্রা, স্বল্পব্যয়ী স্বভাব, শ্রমিকদের ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় কম বেতন, সঞ্চয়ের উচ্চহার, শ্রমিক ও কর্মচারীদের কর্মনিষ্ঠা ও ফাঁকি না দেবার স্বভাব ইত্যাদি কতগুলো জাতিগত ও ঐতিহাসিক কারণ অবশ্য জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে পৃথিবীর বাজারে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে।

আজ সমগ্র পুঁজিবাদী জগতে যখন ঘোরতর ব্যবসা-সংকট চলছে এবং সব পুঁজিবাদী দেশের বাজার দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসছে, তখন এই তিন বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভেতর দ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছে। পৃথিবীর রাজনীতির অনেক ঘটনাই তোমরা এই তিন শক্তির সংঘাতের ফলে যে ঘটছে তা বুঝতে পারবে।

[দশ]

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিফলতার কারণ

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে লেনিনের নেতৃত্বে এক অসাধারণ বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্ম হলো। শ্রমিক-কৃষক ও দরিদ্র জনগণ রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টির দ্বারা সংগঠিত হয়ে এই বিপ্লবকে সফল করে তুললো এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এই দ্বিতীয় বার জমিদার পুঁজিপতি ইত্যাদি ধনিক শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে গরিব মানুষের রাষ্ট্র স্থাপন করলো।

তোমরা আগে পড়েছো, এই ধরনের গরিবের রাষ্ট্র প্রথম স্থাপিত হয়েছিলো ফ্রান্সের প্যারী মহানগরীতে ১৮৭১ সালে। তার নাম ছিলো 'প্যারী-কমিউন'। এই প্যারী-কমিউনে প্যারী নগরের শ্রমিকরা ৭২ দিন রাজত্ব করেছিলো। কিন্তু দেশি ও বিদেশি বুর্জোয়াদের আক্রমণে ৭২ দিন পর পরম বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজয় হয় এবং বহু শ্রমিক নেতাকে বুর্জোয়াশ্রেণী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। প্যারী-কমিউনের শিক্ষা নিয়েই লেনিন নভেম্বর বিপ্লব সফলতার সঙ্গে চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন এবং তিনি যে শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র স্থাপন করেন তা ৭২ বছর টিকেছিলো।

লেনিনের প্রতিষ্ঠিত এই সোভিয়েত রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রাষ্ট্র ছিলো। এই রাষ্ট্রে যেহেতু শ্রমিক-শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা ছিলো তাই তারা সহজেই বেকারত্বের গ্লানি মুছে ফেলেছিলো ও সকলের কাজের ও জীবিকার জন্মগত অধিকার সেখানে স্বীকৃত হয়েছিলো। উৎপাদন যন্ত্রে সমাজের সকলের অধিকার স্থাপিত হয়েছিলো এবং মুনাফার জন্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে শ্রমিকদের শোষণের শেষ হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, অতি অল্প সময়ের ভেতর এই অভিনব রাষ্ট্র সবচেয়ে পেছনে পড়ে থাকা দেশ থেকে ইউরোপের ভেতর সবচেয়ে শক্তিশালী অগ্রগামী রাষ্ট্রে উন্নত হয়েছিলো। এমনকি পৃথিবীর ভেতর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মার্কিন

দেশের সমতুল্য এক 'সুপার পাওয়ার' বলে গণ্য হয়েছিলো। বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার জনসাধারণ অত্যন্ত উৎপীড়িত, শোষিত ও অপমাণিত হয়ে জীবন কাটাতো। কিভাবে এই পেছনে পড়ে-থাকা, উৎপীড়িত মানুষের দল এই নতুন রাষ্ট্রে জেগে উঠলো এবং বিশ্বের দরবারে একটা বড় আসন করে নিলো তার কথা তোমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' বইটাতে পাবে।

উন্নতির এই উচ্চশিখর থেকে হঠাৎ গত তিন বছরের ভেতর (১৯৮৮-৯১) এই মহাদেশ কিভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে ধ্বংসপ্রায় হয়ে গেল, তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিলুপ্তির ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা ও পৃথিবীর সব দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী যেমন আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, তেমনি শ্রমিক-কৃষক দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষ ও সমাজতন্ত্রে যারা বিশ্বাস করে ও সমাজতন্ত্রের জন্য যারা আজীবন সংগ্রাম করে আসছেন তারা অনেকে অত্যন্ত নিরুৎসাহী হয়ে পড়েছেন। এমনকি কেউ কেউ সমাজতন্ত্রের ও মার্কসবাদের ও লেনিনবাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন।

সমাজতন্ত্রের পরাজয় কিন্তু এই প্রথম নয়। মার্কস নিজেই বলে গেছেন, যতোদিন পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ না করবে, ততদিন পর্যন্ত বারে বারে পরাজয়ের ভিতর দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব এগিয়ে যাবে। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে প্যারিস নগরীর শ্রমিকশ্রেণী প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। সে বিদ্রোহ পাঁচ দিন কঠোর সংগ্রামের পর বহু রক্তপাতের ভেতর দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী নৃশংস আক্রমণে পরাজিত করেছিলো। ১৮৭১ সালের প্যারী-কমিউনের কথা আগেই বলেছি। এই কমিউনে শ্রমিকশ্রেণী সমাজবাদী পার্টির অনেক আইন প্রচলিত করেছিলো। কিন্তু বুর্জোয়াদের আক্রমণে ও নিজেদের অনেক ভুলের জন্য ৭২ দিন মাত্র স্থায়ী হতে পেরেছিলো। শ্রমিকশ্রেণী প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম রাষ্ট্রের পতনের পর তাদের ভেতর ও তাদের অন্যান্য দেশের সমর্থকদের ভেতর যে গভীর নৈরাশ্য ও হতাশা জন্মেছিলো, তা সোভিয়েতের পতনের পরের হতাশার সঙ্গে তুলনা করা যায়। স্পেনের ১৯৩৬ সালের কমিউনিস্ট নিধনযজ্ঞ সমাজতন্ত্রীদের মনে গভীর হতাশা সৃষ্টি করেছিলো। এইভাবে বহু ব্যর্থতার ভেতর দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে এবং ব্যর্থতার শিক্ষা নিয়েই পরের আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে দেখা দিচ্ছে। সুতরাং সোভিয়েতের ব্যর্থতা সমাজতন্ত্রের পক্ষে আপাতত ক্ষতিকর হলেও ভবিষ্যৎ সমাজতন্ত্রী সমাজ গঠন করতে যে যথেষ্ট সাহায্য করবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভবিষ্যতের আন্দোলনের সাফল্যের জন্যই সোভিয়েতের ব্যর্থতার কারণগুলো স্থিরভাবে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পূর্ব সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে বিশ্লেষণ করা দরকার।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের কারণগুলো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, সেগুলো আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করা খুবই মুশকিল। আমরা সেগুলো বোঝার ও বলার সুবিধের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করছি। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে এ সব কারণগুলোই একসঙ্গে কাজ করেছে এবং পরস্পর পরস্পরকে শক্তিশালী করেছে। এই কারণগুলোর ভেতর একটা বড় কারণ হলো, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সোভিয়েত দেশকে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হতো চারপাশের সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে। সোভিয়েতের শ্রমিক-কৃষকদের রাজত্ব ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে আবার ধনী বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর রাজত্ব স্থাপন করতে এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রথাকে ভেঙ্গে দিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা ফিরিয়ে আনার জন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ হয় ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকেই। বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই তারা সৈন্যসামন্ত নিয়ে ভেতরকার বুর্জোয়া ও জমিদারদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নবজাত সোভিয়েত সরকারকে আক্রমণ করে। কিন্তু সোভিয়েতের লালফৌজের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তারা সোভিয়েত দেশ থেকে পালিয়ে যায়। সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে তারা সোভিয়েত দেশের লোকদের ভাত-কাপড়ে মারবার চেষ্টা করে এবং সোভিয়েত দেশের সব আমদানি ও রপ্তানি বয়কট করে। এ সব করেও যখন সোভিয়েতকে কাবু করতে পারলো না, তখন গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা প্রচার করে সোভিয়েতের লোকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে।

এই সব আক্রমণ ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সোভিয়েত সরকারকে একদিকে যেমন জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ (শতকরা ২৬ ভাগেরও কিছু বেশি) দেশ রক্ষার খাতে নিয়োজিত করতে হয়, অন্যদিকে দেশের ভেতর শাসনও অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে চালাতে হয়। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি লগ্নি মূলধনের অভাবে যতোটা দ্রুত হতে পারতো ততোটা হলো না। সঙ্গে দেশের স্বার্থে ব্যক্তি-স্বাধীনতাও অনেকখানি খর্ব করতে হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মুসোলিনি ও হিটলারের শক্তি ইউরোপে যতোই বাড়তে লাগলো, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে খোলাখুলি আক্রমণের সম্ভাবনাও ততোই বাড়তে লাগলো। এর ফলে স্ট্যালিন দেখলেন দ্রুতই দেশে ভারী

শিল্পের প্রসার করতে না পারলে, দেশ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ভারি শিল্প বিশেষ করে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে হলে প্রচুর মূলধন দরকার। কারখানা শিল্পে সোভিয়েত তখনও বিশেষ উন্নত না হওয়ায় খনিজ কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য বিদেশে চালান দিয়ে বিদেশি মুদ্রা যোগাড় করে, তাই দিয়ে যন্ত্রপাতি কিনে দ্রুত কল-কারখানা স্থাপন করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিলো না। তাই স্ট্যালিনের নেতৃত্বে একদিকে যেমন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করা হলো, দ্রুত কারখানা শিল্পের বিস্তারের জন্য, তেমনি গ্রামে চাষীদের সংগঠিত করা হলো যৌথ-খামার স্থাপন করার জন্য। যৌথ-খামার ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কৃষিতে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন পদ্ধতির সুযোগ করে দিলো। এই সময়ে সোভিয়েত কৃষিতে উৎপাদনের যে অগ্রগতি দেখা গেল, তা কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। কৃষিতে উন্নতির গতি কেন রুদ্ধ হলো, তা বিশদ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, যৌথ-খামার কর্মীদের মধ্যে ক্রমশই উৎপাদনের ব্যক্তিগত উদ্যোগ কমে আসছিলো। উৎপাদনের অগ্রগতি রোধের এটা একটা বড় কারণ।

উৎপাদনের অগ্রগতি রোধের কুফলটা কিছুদিনের ভেতরই দেখা গেল। সেটা হলো কৃষির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সমস্যার আবির্ভাব। কৃষির উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দেশের মোট মূলধন ও রপ্তানি কম হতে লাগলো এবং বিদেশ থেকে কল-কব্জা আমদানি করার জন্য বিদেশি মুদ্রা ধার করতে হলো। পরবর্তীকালে সোভিয়েতের অর্থনৈতিক সংকটের এটাই একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের সম্ভাবনা যতোই ঘনিয়ে আসছিলো ততোই দ্রুত ভারী শিল্প ও অস্ত্র-সস্ত্রের কারখানা স্থাপনের প্রয়োজন বাড়ছিলো এবং এই কাজ করতে গিয়ে কঠোর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হয়েছিলো। ফলে দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরও 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' চললো এবং এই সব কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা শিথিল করা গেল না।

গণতান্ত্রিক প্রশাসন চালু না থাকার একটা কুফল হলো এই যে, যারা দেশ শাসনের দায়িত্বে ছিলেন তারা জনসাধারণের কাছে কোনো রকম দায়বদ্ধ না থাকায় ধীরে ধীর ভ্রষ্টাচারী ও ক্ষমতালোভী হয়ে উঠলেন এবং নিজেদের স্বার্থে প্রশাসন চালাতে লাগলেন। যেহেতু দেশের প্রশাসন কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশেই চলতো। তাই কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মকর্তারা একই দোষে দুষ্ট হয়ে পড়লেন। এর ফলে ধীরে ধীরে জনসাধারণের কাছ থেকে তারা দূরে সরে গেলেন এবং তাদের কাছে লোভী, স্বার্থান্ধ, ভ্রষ্টাচারী বলে আখ্যায়িত হতে

লাগলেন। এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্কসবাদ জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরে গেল। শুধু যে প্রশাসনে গণতন্ত্রের শেষ হলো তা নয়, কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরেও গণতন্ত্র নষ্ট হয়ে গেল এবং পার্টি নেতৃত্ব ও পার্টির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃই বাড়তে থাকল। পার্টির নেতারা তাদের তোষামোদকারী অনুগতদের শুধু পার্টির ভেতর স্থান করে দিলেন ও ধাপে ধাপে নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে তুলে দিলেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে, পার্টি নভেম্বর বিপ্লবের সময় অসম সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত রেখেছিলো, সেই পার্টিই এবার ঝড়ের প্রথম ঝাপটাতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়লো।

পার্টি ক্ষমতায় এলে এই রকম একটা অধোগতি হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে লেনিন খুবই সচেতন ছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য পার্টিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের পর থেকে বলশেভিক পার্টির সভ্য সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে পার্টির সভ্য সংখ্যা ছিলো ৮০,০০০। ঐ বছরই আগস্ট মাসে হলো ২ লক্ষ ৪০ হাজার এবং ১৯১৯ সালে হলো প্রায় ৩ লক্ষ ১৪ হাজার। লেনিন লিখেছেন, 'আমরা পার্টির এই রকম দ্রুত বৃদ্ধি দেখে শঙ্কিত। কেননা ভাগ্যান্বেষী ও ভূয়া মার্কসবাদী– যাদের গুলি করা উচিত– এরা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাতে তারা ক্ষমতায় আসা পার্টির ভেতর ঢুকতে পারে।'[১] লেনিন এই সব সুবিধাবাদী ভাগ্যান্বেষী ও অবিশ্বস্ত লোক যারা পার্টির ভেতর ঢুকে দু' পয়সা কামিয়ে নিতে চায়, তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখে এই সব সুবিধাবাদীদের হাত থেকে পার্টিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। দুঃখের বিষয় পার্টির ভেতরকার গণতান্ত্রিক কাঠামো গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, এইসব সুবিধাবাদী চাটুকাররা পার্টির দায়িত্বপূর্ণ নেতৃত্বের স্থানগুলো দখল করে নেয়। ফলে সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টি জনসাধারণের থেকে ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

গরবাচভের পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ট সংস্কার এর মধ্যে এক নতুন পরিস্থিতির সূচনা করলো। গরবাচভ যখন সোভিয়েত অর্থনীতির পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা বলেন, যখন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উৎপাদন শক্তিকে

---

১. "Left-wing Communism- An Infantle Disorder" in Selected Works, Vol 3. P. 313. Peoples Publishers, Moscow, 1977.

ভোগ্যপণ্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চান তখন সকলেই গরবাচভকে সমর্থন করলেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তিগুলির সঙ্গে আপোষের বিনিময়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শক্তিশালী ভিত্তিগুলি, যেমন মৌলিক শিল্পগুলির উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ইত্যাদি একের পর এক বিসর্জন দিলেন। পক্ষান্তরে অর্থনীতির উন্নতির জন্য নতুন কোনো কার্যকর পদক্ষেপও করতে পারলেন না। বাস্তবিক পক্ষে গরবাচভের আমলেই সোভিয়েত অর্থনীতির অধোগমণ দ্রুততর হল।

গরবাচভের কর্মপদ্ধতির অন্যতম ত্রুটি ছিলো, তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে প্রধানত ব্যক্তিগতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করতেন। এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে-বাইরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমাজবাদের বিরুদ্ধে যে ক্রমাগত আক্রমণ চালাচ্ছিলো, তার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টিকে সক্রিয় করার চেষ্টা করা হলো না। পক্ষান্তরে গরবাচভের বক্তব্যের মধ্যে স্ট্যালিনের সমালোচনা করা হলো, কিন্তু সমাজতন্ত্রের নীতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বের কথা বলা হলো না। সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার সাফল্যগুলিকে রক্ষা করার জন্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের সংহতি রক্ষা করার জন্য পার্টি সংগঠনকে ব্যবহার করার কোনো প্রচেষ্টাই গরবাচভ করলেন না।

জনসাধারণ হয়তো এই বিচ্যুতিপূর্ণ ভ্রষ্টাচারী সরকারের শাসন আরো কিছুদিন সহ্য করে নিতো যদি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি অব্যাহত থাকতো। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, যুদ্ধের আগে অবধি তাদের অবস্থার নিশ্চিতই অনেক উন্নতি হয়েছিলো। এমনকি যুদ্ধের ফলে দেশের কল-কারখানা ও জমি-জমার প্রচুর ক্ষতি হলেও, ১৯৭০ সাল অবধি তাদের অবস্থা ক্রমেই ভালো হচ্ছিলো। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে তাদের অবস্থার কোনো উন্নতি তো হলোই না, বরং নানাভাবে তাদের অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। অর্থনৈতিক উৎপাদনের দিক থেকে সোভিয়েত দেশ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর তুলনায় দ্রুত পিছিয়ে পড়তে লাগলো। এর প্রধান কারণ হলো, সোভিয়েতের কারখানায় ও কৃষিতে যুদ্ধোত্তর যুগের আবিষ্কার করা উন্নত ধরনের উৎপাদন যন্ত্র ও কলা-কৌশল ব্যবহার করতে না পারা। যুদ্ধের পর থেকেই পৃথিবীর সব দেশেই উৎপাদনের কলা-কৌশলের অভাবনীয় পরিবর্তন আসে। কম্পিউটার ও স্ব-চালিত যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়। কৃষিতেও নানা প্রকার বহু-ফলন বীজ, রাসায়নিক সার ও চাষের উন্নত ধরনের প্রথা চালু হয়। যার ফলে মানুষের উৎপাদন শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায় এবং নতুন নতুন ভোগ্যপণ্য, ওষুধপত্র ও চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি

আবিষ্কার হয়ে মানুষের জীবন যাত্রার মান অনেকখানি উন্নত হয়ে যায়। সোভিয়েত দেশের বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়াররা যে এই সব আবিষ্কারে পিছিয়ে ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় এমন একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো, যার ফলে এই সব উন্নত কলা-কৌশল নিজেদের কল-কারখানায় বা কৃষির কাজে লাগানো অত্যন্ত ঢিলে তালে হচ্ছিলো এবং অনেক ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বাতিলই থেকে যাচ্ছিল। এই ভয়ে তারা নতুন কল-কব্জা বসাতে মোটেই রাজি হতো না। এই কারণে সোভিয়েত দেশে ফ্যাক্টরিগুলো শুধু সংখ্যায় বাড়লো, কল-কব্জা ও উৎপাদন-পদ্ধতির গভীরতা বাড়লো না এবং শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদনের হার একই রকম থেকে গেল। ফলে যদিও নানা প্রকার আবিষ্কারের দরুণ উৎপাদন শক্তি পশ্চিমের অন্যান্য দেশের মতনই বেড়ে গেল, কিন্তু এই বর্ধিত উৎপাদন শক্তি কাজে লাগানো গেল না। দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা তা কাজে লাগাবার পথে এক বিরাট বাধা হয়ে উঠল। উৎপাদন-ব্যবস্থার এই অনমনীয়তার জন্য নতুন উৎপাদন শক্তি সোভিয়েত তেমন কাজে লাগাতে সমর্থ হয়নি, যতোটা পেরেছিলো পশ্চিমের ও জাপানের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো।

উৎপাদন ব্যবস্থায় এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো যখন আমলাতন্ত্র এবং স্বার্থান্বেষী প্রশাসকরা উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। তারা অর্থনীতির নিয়ম অনুসরণ না করে, ব্যক্তিগত খেয়াল অনুযায়ী নানা নির্দেশ দিয়ে উৎপাদনের উপর কর্তৃত্ব করতে থাকেন। এই ব্যবস্থা উৎপাদনের বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

মার্কসের একটা প্রধান আবিষ্কার হলো উৎপাদন-শক্তির ও উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিতর সংঘাত, যার ফলে হয় সমাজ-বিপ্লব। এই সংঘাতের ফলেই পুঁজিবাদী সমাজ একদিন ভেঙ্গে পড়বে ও সমাজবাদী উৎপাদন প্রথা চালু হবে, সেখানে উৎপাদন-শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে কারণ উৎপাদন মুনাফার জন্য না হয়ে মানুষের ব্যবহারের জন্য হবে। সুতরাং এই সমাজে বাজারের প্রশ্ন থাকবে না বলে উৎপাদনকে সংকুচিত করে রাখার প্রয়োজন হবে না। মার্কসের সমাজ-বিপ্লবের এই সূত্র যে শুধু পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষে খাটে- তা নয়, সব সমাজের পক্ষেই তা সত্য।

১৯৭০ সালের পর থেকে সোভিয়েত দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার দায়ভার সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর ভাগ্যান্বেষীদের দখলে চলে গেল। সেই ব্যবস্থায় নতুন ও উন্নত ধরনের উৎপাদন প্রণালী পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। এই

অবস্থায় মার্কসের ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লো। সোভিয়েতের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আর একবার প্রমাণিত হলো, সে যে উৎপাদন ব্যবস্থাই হোক না কেন, তা যদি উৎপাদন শক্তিকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে না পারে, বরং উল্টো তার প্রতিবন্ধক হয়, তবে সে উৎপাদন প্রথা ও সে সমাজ টেকে না। সে সমাজ নিজেদের সোস্যালিস্ট বলুক বা পুঁজিবাদীই বলুক।

মার্কস দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথায় উৎপাদনশক্তির পূর্ণ প্রয়োগ ব্যহত হয় একচেটিয়া ব্যবসায়ের উৎপত্তির ফলে এবং বাজারের সংকীর্ণতার দরুণ। যুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদীরা বহুজাতিক কোম্পানির বিস্তার করে সমগ্র বিশ্বে তাদের ব্যবসা ছড়িয়ে দিয়ে এবং ইউরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি করে তাদের পণ্যের বাজার অনেকখানি বিস্তৃত করেছিলো। তাছাড়াও অনুন্নত পেছনে পড়ে থাকা কলোনিগুলো থেকে সস্তায় কাঁচামাল আদায় করে ও বেশি দামে তাদের কাছে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে, টাকা ধার দিয়ে, পুরানো উৎপাদন কলা-কৌশলে বিক্রি করে ইত্যাদি নানাভাবে প্রচুর লাভ তুলে আনে। এই অতিরিক্ত লাভের একটা অংশ তারা তাদের নিজেদের দেশের শ্রমিকদের দিয়ে তাদের বশ করে রাখে এবং তাদেরকে অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের জীবন যাপন করা সম্ভব করে। যারা বেকার হয়ে যায় তাদের বেকার ভাতা দেবার এবং বৃদ্ধ ও অসমর্থদের সরকারি সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করে। এই রকম কিছু কিছু সংস্কারপন্থী ব্যবস্থা চালিয়ে তাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে হাতের মুঠোয় রেখে দেয়।

এদিকে সোভিয়েত দেশের শ্রমিকদের জীবিকার মান ১৯৭০ সাল থেকে নেমে যেতে আরম্ভ করে। ফলে ইউরোপের শ্রমিকদের সঙ্গে তুলনা করে তারা স্বভাবতই কমিউনিস্ট পার্টির উপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদীদের জোর প্রচারের ফলে তারা ভাবতে আরম্ভ করে পুঁজিবাদে বুঝি তাদের অবস্থা আরও ভালো হবে। এই আশা নিয়েই তারা সোভিয়েতের কমিউনিস্ট শাসন ভেঙ্গে দিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথায় ফিরে গেছে। কিন্তু দু' দিন যেতে না যেতেই তারা পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার আসল রূপ দেখতে পারছে। একদিকে তাদের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম যেমন তিন-চার গুণ বেড়ে গেছে, তেমনি হাজারে হাজারে বেকার হয়ে তাদের যেটুকু আয় ছিলো, তা-ও খোয়াতে বসেছে। তাই আমরা দেখছি, প্রতিদিন মস্কোর রাস্তায় হাজার হাজার শ্রমিক মিছিলে বার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার। সমাজবাদী সোভিয়েতে যে সব সুখ সুবিধা তারা ভোগ করতো, তা আজ তাদের কাছে

স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। কলোনি শোষণ না থাকলে, এই সব সুখ-সুবিধা পুঁজিবাদীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না- এ কথা তারা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে। আশা করা যায়, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দিন দিন এই প্রতিবাদ এতো শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে, শেষ অবধি জনসাধারণ তাদের ভুল বুঝতে পেরে আবার সমাজতন্ত্রের দিকে ফিরে আসবে। অবশ্য এটা নির্ভর করছে অনেকখানি কতোটা সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নিজেদের সংশোধিত করে সত্যিকার কমিউনিস্ট পার্টিতে পরিণত করতে পারবে তার উপর।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিফলতার আর একটা কারণ হলো, সোভিয়েত শ্রমজীবী মানুষের সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে দূরে সরে যাওয়া যা পার্টি নেতৃত্বের নজরে এলো না। তাই তাঁরা উৎপাদন ব্যবস্থায় আয়ের বণ্টন নিশ্চিত করলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী করে। কিন্তু উৎপাদনের ব্যাপারে শ্রমজীবী মানুষ যে শ্রমবিমুখ হয়েছেন, তার কোনো প্রতিবিধান করলেন না। সোভিয়েতে কাজ করুক বা না করুক কারো চাকরি খোয়া যাবার ভয় ছিলো না বা বেতন পাবার কমতি হতো না। ফলে শ্রমিক ও কর্মচারী অনেকেরই মানসিকতার দিক থেকে পুরোপুরি পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার ভাব সৃষ্টি হলো। যতো কম কাজ করে যতো বেশি টাকা আয় করা যায় তার চেষ্টা করতো তাদের কেউ কেউ। লেনিন বলে গেছেন, বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া বরং সোজা, কিন্তু হাজার হাজার ক্ষুদে পাতি-বুর্জোয়াদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা পরিবর্তন করে তাদের সমাজকেন্দ্রিক মানসিকতা গড়ে তোলা অনেক বেশি কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। এই ক্ষুদে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর শুধুই নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির মতলববাজি মনোভাব সহজে ছাড়ানো যায় না এবং এই মনোভাব থেকেই বুর্জোয়া শ্রেণী জন্ম নেয়। বল প্রয়োগ করে এদের মনোভাব বদলানো যায় না। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে বহুদিন প্রচার, শিক্ষা ও সংগঠনের ভেতর দিয়ে এদের মানসিকতার পরিবর্তন হতে পারে, যখন তারা সমাজের স্বার্থকেই সম্পূর্ণরূপে নিজের স্বার্থ বলে ভাবতে শিখবে। যতোদিন অবধি মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই সামাজিক মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত না হচ্ছে, ততোদিন অবশ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থা চালু করা যাবে না এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থাও বজায় রাখতে হবে। না হলে উৎপাদন কাঠামো অচিরে রুগ্ণ হয়ে পড়বে, যেমন হয়েছে সোভিয়েত দেশে। অবশ্য এই সামাজিক মানসিকতার দৃষ্টান্ত সবচেয়ে আগে পার্টিকেই দিতে হবে। সোভিয়েত দেশের এবং পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর স্বার্থান্বেষীদের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায়, ক্ষুদে পাতি

বুর্জোয়া শ্রেণীর মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হলোই না। বরং শ্রমিক শ্রেণীও এই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লো। ফলে কাজে ফাঁকি দেওয়া ও গাফিলতি করার রোগ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। অথচ সমাজতন্ত্রের নামে ও শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রের নামে এই সব অলস, স্বার্থপর, ব্যক্তিতান্ত্রিক কর্মচারীদের কোনো শাস্তি দেওয়া গেল না। তাছাড়াও যেহেতু তাদের কাজের কোটা শুধু সংখ্যা দিয়েই নির্ধারিত হতো, তাই যেনতেন ওই নির্দিষ্ট সংখ্যক পণ্য তৈরি করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করতো। যে জিনিসটা তৈরি করলো সেটা ভালো হলো কি মন্দ হলো, তার দিকে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিলো না। ফলে বহুল পরিমাণে বাজে জিনিস বাজারে আসতো, যার গুণগত মান এতো নিকৃষ্ট হতো যে লোকে বিদেশি জিনিসের জন্য হা-হুতাশ করতো। কাজ যাই করুক না কেন, সমাজতান্ত্রিক দেশ বলেই বেতনের দিক থেকে কারো কমতি হতো না। ফলে বাজারে জিনিসপত্র আসুক বা না আসুক, মানুষের পকেটে পয়সার অভাব হলো না। এর ফলে জিনিসপত্রের দাম চড়চড় করে বাড়তে লাগলো এবং কালোবাজার দেখা দিলো। পার্টির নেতারা ও কারখানার উচ্চস্থানীয় ও নেতৃত্বস্থানীয় কর্মচারীরা এই কালোবাজারের সুযোগ নিয়ে বেশ দু' পয়সা কামাতে লাগলো। ফলে জনসাধাণের কাছে কমিউনিস্ট পার্টি আরো ঘৃণ্য হয়ে উঠলো।

সোভিয়েত দেশ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার আর একটা কারণ হলো বিভিন্ন ভাষাভাষীদের ভেতর বিচ্ছিন্নবাদী জাতীয়তাভাবের উৎপত্তি। সোভিয়েত দেশ নানান ভাষাভাষীদের নিয়ে তৈরি হয়েছিলো। এই সব ভাষাভাষীদের ভেতর রাশিয়ানরাই ছিলো সংখ্যায় বেশি এবং আর্থিক অবস্থায় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে উন্নত। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরও তারা স্বভাবতই প্রাধান্য পেল। কিন্তু তথাপি লেনিনের শিক্ষা ও স্টালিনের কঠোর শৃঙ্খলার ফলে পার্টির ভেতর জাতিগত বৈষম্য দেখা দেয় নি এবং পার্টি বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলোকে একত্রে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলো। কিন্তু পার্টি যখন সুবিধাবাদী ও তোষামোদকারীদের হাতে চলে গেল, তখন অপেক্ষাকৃত পেছনে পড়ে থাকা জাতিসমূহের উপর রাশিয়ার পার্টির নেতাদের মাতুব্বরি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল এবং তারা নিজেদের অবহেলিত ও বঞ্চিত বলে মনে করতে লাগলো। এর ফলে রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সাম্রাজ্যবাদী ও কলোনির ভেতর যে রকম শোষক-শোষিতের সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়, সেই রকম একটা বিরূপ ভাবের সম্বন্ধ গড়ে উঠলো। এর ফলে গরবাচভের আন্দোলনের পরিণামে কেন্দ্রীয় শক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়লো, তখন এই সব ছোট ছোট জাতিগুলো নিজেদের স্বাধীন বলে

ঘোষণা করলো। আমরা আগের এক অধ্যায়ে দেখেছি, অসমান বিকাশ ও অসমান ব্যবহারের ফলেই বিচ্ছিন্নতাবাদ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সোভিয়েত দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটে প্রধান কারণে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন হয়। প্রথমত, কমিউনিস্ট পার্টির নৈতিক অধঃপতন ও পার্টির ভেতরের গণতান্ত্রিকতা নষ্ট হয়ে যাওয়া। এর ফলে জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও পার্টি শুধু অস্ত্রবলে নিজেদের শাসন চালিয়ে যায়। দ্বিতীয় কারণ হলো, নির্জীব পুরোনো উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য উন্নত ধরনের নতুন উৎপাদন কৌশল চালু করতে না পারা। যার ফলে জনসাধারণের অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং গোটা অর্থনৈতিক কাঠামোটাই ভেঙ্গে যায়। তৃতীয় কারণ হলো, অন্যান্য ভাষাভাষী ও জাতীয় লোকদের অসমান উন্নয়ন ও উন্নত রাশিয়ানদের দ্বারা তাদের অবহেলা।

মোট কথা, কমিউনিস্ট পার্টির যদি ক্ষমতায় এসে কলুষিত ও ভ্রষ্টাচারী না হয়, পার্টির শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিকতা বজায় রাখতে পারে এবং জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ বজায় রেখে তাদের সুখ-দুঃখের সহভাগী হয়ে, ধীরে ধীরে তাদের সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত বাড়িয়ে লোকের অবস্থার ক্রমশ উন্নতি বজায় রাখতে পারে, তাহলে বিপ্লবের ভেতর দিয়েই হোক অথবা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করেই হোক, ক্ষমতা অধিকার করতে পারলে আর ক্ষমতাচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকবে না এবং সত্যিকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

[এগারো]

বিশ্ব-রাজনীতির মূলসূত্র

আজ বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে শোষিত শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের সংগ্রাম এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সমস্ত দেশের সকল মানুষের জীবন-মরণ সুখ-শান্তি ও ভালো-মন্দ এই শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদীদের নেতৃত্ব নিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার রণকৌশল হলো সমাজতন্ত্রী দেশগুলো একে একে ধ্বংস করা ও

অনুন্নত দেশগুলোর বাজার দখল করে রাখা। ন্যাটো চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো আমেরিকার প্রধান সহায়। পূর্বে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া এবং ফিলিপিন। দক্ষিণে পাকিস্তান ও দক্ষিণ-পশ্চিমে তুরস্ক। আমেরিকার রণকৌশল ছিলো, সোভিয়েতকে ঘিরে এই সব দেশগুলোকে অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত করে রাখা এবং সুযোগ বুঝে ধ্বংস করা। কারণ তারা ভালো করে জানতো সোভিয়েত যতোদিন বেঁচে থাকবে ততোদিন সব দেশের শ্রমিক, কৃষক ও শোষিত মানুষ বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। সুতরাং সোভিয়েতকে ধ্বংস করতে পারলে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে অনেকখানি প্রতিহত করা যাবে। এই উদ্দেশে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে সোভিয়েতের চারদিকের দেশগুলিকে তাদের তাঁবেদারদের হাতে নিয়ে আসার জন্য। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, আফগানিস্তানের পলাতক লোকেদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, টাকা পয়সা দিয়ে পাকিস্তানের সাহায্যে সেখানে একটা প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থা তারা স্থাপন করেছে।

অবশ্য তারপরে নিজেদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেল, বিপর্যস্ত হয়ে গেল একই কারণে পূর্ব ইউরোপ। প্রতিদ্বন্দ্বী সমরশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই গৌরব আর রইলো না। নাটোর বিরুদ্ধশক্তি ওয়ারশ জোটের পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি হতে সোভিয়েত সেনাবাহিনী অপসারিত হলো। পারমানবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতাও অনেকটা মন্দাগতি হলো নিঃসন্দেহে। এ বিষয়ে আমেরিকায় সোভিয়েতে কিছু কিছু সমঝোতাও হলো এবং এই দুই মহাশক্তির সদা যুদ্ধোন্মুখ অবস্থাটার পরিবর্তন হলো। কিন্তু তাতে আমেরিকা যে অহিংস সাধু বনে গেল- তা মনে করলে ভুল হবে।

এসব ঘটনার মধ্যেই ইরাকে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ ও শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষেপণাস্ত্রের শক্তি প্রমাণের জন্যই নির্বিচারে গণহত্যা আমরা দেখেছি। ইদানীংকালে সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবার সঙ্গে আবার সংঘর্ষে নামার মতলবে কিউবার সংলগ্ন দ্বীপ হাইতিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে অভিযানের প্রস্তুতি এ সবই আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের প্রকাশ। তবে ভিয়েতনামের শিক্ষা, উত্তর কোরিয়ার শিক্ষা আমেরিকা ভুলতে পারে না। তাই একেবারে হঠকারীর মতো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। নিজের দেশ থেকেই প্রতিবাদ উঠছে। তাই সমাজতন্ত্রবিরোধী তৎপরতা তাকে চতুরভাবেই চালাতে হয়। তাতে ক্যাপিটালিজমের মুনাফাবাজিটা বজায় থাকে, অথচ পরদেশ আক্রমণের সোরগোলটা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু প্রয়োজনে সামরিক হস্তক্ষেপেও যে সে কুণ্ঠিত হবে না- এ কথাটা সব সময়েই মনে রাখতে হবে।

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের আর এক কৌশলী কাজ হলো- প্রত্যেক দেশের ভেতর তাদের অনুগত বুর্জোয়া শ্রেণীকে শক্তিশালী করা ও যেনতেন প্রকারে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর সংগঠিত শক্তিকে দুর্বল করা। এর জন্য তারা যেমন একদিকে টাকা-পয়সা ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বুর্জোয়া গভর্নমেন্টকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। আবার অন্যদিকে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীকে দুর্বল করার জন্য তাদের ভেতর নানান রকম মতবিরোধের সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে থাকে। কিছু কিছু লোককে অতিবিপ্লবী সাজিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাতে কমিউনিস্টরা নিজেদের ভেতর ঝগড়া-ঝাটি করেই শক্তি ক্ষয় করে ফেলে। অনেক জায়গায় আবার দেশের ভিতর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পিছনেও সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তা থাকে। এর উদ্দেশ্যও দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দেশকে ভেতর থেকে দুর্বল করে ফেলা। তাছাড়া, এক দেশকে অন্যদেশের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া আমেরিকা আর তার সাম্রাজ্যবাদী মিত্রদের একটা কৌশল। ভারত-পাকিস্তান বিভেদে উভয় দেশকে আমেরিকার পিঠ চাপড়ানির কথা আমরা জানি। এর উদ্দেশ্যও দু' দেশকেই দুর্বল করে রাখা, যাতে এরা আমেরিকার উপর নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হয়।

সাম্রাজ্যবাদের অন্য কৌশল

আগেই বলেছি, সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠার কৌশলটা এখন অনেক সূক্ষ্ম। এ বিষয়ে 'ছোটদের অর্থনীতি' বইয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। এখান শুধু সূত্রটা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দু'একটি কথা বলছি।

(১) বহুজাতিক কোম্পানি : সত্তরের দশকের আগে থেকেই একটা খুব শক্তিশালী অস্ত্র তারা এই কাজে ব্যবহার করে সেটা হলো, তাদের দেশের ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। বড় বড় এই সব কোম্পানিগুলো ব্যবসার নাম করে এবং অনুন্নত দেশগুলোতে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও শিল্প-কৌশল চালু করবে বলে তাদের কোম্পানির শাখা খোলে। অনুন্নত দেশগুলোর বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকদের তাদের কোম্পানিতে কিছু কিছু টাকা লগ্নি করবার সুযোগ দিয়ে এইসব শ্রেণীর লোকদের হাত করে ফেলে। ফলে অনুন্নত দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী ও শাসকরা, বড় বড় সেনাপতিরা, রাজনৈতিক নেতারা ও বড় বড় সরকারি কর্মচারী এই সব কোম্পানির দালাল হয়ে পড়ে। এই ভাবে অনেক কষ্টে ও অনেক ত্যাগ স্বীকার ও রক্তক্ষয় করে

যে স্বাধীনতা অর্জন করা হয়েছিলো, ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অগোচরে দেশের মানুষ সে স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। তাদের দেশের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী সে স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার তাগিদে এই সব বিদেশি কোম্পানির দাসে পরিণত হয়। এইভাবে বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো যে শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করে অনুন্নত দেশের সম্পদ ও শ্রমশক্তি শোষণ করে নেয়- তা নয়, দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীকে হাত করে ফেলে গোটা দেশটাকেই তাদের প্রচ্ছন্ন কলোনিতে পরিণত করে। ছোট ছোট অনুন্নত দেশের পক্ষে এই ধরনের অর্থনৈতিক আক্রমণ ঠেকান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি ভারতবর্ষের মতো বড় দেশ যার স্বাধীনতা কঠোর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে জনসাধারণ অর্জন করেছে, সেই রকম বড় ও রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন দেশের পক্ষেও আজ এই আক্রমণ প্রতিহত করা দস্তুর মতো কঠিন হয়ে পড়েছে এবং অত্যন্ত দ্রুত ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বুর্জোয়াশ্রেণীর সাকরেদ হয়ে পড়ছে। পুঁজিবাদী প্রথায় দেশের অর্থনীতি চালাতে গিয়ে গভীর সংকটগ্রস্ত হয়ে বাধ্য হয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের ও বিদেশি কোম্পানিগুলোর আশ্রয় নিচ্ছে। এইভাবে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী দেশের লোকদের অগোচরে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলছে।

(২) 'Aid' বা 'সাহায্য' : নয়া-সাম্রাজ্যবাদী প্রথায় এই সাম্রাজ্যবাদীরা শুধু যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সাহায্যে কলোনির সম্পদ ও শ্রমশক্তি শোষণ করতে লাগলো- তা নয়, সরাসরি দেশের উন্নতি করার নাম করে তাদের টাকা ধার দিতে লাগলো। সাধারণ বাজার থেকে কম সুদে এই ধার দেয় বলে এটাকে ওরা বদান্যতার ভান করে 'Aid' বা 'সাহায্য' বা 'খয়রাতি' বলতে লাগলো। এই 'সাহায্য' বা 'খয়রাতির' আসল উদ্দেশ্য হলো কলোনিগুলোতে তাদের বাড়তি মূলধন খাটানো এবং 'সাহায্যের" নাম করে এই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ভেতর ধরে রাখা, যাতে তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে। এই বাড়তি মূলধন খাটানো, কলোনির কাঁচামাল আদায় করা ও কলোনির বাজার দখল করার জন্যই কলোনির দরকার হয় তা আমরা দেখেছি। এই সব কাজই সম্ভব হয়, যদি কলোনিগুলোকে তথাকথিত স্বাধীনতা দিয়ে কলোনির বুর্জোয়া শাসকদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া যায়।

একবার এই ফাঁদে পা দিলে কলোনিগুলোর আর রক্ষে থাকে না, দেখতে দেখতে তারা দেনার দায়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। ভারতবর্ষ, যেখানে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী সারাক্ষণ দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করে ফেলবে বলে বড়াই করে, সেখানেও

বিদেশি ঋণ শতকরা ১২ ভাগ করে বাড়ছে প্রতি বছর। ১৯৭০ সালের ৭৯৪ কোটি ডলার বিদেশি ঋণ ১৯৮৪ সালে ২২৪০ কোটি ডলার হয়েছে, এবং বাৎসরিক সুদের পরিমাণ ১৯৭০-এ ১৯ কোটি ডলার থেকে ১৯৮৪-তে ৬০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। ইন্দোনেশিয়া, যেখানে প্রচুর তেল পাওয়া যায়, সেখানেও বিদেশি ঋণ শতকরা ৫৫ ভাগ বাড়ছে প্রতি বছর, দক্ষিণ কোরিয়ায় এই বার্ষিক বৃদ্ধি শতকরা ৮৫ ভাগ, আর্জেন্টিনায় শতকরা ৯৫ ভাগ, বার্মায় শতকরা ১৪০ ভাগ, মালয়শিয়ায় শতকরা ১৯৫ ভাগ, পাকিস্তানে শতকরা ২১০ ভাগ- সর্বোচ্চ নেপালে শতকরা ৯৪২ ভাগ। এই সব দেশে এমনকি ভারতবর্ষেও জাতীয় আয় শতকরা ৪ ভাগের বেশি কদাচিৎ বাড়ে। রপ্তানি আয় থেকেই বিদেশি মুদ্রার চাহিদা মেটাতে হয় মোটামুটিভাবে। কিন্তু সেই রপ্তানিও কদাচিৎ শতকরা ১০/১২ হারে বাড়ে। কাজেই দেনা শোধ ও সুদ দিতে গিয়ে আবার দেনা করতে হয়। এই ভাবে ক্রমশ এই সব দেশগুলো নয়া-সাম্রাজ্যবাদের হাতে পুরোপুরি বিকিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই সব দেশের বুর্জোয়া, সামন্ত ও সেনাপতি শাসকেরা নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে যতোই 'সাহায্য' নিচ্ছে ততোই আরও বেশি সাহায্য তাদের দরকার হয়ে পড়ছে, আগের সাহায্যের কবল থেকে রেহাই পাবার জন্য। কিন্তু এই সব দেশের বুর্জোয়া-সামন্ত-সেনাপতি শাসক দলের এই ঋণ না নিয়েও গত্যন্তর নেই। কারণ নিজের দেশের উদ্বৃত্ত সম্পদ উৎপাদনের কাজে লাগাতে গেলে সম্পত্তিওয়ালাদের কাছ থেকে সম্পদ কেড়ে নিতে হয়। এটা সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার বজায় রেখে কখনোই সম্ভব নয়। সেই জন্য ইচ্ছা করলে সমাজতন্ত্রী দেশগুলো বিদেশি ঋণ না নিয়েই দেশে শিল্প-কারখানা বাড়িয়ে ফেলতে পারে। আর বুর্জোয়া-সামন্ত-সেনাপতিদের শাসনে থাকা অনুন্নত দেশগুলো ক্রমেই বেশি বেশি করে নয়া-সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু পুরোনো কলোনিগুলোর ঋণ বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থায় আসবে যখন এইসব দেশের লোকেরা আর তাদের দেশের বুর্জোয়া-সামন্ত-সেনাপতিদের শাসন মানবে না। তখনই হবে পশ্চিমী নয়া-সাম্রাজ্যবাদীদের বিপদ। এই জন্য তোমরা হয়তো লক্ষ্য থাকবে, যে কোনো অনুন্নত দেশে জনগণ যখনই বিপ্লবের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন নয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে টাকা-পয়সা, অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে এবং তাদের আশেপাশে বুর্জোয়া-সামন্ত-সেনাপতিদের লাগিয়ে সেই দেশের বিপ্লবকে পরাজিত করতে। আফগানিস্তানের জনগণের বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য আমেরিকার পাকিস্তানকে ব্যবহার করা এর একটা ভালো উদাহরণ।

ভারতবর্ষের মানুষ হিসেবে আমরা তাহলে বুঝতে পারি আমাদের যাত্রাপথ কোনো দিকে? আমাদের দেশে এখনো জমিদারী-জায়গীরদারী একেবারে শেষ হয় নি, শিল্প-বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা শান্তি চাই, আমরা সাম্রাজ্যবাদের সকল শোষণের অবসান চাই, আমরা চাই যথার্থ গণতন্ত্র। চাই আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি হউক, কৃষক জমির মালিক হোক, শিল্প কারখানা গড়ে উঠুক। আমাদের দেশ শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিতে, পণ্যে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে দ্রুত উন্নত হোক- সাথে সাথে পৃথিবীর অন্য সকল জাতিও উন্নতি করুক এই আমাদের কামনা। আমাদের প্রয়োজন, তাই এখন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের, সাম্রাজ্যবাদের অবসানের, কৃষি বিপ্লবের, শিল্প-বিপ্লবের। আমাদের স্থানও তাই শান্তির শিবিরে- গণতন্ত্রের শিবিরে, সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায়ও নয়।

তাছাড়া, যদিও বা আমরা 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা' লাভ করে থাকি, এ বিষয়ে সকলে এক মত যে, আমরা 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা' লাভ করি নি। ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক থেকে এখনও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল রয়ে গিয়েছে- ব্রিটেনের, আমেরিকার আর্থিক ঋণ বা খয়রাতি এখনও তাকে গ্রহণ করতে হচ্ছে। তা ছাড়াও দেশের শিল্পোন্নয়নের কাজে বিদেশি পুঁজিপতিদের অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ এখনো পুরোপুরি বজায় রয়েছে, এমনকি তাতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। আর সম্প্রতি গ্যাট চুক্তিতে নতুন খোলাবাজারি ব্যবস্থায় তা দেশের উপর একেবারে চেপে বসতে যাচ্ছে।* আমাদের বোঝা উচিত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদ তার একটা ভোল ফিরিয়েছে। দরকার হলে সে প্রত্যক্ষ সৈন্য কামান নামিয়ে দেশ দখল করতে বাধ্য হয়। যেমন কোরিয়ায়, ভিয়েতনামে চেষ্টা করেছিলো। কোথাও কোথাও আবার দেশের অভ্যন্তরে তার অনুচরদের যোগসাজসে আকস্মিক খুন-খারাপির মধ্য দিয়ে সে রাষ্ট্র ক্ষমতা তার অনুকূলে নিয়ে আসে। যেমন কিছুদিন আগে করেছেন চিলিতে, ইন্দোনেশিয়ায়, বাংলাদেশে। কিন্তু বেশি ক্ষেত্রেই সে রাজনীতির ক্ষমতাটা ওভাবে জাহির না করে অর্থনৈতিক শোষণের ব্যবস্থাই বিস্তৃত করে। একেই বলে 'নয়া সাম্রাজ্যবাদ' এবং এটাই হচ্ছে 'উপনিবেশিকতার নতুন কৌশল।' ভারতবর্ষ 'অর্থনৈতিক পরাধীনতা'য় এ ভাবেই এখন নতুন সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে পড়তে যাচ্ছে। আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের সম্পূর্ণ প্রসার,

আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ততোক্ষণ অসম্ভব, যতোক্ষণ এই বিদেশি ক্যাপিটালের শৃঙ্খল আমরা স্বীকার করছি। আমাদের রাজনীতির প্রধান কথা তাই হওয়া উচিত- শান্তি, সর্বজাতির মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ও সাম্রাজ্যবাদীদের দেশকে লুঠ করার চক্রান্ত থেকে দেশকে মুক্ত করে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার বিপ্লব সম্পূর্ণ করা, জনায়ত্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রা।

---

* এ বিষয়টা ছোটদের অর্থনীতি' বইয়ে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে।

ছোটদের অর্থনীতি

অধ্যাপক নীহার কুমার সরকার

সংশোধিত নতুন সংস্করণ ২০০১

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

ছোটদের অর্থনীতি

অধ্যাপক নীহার কুমার সরকার

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী সংস্করণ

প্রকাশকাল

অমর একুশে গ্রন্থমেলা
ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ফাল্গুন ১৪২০

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৪৩

বত্রিশতম সংস্করণ
অক্টোবর ২০০১

পুঁথিঘর
২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

লেখকের কথা

'ছোটদের রাজনীতি', 'ছোটদের অর্থনীতি' জাতীয় বই-এ প্রায় প্রতি সংস্করণেই কিছু না কিছু সংযোজন সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'ছোটদের অর্থনীতি' বইয়ে আগের সংস্করণে 'আন্তর্জাতিক মুদ্রা-তহবিল', 'বহুজাতিক কোম্পানি' ইত্যাদি সম্পর্কে অধ্যায় যুক্ত হয়েছে।

এবারের সংস্করণে 'খোলা-বাজার নীতি' এবং আরো আধুনিক বিষয় 'ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও গ্যাট চুক্তি' এ দু'টি বিষয়ের আলোচনা বই-এ যুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেছি। এর মধ্যে 'খোলা-বাজার নীতি' সম্পর্কে নতুন অধ্যায় 'গণশক্তি' পত্রিকায় গত বছর প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধের ঈষৎ পরিবর্তিত পুনর্মুদ্রণ। 'ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও গ্যাট চুক্তি' অধ্যায়টি আমার প্রিয় ছাত্র ড. দেব কুমার বসু লিখে দিয়েছেন- এই বই-এর কিশোর পাঠার্থীদের জন্য। সম্প্রতি অস্ত্রোপচারের জন্য নার্সিংহোমে যাবার সময় এ কাজের দায়িত্ব আমি তাঁকে দিয়ে গিয়েছিলাম। অর্থনীতি সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে তাঁর যোগ্যতার কথা সকলেই জানেন। তবে তাঁর অবসরহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এ কাজটুকু তিনি যে সম্পন্ন করে দিতে পেরেছেন, তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

(সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ সংস্করণ থেকে পুনর্মুদ্রিত)

সূচিপত্র

[এক]

অর্থনীতির অর্থ কী?

অর্থনীতি শাস্ত্রটা তোমাদের অনেকের কাছেই হয়তো অজানা। কিন্তু অর্থনীতি যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, সেসব বিষয় তোমাদের মোটেই অজানা নয়। কারণ সেগুলো না হলে, আমরা বাঁচতে পারি না, ভালোভাবে বাঁচা তো দূরের কথা। আমাদের বেঁচে থাকতে হলে, নানান রকম জিনিসপত্রের প্রয়োজন। খাবার-দাবার, বাড়ী-ঘর-দোর, পোষাক-পরিচ্ছদ এগুলো না হলে তো বেঁচে থাকাই অসম্ভব। তারপর একটু সুখে বেঁচে থাকতে গেলে গান-বাজনা, বই সিনেমা ইত্যাদি দরকার হয়। এমনিভাবে সারাক্ষণ নানারকম জিনিসের অভাব আমরা বোধ করি এবং সেসব অভাব মেটাবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করি। মানুষ যতো সভ্য হয়, তার এইসব জিনিসপত্রের দরকার হয়। কিন্তু আমরা সভ্যতার যে স্তরেই থাকি না কেন, কিছু না কিছু জিনিসের দরকার আমাদের হবেই এবং এই জিনিসপত্রের অভাব পূরণের জন্য বিভিন্ন উপায়ে আমরা চেষ্টাও করবো। এই অভাব মেটাবার জন্য বিভিন্ন প্রকার জিনিস তৈরি করাকেই বলে **উৎপাদন**।

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ যখন অসভ্য অবস্থায় ছিলো, তখন তারা বনের পশু শিকার করে ও গাছের ফলমূল যোগাড় করে খেয়ে বাঁচতো। শিকারের উদ্দেশ্যে তারা তীর-ধনুক তৈরি করতো, পাথরের টুকরো ধারালো করে নিতো এবং তাই নিয়ে নিজেদের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র তৈরি করতো। মাংস, ফলমূল ছিলো তাদের ক্ষুধার অভাব মেটাবার সামগ্রী এবং এগুলো তারা নিজেরাই পরিশ্রম করে তৈরি করে নিতো। তেমনি আবার আজকাল সভ্য জগতে চাষবাস করে ধান, চাল, গম, তুলো, পাট ইত্যাদি, খনি থেকে লোহা, কয়লা ইত্যাদি এবং কারখানায় কলকব্জা খাটিয়ে কাপড়-চোপড়, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। খনি, মাঠ ও কারখানায় উৎপন্ন এইসব নানা রকম জিনিসের সাহায্যে আমাদের অভাব মেটে। অসভ্য আমলে মানুষদের সামান্য কয়েকটা জিনিস উৎপাদন করলেই চলতো, আর আজকাল সভ্য মানুষের অনেক কিছু উৎপাদন করতে হয়। কিন্তু সভ্য বলো, আর অসভ্যই বলো, কোনো মানুষের পক্ষে উৎপাদন ছাড়া বেঁচে থাকা মোটেই সম্ভব নয়। মানুষ সভ্যতার যে স্তরেই থাকুক না কেন, যে সমাজেই বাস করুক না কেনো, যে

কোনো দেশেই থাকুক না কেন, আর যে জাতিরই হোক না কেনো, উৎপাদন ছাড়া মানুষ কোনো অবস্থাতেই বাঁচতে পারে না।

কিন্তু এই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদন বিভিন্নভাবে হতে পারে। মানুষের ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখতে পাবো, মানুষ এক এক অবস্থায় এবং এক এক যুগে এক এক রকম উপায়ে জিনিসপত্র উৎপাদন করেছে এবং তা নিজেদের ভেতর ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে নিজেদের অভাব মিটিয়েছে। জিনিসপত্র তৈরির নিয়ম ও তা ভাগ-বাটোয়ারা করার নিয়মকে বলে **উৎপাদন প্রণালী**।

এই উৎপাদন প্রণালীতে কে কীভাবে অংশ নেয়, তার উপর মানুষের পরস্পরের ভেতর একটা সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে যায়। একে বলে **উৎপাদন সম্বন্ধ**। যেমন যদি কেউ কারখানায় মজুরের কাজ করে, তবে উৎপাদন প্রণালীতে সে মজুরের অংশগ্রহণ করলো এবং এর ফলে কল-মালিকের সঙ্গে, অন্যান্য মজুরের সঙ্গে, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে, দোকানদারদের সঙ্গে, চাষীদের সঙ্গে, জমিদারদের সঙ্গে, এই রকম সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তার একটা বিশেষ সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গেল। উৎপাদন প্রণালী যুগে যুগে বদলে যায়, তেমনি উৎপাদন সম্বন্ধও সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। এর ফলে উৎপাদনের কাজে কে কীভাবে অংশ নেবে এবং উৎপাদিত জিনিসপত্রের কতোটা কে পাবে- তার নিয়মও বদলে যায়। যেমন মধ্যযুগে জমিদারদের সঙ্গে চাষীদের এক রকম সম্বন্ধ ছিলো। জমিদার চাষীদের উৎপাদনের একটা অংশ দখল করে নিতো ও নিজে তা ভোগ করতো এবং চাষীদের দিয়ে নিজের খাস জমিতে বেগার খাটাতো। এই ছিলো জমিদারের সঙ্গে চাষীদের উৎপাদন সম্বন্ধ। আজকাল সে সম্বন্ধ বদলে যাচ্ছে। আজকাল চাষীরা দেনার দায়ে ও খাজনার দায়ে জমি বিক্রি করে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে কারখানায় যেমন মজুররা কাজ করে মাইনে নিয়ে, তেমনি জমিতেও মাইনে পেয়ে কিংবা ভাগ-চাষী হিসেবে চাষীরা চাষ করছে। পুঁজিবাদী যুগে এই হলো জমিদার ও চাষীদের সঙ্গে উৎপাদন সম্বন্ধ।

অর্থনীতির কাজ হচ্ছে– প্রথমত, বিভিন্ন যুগের উৎপাদন প্রণালী ও মানুষের উৎপাদন সম্বন্ধ কী ছিলো বা কী আছে তা আবিষ্কার করা। দ্বিতীয়ত, এই উৎপাদন প্রণালী ও উৎপাদন সম্বন্ধ কী কী কারণে বদলে যায় এবং এক উৎপাদন প্রণালী নষ্ট হয়ে গিয়ে তার জায়গায় আরেক উৎপাদন প্রণালী কেন স্থাপিত হয় তা আবিষ্কার করা। তৃতীয়ত, বর্তমানে যে উৎপাদন প্রণালী প্রচলিত আছে তার গতি কোনো দিকে সে ইঙ্গিত দেওয়া।

সুতরাং দেখছে পাচ্ছো, যদিও অর্থনীতি সাধারণ জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা শুরু করে, কিন্তু এর সিদ্ধান্তগুলো খুব সহজ নয় এবং হেলার বস্তুও নয়। কারণ

উৎপাদন প্রণালীর উপর কোটি কোটি মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে এবং উৎপাদন প্রণালীতে গলদ দেখা দিলে, কোটি কোটি মানুষের কষ্ট পেতে হয়। আসলে বর্তমান সমাজে যেসব সমস্যা দেখতে পাও, যেমন বেকার সমস্যা, ব্যবসা-সঙ্কট, যুদ্ধ, খাদ্য সমস্যা ইত্যাদি, এর প্রায় অধিকাংশ সমস্যাই উৎপাদন প্রণালীর গলদের জন্য হয়ে থাকে। অর্থনীতি যদিও তোমাদের কাছে কঠিন লাগতে পারে, কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে পড়লে, এইসব সমস্যাগুলোর মূল কারণ সম্বন্ধে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারবে।

[দুই]

উৎপাদন প্রণালী

উৎপাদন প্রণালীগুলোকে মোটামুটিভাবে দু'রকম ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম- **স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালী**, দ্বিতীয়- **পণ্য উৎপাদন প্রণালী**। স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালীতে জিনিসপত্র বেচাকেনা থাকে না বা খুব সামান্য পরিমাণে থাকে। লোকে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করে না। নিজেরা ভোগ করার উদ্দেশ্যেই সব কিছু তৈরি করে থাকে। যেমন মনে করো, গ্রামের মানুষ যদি তাদের যা কিছু দরকার– কাপড় চোপড়, ধান, চাল, লাঙ্গল ইত্যাদি সবকিছু নিজেরাই তৈরি করে নেয়, তবে তাকে বলবো স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালী (Natural Productive System)। স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিনিময়ের অর্থাৎ কেনাবেচনার অভাব। যদিও কেনাবেচা হয়, তা হলেও তা কতোকটা আকস্মিক গোছের। কারো হয়তো হঠাৎ বাড়তি কিছু তৈরি হয়ে গেছে, সে সেটা ঐ রকম যার বা যাদের হঠাৎ বাড়তি অন্য কিছু আছে, তাদের সঙ্গে অদল-বদল করে। যদিও বা কেনাবেচা নিয়মিত হয়, তাহলেও তার পরিমাণ সমাজের মোট উৎপাদনের তুলনায় খুব কম। এখানে ভোগের জন্য সোজাসুজি উৎপাদনই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। যেমন–

পণ্য উৎপাদন প্রণালী কিন্তু ঠিক এর উল্টো। উৎপাদন হয় এখানে প্রধানত বিনিময়ের জন্য। যে যা কিছু তৈরি করুক, সে তা বাজারে এনে হাজির করে বিক্রির জন্য এবং তার উৎপাদিত জিনিস বিক্রি করে, তার যা দরকার তাই সে কিনে নেয়। যেমন একজন তাঁতী, তার চালের দরকার। তখন সে কাপড় তৈরি করে এবং বাজারে কাপড় বিক্রি করে চাল কেনে। শ্রমিকের কাপড় দরকার, তার সম্বল শুধু শ্রমশক্তি; সে তাই বিক্রি করে এবং তাতে যা পায়, তাই দিয়ে সে কাপড় কেনে। এরকম সমাজেও অবশ্য কিছু কিছু জিনিস ভোগের জন্য সোজাসুজিভাবে তৈরি হতে পারে, যেমন তোমার কলমদানিটা হয়তো তুমি নিজে তৈরি করে নিতে পারো। কিন্তু সমাজের মোট যতো কিছু জিনিস উৎপাদিত হয় তার তুলনায় এগুলো খুব সামান্য। বেশির ভাগ জিনিসপত্রই বিক্রির জন্য তৈরি হয়। এখানকার নিয়ম হচ্ছে–

বিনিময় হলো পণ্য উৎপাদন প্রণালীর প্রধান লক্ষণ এবং বিনিময়ের জন্য জিনিসপত্র তৈরি হয় বলে এগুলোকে বলা হয় **পণ্য** অর্থাৎ যা দোকানে কেনাচেনা হয় তাকেই পণ্য বলে। জিনিসপত্র তখন আর শুধু জিনিসপত্র থাকে না, একটা নতুন গুণ এ সবের ভেতর দেখা দেয়। আমাদের অভাব তো এরা মেটাতে পারেই, উপরন্তু এদের সাহায্যে অন্য জিনিসপত্রও আমরা কিনতে পারি।

কিন্তু বিনিময় থাকতে গেলে আর দু'টো জিনিস থাকার দরকার হয়। সে দু'টো হচ্ছে– শ্রমবিভাগ ও সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার। প্রত্যেক সমাজেরই বিভিন্ন রকম জিনিসপত্রের দরকার হয়। কিন্তু সমাজের প্রত্যেকেরই যার যা দরকার নিজে তৈরি করে নেয় না। তোমার হয়তো কাপড়ের দরকার, কিন্তু তুমি কাপড় তৈরি করো না, কাপড় তৈরি করে তাঁতী। আবার তাঁতীর হয়তো জুতোর দরকার, কিন্তু জুতো তৈরি করে মুচি। এমনিভাবে সমাজের মোট যা যা জিনিস

দরকার, সেই জিনিসগুলো তৈরি করার ভার এক এক দল লোক নিয়ে নেয়। সমাজের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র তৈরির জন্য যে শ্রম দরকার, তা ভাগ করে এক এক দলের উপর এক এক রকম শ্রম করার ভার পড়ে। এই যে মোট আবশ্যকীয় শ্রম ভাগ করে দেওয়া- একেই বলে **শ্রমবিভাগ**। শ্রমবিভাগ করে লাভ কী? শ্রমবিভাগ করলে প্রত্যেককেই শুধু একটা জিনিস তৈরি নিয়েই থাকতে হয় সারা জীবন। যেমন, যে মুচি সে জুতো তৈরি ছাড়া আর কিছু করে না। তার ফলে জুতো তৈরি করতে সে খুব দক্ষ হয়ে পড়ে। খুব সহজেই অল্প পরিশ্রমে অনেক জুতো এবং ভালো ভালো জুতো তৈরি করতে পারে। এমনি প্রত্যেকেই তার নিজের কাজে খুব পটু হয়ে ওঠে। এর জন্যে একই পরিশ্রমে জিনিসপত্র অনেক বেশি তৈরি হতে পারে। সমাজের মোট উৎপাদনের ক্ষমতাও এতে বেড়ে যায়। কিন্তু শ্রমবিভাগ থাকলেই যে বিনিময় থাকবে তার কোনো মানে নেই। মনে করো, সমাজের সবাই যে যা তৈরি করলো তাকে এক জায়গায় জড় করলো এবং সেখান থেকে যার যেমন দরকার সেই অনুযায়ী নিয়ে নিলো। এ রকম হলে বিনিময় দরকার হয় না, যদিও শ্রমবিভাগ থাকে। কিন্তু বিনিময় থাকতে হলে শ্রমবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার থাকা দরকার। অর্থাৎ যে যা তৈরি করবে সেটা তার নিজেরই জিনিস হওয়া চাই। সেটা যদি সমাজের হয়, তাহলে বিনিময় হবে না।

কাপড় তাঁতীরই থাকবে, জুতো মুচিরই থাকবে এবং চাল চাষীরই থাকবে-এ রকম যদি নিয়ম হয়, তাহলে বিনিময় ছাড়া বেঁচে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, মনে করো মুচির খাবার দরকার। সে জুতো তৈরি করে। কিন্তু জুতো খেয়ে তো আর বাঁচা যায় না। তাই সে জুতো নিয়ে বাজারে হাজির হলো। আবার চাষীর জুতোর দরকার। সে চাল তৈরি করে, চাল নিয়ে সে বাজারে হাজির হলো। এরপরে দরকষাকষি করে চাল দিয়ে জুতো পেল, আর মুচি জুতো দিয়ে চাল পেল। সুতরাং বিনিময় প্রথা থাকতে গেলে খুব বেশি রকম শ্রমবিভাগ চাই এবং জিনিসপত্রে ব্যক্তিগত অধিকার থাকা চাই। ব্যক্তিগত অধিকার থাকলে, শ্রমবিভাগ যতো বাড়বে বিনিময় প্রথার ততো বেশি দরকার হবে এবং তখনই হবে পণ্য উৎপাদন প্রথার সৃষ্টি।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে আমরা আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎপাদন প্রণালী প্রচলিত দেখতে পাই। এর কতকগুলো স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালীর শ্রেণীতে পড়ে, আর কতগুলো পণ্য উৎপাদন প্রণালীর পর্যায়ে পড়ে। আবার কতকগুলো দু'য়ের মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে। পরের পৃষ্ঠায় ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে, সমাজ কীভাবে শ্রমকে স্বাভাবিক উৎপাদন

প্রণালী থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে পণ্য উৎপাদন প্রণালীর দিকে নিয়ে গেছে এবং এখন আবার পণ্য উৎপাদন প্রণালী থেকে ফিরে স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালী একটা উচ্চস্তরের দিক এগুচ্ছে :
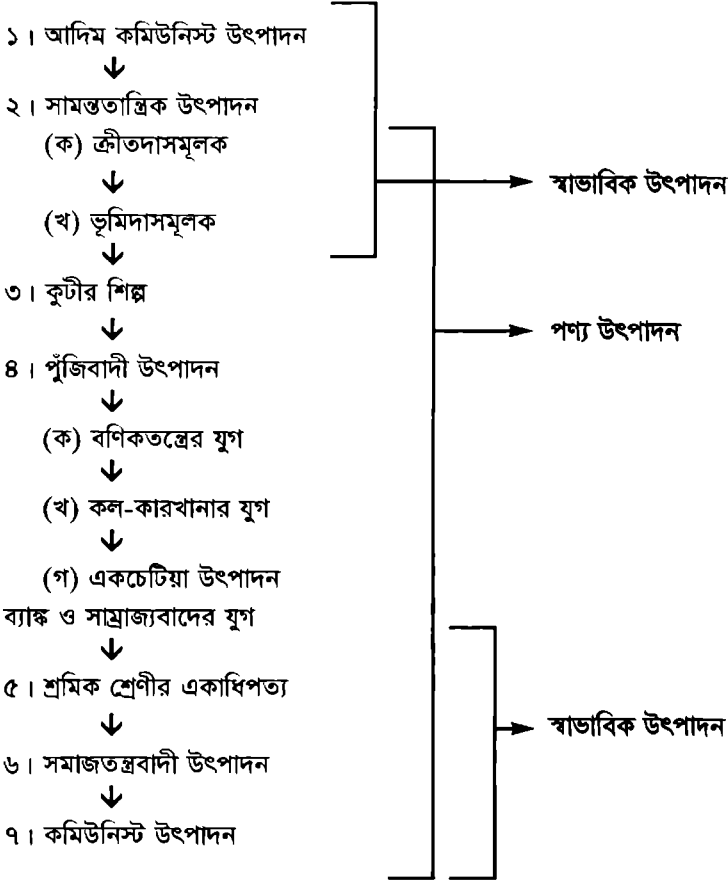
উৎপাদন প্রণালীর ইতিহাসে এই কয়টা স্তর দেখা যায়। সব দেশই যে সব স্তর পার হয়ে এসেছে- তা নয়। এক এক দেশ এক এক স্তরে রয়েছে। কোনো কোনো দেশ খুব এগিয়ে গেছে, আবার কোনো কোনো দেশ ততো এগিয়ে

যেতে পারে নি। পৃথিবীর আধাআধি দেশে এখন ক্যাপিটালিস্ট রীতিতে একচেটিয়া উৎপাদনের যুগ চলেছে। অন্যান্য দেশে- যেমন চীনে, কিউবায়, ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন রয়েছে। কমিউনিস্ট সমাজের স্তরে কোনো দেশই এখনও পৌছায়নি। তবে সমাজের গতি ঐ দিকে বলেই অর্থনীতির নির্দেশ।

উৎপাদন প্রণালীর প্রত্যেকটা স্তর নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা এই ছোট বইয়ে সম্ভব হবে না। এখানে খুব সংক্ষেপে প্রথম দিকের স্তরগুলোর আলোচনা করবো। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী ও উৎপাদন সম্বন্ধই আমাদের প্রধান বিষয় হবে। এই উৎপাদন প্রণালীর কী করে জন্ম হলো তাই আলোচনা করতে গিয়ে অতীতের উৎপাদন প্রণালীগুলোও একটু দেখতে হবে।

[তিন]

স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালী

আদিম কমিউনিস্ট উৎপাদন প্রণালী হলো একেবারে আদিম যুগের কথা। মানুষ তখন নেহাতই অসভ্য অর্থাৎ প্রায় পশু। দলে দলে তখন তারা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো- শিকার ও ফলমূলের সন্ধানে। রক্তের সম্বন্ধ ছিলো যাদের সঙ্গে, তাদের নিয়ে এক একটা দল বা ট্রাইব গঠিত হতো। আত্মরক্ষার জন্যও শিকার করে খাদ্য যোগাড়ের জন্য এদের বাধ্য হয়ে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হতো। গুহায়, গাছে এরা বাস করতো। একজনকে দলের নেতা ঠিক করে নিত। সে শিকারে বা ফলমূল যোগাতে কার কী কাজ হবে- তা ভাগ করে দিত। অর্থাৎ শ্রমবিভাগ এদের সমাজেও কিছু কিছু ছিলো। মেয়েরা হয়তো ফলমূল যোগাড় করে বেড়াত। আর পুরুষেরা যেত শিকারে। দিনের শেষে এরা যা পেত তাই সবাই মিলে খেত। দিনের খাবার এদের ছিলো খুব অনিশ্চিত। একদিন হয়ে শিকার প্রচুর পেত, একদিন হয়তো একেবারে ফাঁকা যেত। কিন্তু বাড়তি যেদিন হতো, সেদিনের খাবার থেকেও কিছু সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব ছিলো না। মাংস বা ফলমূল কিছু টিকতো না– পঁচে যেত। এদের সমাজের উৎপাদন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য তাহলে দেখতে পাচ্ছি- প্রথমত, সবাই মিলে উৎপাদন করতো। দ্বিতীয়ত, সবাই মিলে ভোগ করতো। তৃতীয়ত, ধনী গরিব ভেদাভেদ ছিলো না, তাই শ্রেণী বলে কিছু ছিলো না। চতুর্থত, কিছু সঞ্চয় করাও সম্ভব ছিলো না।

এই রকম সমাজ কিন্তু বেশি দিন টিকলো না। তাদের উৎপাদন ক্ষমতা, অর্থাৎ জিনিসপত্র তৈরির ক্ষমতা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে এরা আগুন আবিষ্কার করলো, পাথর কেটে ধারালো অস্ত্র তৈরি করা শিখলো, পশুপালন শিখলো, চাষবাস শিখলো। তখন আর জঙ্গলে আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হলো না। কতকগুলো ট্রাইব পশু পালনের দিকে ঝুঁকে পড়লো বেশি। তারা তাদের ছাগল-ভেড়া ইত্যাদি নিয়ে এ-মাঠ ও-মাঠ করে বেড়াতে লাগলো। আর কতকগুলো ট্রাইব কৃষিকাজ আরম্ভ করোলো। ধীরে ধীরে তারা লাঙ্গল আবিষ্কার এবং পশুশক্তির সাহায্য নিয়ে কাজ করে নিজেদের পরিশ্রম অনেকখানি হাল্কা করে নিলো। এমনি করে উৎপাদন ক্ষমতা যখন বেড়ে গেল, তখন তাদের বাড়তিও কিছু থাকতে লাগলো। চাষের ফসল ও পশু দুটোই বাড়তি হলে, নষ্ট হবার ভয় থাকে না। প্রথম প্রথম একটা ট্রাইব তাদের বাড়তি জিনিসপত্র অন্য একটা ট্রাইবের বাড়তি জিনিসপত্রের সঙ্গে বিনিময় করোতে লাগলো। কোনো ট্রাইব হয়তো চামড়া দিয়ে কিছু ধান নিয়ে নিলো। এমনি করে বিনিময়ের সূত্রপাত হলো। কিন্তু তখনও বিনিময় আকস্মিক ব্যাপারই ছিলো। নিয়মিত একটা কিছু ছিলো না। ধীরে ধীরে শ্রমবিভাগও বেড়ে যেতে লাগলো এবং লোকসংখ্যাও বাড়তে লাগলো। এর সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাস প্রথা এসে দেখা দিলো। আগে একটা ট্রাইবের সঙ্গে অন্য একটা ট্রাইবের ঝাগড়া হলে যুদ্ধ লেগে যেত এবং এর ফলে অনেক লোক মারা পড়তো। এইখানেই যুদ্ধের শেষ হতো। যারা যুদ্ধে বন্দী হতো, হয় তাদের মেরে ফেলা হতো, নয় তাদের নিজেদেরই একজন করে নেওয়া হতো। কিন্তু কৃষিকাজ ও পশুপালন আবিষ্কার হওয়ার পর, এই সব বন্দীদের দিয়ে জোর করে চাষবাস বা পশুপালনের কাজ করিয়ে নেবার সুবিধা হলো। এর ফলে যুদ্ধে যারা বন্দী হতো তাদের এক একটা ট্রাইবের দাস হয়ে থাকতে হতো। এমনিভাবে সমাজে দুটো শ্রেণী হয়ে গেল- **মনিব আর গোলাম**। এইসব শক্তির সংঘাতের ফলে আদিম কমিউনিস্ট সমাজ আর টিকলো না। ধীরে ধীরে জমিজমা ও অন্যান্য জিনিসপত্রে ব্যক্তিগত অধিকার এসে দেখা দিল। প্রথম প্রথম জমি প্রত্যেক বছর ভাগ করে দেওয়া হতো। কিন্তু শেষ অবধি জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার দাঁড়িয়ে গেল। এইভাবে বহু যুগ ধরে সমাজে শ্রেণী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি হলো। কিন্তু শ্রমবিভাগ বিশেষ ব্যাপক না থাকায় বিনিময় প্রথা খুব সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলো।

জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপিত হবার পর, দেখতে দেখতে কতকগুলো লোক খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলো। অধিকাংশ জমিজমা এদের হাতে গিয়ে পড়লো। এরা নিজেদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য ছোট ছোট সৈন্যদল তৈরি করলো। এরাই হলো ছোট ছোট রাজা। এই রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে আবার একেক জন বড় রাজা হলো। যুদ্ধে হারাবার পর প্রথম প্রথম সে পরাজিত রাজার সমস্ত সম্পত্তি নিজে দখল করে নিয়ে, রাজাকে ভিটেছাড়া করে দিত। কিন্তু যখন তার রাজ্য এতো বড় হয়ে পড়তে লাগলো যে, নিজের পক্ষে আর দেখাশুনা করা সম্ভব নয় তখন পরাজিত রাজার কাছ থেকে বছর বছর খাজনা বা কর আদায় করেই তাদের ছেড়ে দিতো। এমনিভাবে **সামন্ত যুগের** সৃষ্টি হলো।

গ্রীস এবং রোমে কিন্তু কেউ রাজা হতে পারলো না। সেখানে তিন শ্রেণীর লোক দেখা দিল। প্রথমে ছোট ছোট **স্বাধীন চাষী**। নিজেদের জমি তারা নিজেরাই চাষ করতো। তারপরে দেখা দিলো বড় বড় সম্পত্তিওয়ালা লোক, আর এদের অধীনে অনেক **ক্রীতদাস**। ক্রীতদাসদের দিয়ে এই সম্পত্তিয়ালা লোকেরা চাষবাস করাতো। এদের ক্ষেত খামারগুলোকে বলতো **ল্যাটিফানিগুয়া**। এই ল্যাটিফাণ্ডিয়ার মালিকেরা ক্রীতদাসদের পরিশ্রমের পর পরগাছার মতো বেঁচে থাকতো এবং প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে নানা প্রকার বিলাসিতায় জীবন যাপন করতো। এদের বিলাসিতার জিনিসপত্র যোগাড় করার জন্য বণিক শ্রেণীর উৎপত্তি হলো। বণিকরা দেশ-বিদেশ থেকে নানারকম বিলাসিতার সামগ্রী এনে এদের কাছে বিক্রি করতো। এমনকি প্রাচীন গ্রীসে এই সব জিনিসপত্র তৈরির জন্য বড় বড় কারখানাও সৃষ্টি হয়েছিলো। সেগুলোকে বলতো **এরগাস্টেরীয়া**। এখানে বহু সংখ্যক ক্রীতদাস কাজ করতো। রোম, গ্রীস, মিশর ব্যাবিলন, পারস্য প্রভৃতি দেশের সে এক গৌরবময় যুগ গেছে। ক্রীতদাসদের পরিশ্রমের উপর বেঁচে বড় লোকেরা প্রচুর অবসর পেত। তার ফলে নানা প্রকার সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চায় এরা যথেষ্ট উন্নত হয়েছিলো।

কিন্তু এদের এ সমাজও বেশিদিন টিকলো না। এদের শাসকশ্রেণী বিলাসিতায় ডুবে অধঃপতিত হলো। যুদ্ধবিগ্রহ করার জন্য চাষীদের সাহায্য নিতে এরা সব সময়েই বাধ্য হতো। কারণ ক্রীতদাসদের দ্বারা যুদ্ধ করানো সম্ভব নয়। এই স্বাধীন চাষীরা ল্যাটিফাণ্ডিয়ার মালিকদের প্রতিযোগিতায় আর উৎপীড়নে খুব কষ্ট পাচ্ছিলো। চাষীরা এদের কাছ থেকে ধার নিলে শতকরা ৪০ থেকে ৭০

মুদ্রা অবধি সুদ দিতে হতো। আর যুদ্ধের ব্যয়ভার চাষীদের ঘাড়েই বেশি চাপতো, অথচ যুদ্ধে যে সব জিনিসপত্র বা দাস পাওয়া যেতো তার ভাগ তাদের বিশেষ জুটতো না। কারণ যুদ্ধ পরিচালনার ভার ধনীদের হাতেই ছিলো। তারপর এই সব ধনিকদের নিজেদের মধ্যে দলাদলির অন্ত ছিলো না। ক্রীতদাসেরাও যে অত্যাচার নিপীড়ন নিঃশব্দে সব সময় সহ্য করতো তা নয়। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড দাসবিদ্রোহে ওদের সমাজ ভেঙ্গে-চুরে পড়বার অবস্থা হতো। কিন্তু দাসদের ভেতর তেমন সংগঠন না থাকায়, একবারও তারা সফল হতে পারে নি। এই সব কারণে এদের সমাজ খুব দুর্বল হয়ে পড়লো এবং বিদেশি শত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেল।

ক্রীতদাস প্রথায় বিনিময়ের প্রচলন অনেকটা বেড়ে গিয়েছিলো। এবং তার ফলে বিনিময়ের সুবিধার জন্য মুদ্রা বা টাকার উৎপত্তি হয়। তাহলেও বিনিময়কার্য তখন সীমাবদ্ধ ছিলো। শুধুমাত্র ধনীদের বিলাসিতার জিনিসপত্র এবং ক্রীতদাসই বেশিরভাগ কেনাবেচা হতো। উৎপন্ন জিনিসপত্রের অধিকাংশই স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালীতে তখনো উৎপাদিত হতো।

সামন্ত যুগের এই অধ্যায় শেষ হয়ে যাবার পর, ধীরে ধীরে ভূমিদাস প্রথার প্রচলন হলো। ভূমিদাসের নিজেদের জমিতে অধিকার ছিলো না। জমিদার যখন ইচ্ছা তাকে জমি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতো। তাকে জমিদারের জমিতে সপ্তাহে তিন চার দিন বিনা বেতনে খেটে যেতে হতো। তার উপরে আবার নানারকমভাবে জমিদারকে আবহাওয়াব দিতে হতো। স্বাধীন চাষীদেরও এইসব অত্যাচার থেকে অব্যাহতি ছিলো না। যদি কোনো কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যেতো, তবে চাষী বাধ্য হয়ে জমিদারের কাছে থেকে ধার করতো এবং একবার ধার করলে তার আর রক্ষা ছিলো না। ধীরে ধীরে জমিদার তাকে ভূমিদাসে পরিণত করে ফেলতো। প্রথম প্রথম জমিদারের কাজ ছিলো চাষীকে বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা ও চাষের যাতে উন্নতি হয়- তা দেখা। যেমন খাল বা পুকুর কেটে জমিদাররা জলসেচের ব্যবস্থা করবে ইত্যাদি। কিন্তু রাজার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশরক্ষার ভার রাজার হাতে গিয়ে পড়লো। জমিদার শুধু তাকে খাজনা দিয়েই খালাস পেত। জমিদারের আয় যখন প্রচুর হয়ে গেলো তার চাষের উন্নতির দিকে তার লক্ষ্য থাকলো না। অধীনস্থ নায়েব-গোমস্তাদের উপর সমস্ত কাজের ভার দিয়ে জমিদার নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে জীবন কাটাতে লাগলো। এর ফলে জমিদারদের অত্যাচারের উপর আবার তার কর্মচারীদের অত্যাচার এসে চাষীদের ও ভূমিদাসদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললো। এই সব কারণে বহুবার সমাজে চাষী

বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু চাষীদের ভেতর সংগঠন ও একতার অভাবে এইসব বিদ্রোহ সফল হয় নি। তাছাড়া সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করে দিয়ে কী রকম নতুন সমাজ গড়ে তুলবে, সে সম্বন্ধে তাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো না।

কুটির শিল্প

এই সময় প্রত্যেক গ্রামের কয়েকজন লোক থাকতো তাদের প্রধান পেশা ছিলো চাষীদের যেসব জিনিসপত্র দরকার, সেগুলি তৈরি করা। যেমন, তাঁতী কাপড় তৈরি করতো, মিস্ত্রী লাঙ্গল, ঘর-দোর তৈরি করতো। এর বদলে চাষী তাদের খাওয়া-পরার ভার বহন করতো। এরূপ তাঁতী, মিস্ত্রী প্রভৃতিদের বলা হয় কুটির শিল্পী। কারণ নিজেদের কুটিরে বসে এরা এদের জিনিসপত্র তৈরি করতো। যে সব জায়গায় রাজা বা বড় বড় জমিদার বাস করতো, সে সব জায়গায় ধীরে ধীরে এক একটা শহর গড়ে উঠলো। রাজার সৈন্যসামন্ত, কর্মচারী ইত্যাদি সব সেখানে থাকতো। এর ফলে সেখানকার কুটির শিল্পীদের বেশ কিছু আয় হতো। শহরের কুটির শিল্পীরা যে শুধু সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করতো তা নয়, রাজা-রাজড়াদের বিলাসিতার জিনিসপত্রও অনেক তৈরি করতো। এমনিভাবে শহরে কুটির শিল্প বেশ উন্নতি লাভ করলো। শহরের কুটির শিল্পীরা নিজেদের ভেতর প্রতিযোগিতা দূর করে বেশি লাভ করার জন্য আবার নিজেদের খুব শক্তিশালী সমিতি বা গিল্ড তৈরি করে নিলো। প্রত্যেক কুটিরশিল্পীকে এই গিল্ডের সভ্য হতে হতো। যাতে উৎপাদন খুব বেশি না হয়ে যায়, তার জন্য নিয়ম ছিলো প্রত্যেক কুটিরশিল্পী দু-তিন জনের বেশি শিক্ষানবীস দোকানে রাখতে পারবে না। কাঁচামাল কেনা, শিক্ষানবীসের বেতন, তৈরি জিনিসের দাম ইত্যাদি সবকিছু সমিতি ঠিক করে দিতো। কুটিরশিল্পীর সংখ্যা যাতে খুব বেশি হয়ে না যায়, তার জন্য এরা শিক্ষকবীসদের কিছুতেই কুটিরশিল্পী হবার অধিকার দিতো না, তাদের শিক্ষার সময় বাড়িয়ে দিতো, কুটিরশিল্পী হবার জন্য কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো এবং বেশ একটা মোটা টাকা সমিতিকে দিতে হতো। প্রথম প্রথম যে কেউ এই সব শর্ত পালন করতে পারলে, কুটিরশিল্পী হবার অধিকার পেত। কিন্তু পরে ক্ষমতাশালী কুটিরশিল্পীদের আত্মীয়স্বজন ছাড়া এই অধিকার সহজে কাউকে দেওয়া হতো না। এর ফলে শিক্ষানবীসদের ভেতর তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল এবং তারা নানারকমভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে গিল্ডগুলোর বিরোধিতা করতে লাগলো। বিনিময় প্রথা শহরে তখন দস্তুর মতো চালু হয়ে গেছে।

শ্রমবিভাগ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। শুধু যে এক এক দল লোক একটা জিনিস তৈরি করতে লাগলো তা নয়, প্রত্যেক দলের ভেতর অনেকগুলো ভাগ করে এক একটা ছোটদল ঐ জিনিসটার এক একটা অংশ তৈরি করতে লাগলো। যেমন কাপড় তৈরির ব্যাপারে কেউ সুতা কাটে, কেউ রঙ করে, কেউ বা তাঁত বোনে ইত্যাদি। এর ফলে সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা খুব বেড়ে গেল। এরপর থেকে শুরু হলো সমাজের এক নতুন অধ্যায়। স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালী নষ্ট হয়ে গিয়ে, তার জায়গায় পণ্য উৎপাদন প্রণালী স্থাপিত হলো। কী করে তা হলো, তা পরের অধ্যায়ে আমরা দেখবো।

[চার]

পণ্য উৎপাদন প্রণালী

শ্রমবিভাগ বেড়ে যাওয়ায় কুটিরশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গেল। শহরের চাহিদা মিটিয়েও অনেক জিনিস বাড়তি থেকে যেতে লাগলো। বণিকরা তখন এই জিনিসগুলো কিনে নিয়ে দেশ-বিদেশে চালান দিতে থাকলো। তাদের লাভ হতো প্রচুর এবং যতো বেশি লাভ হতো, ততোই অতি উৎসাহে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে থাকলো। বণিকরা তখন কুটিরশিল্পীদের আগে থাকতেই টাকা-পয়সা দাদন দিয়ে তাদের কাজে সাহায্য করতো লাগলো। এর ফলে কুটিরশিল্পীদের অনেকেই ব্যবসায়ীদের হাতের মুঠোর ভেতর এসে পড়তে লাগলো। ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীরা কুটিরশিল্পীদের একেবারে সম্পূর্ণরূপে অধীন করে ফেললো। প্রথম প্রথম বণিক শুধু তাদের কাঁচামাল দিতো এবং তৈরি জিনিস কিনে নিতো। কুটিরশিল্পী ঐ বণিক ছাড়া আর কারো কাছে মাল বিক্রি করতে পারতো না। শেষে কুটিরশিল্পীকে তার কুটির ছেড়ে বণিকের বাড়ি এসেই কাজ করতে হতো। বণিক যাবতীয় উৎপাদন যন্ত্র (অর্থাৎ পণ্য তৈরির জন্য সমস্ত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ইত্যাদি) সেখানে তাকে দিতো। এই রকম করে কারখানার সূত্রপাত হলো। তার মানে, কুটিরশিল্পী মজুরে পরিণত হলো ও বেতনের বিনিময়ে তারা কারখানায় খাটতে লাগলো। কুটিরশিল্পীদের সমিতি ও গিল্ডগুলো ভেঙ্গে গেল। শিক্ষানবীসরা কুটিরশিল্পীর দোকান ছেড়ে কারখানায় কাজ নিলো। কুটিরশিল্পীদের ভেতর যাদের অবস্থা ভালো ছিলো, তারা নিজেরাই গিল্ডের আইন ভেঙে বেশি সংখ্যায় মজুর তাদের দোকানে খাটাতে লাগলো। অর্থাৎ তাদের কুটিরটিকে কারখানায় পরিণত করলো। কুটিরশিল্পীদের ভেতর যারা গরিব, তারা এইসব বড় বড়

কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বণিকের দুয়ারে কাজের জন্য হাজির হলো।

বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এদিকে রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হলো। যানবাহনের উন্নতি হলো। দেখতে দেখতে বিনিময় প্রথা গ্রামেও ছড়িয়ে পড়লো। জমিদারেরা আগে চাষী ও ভূমিদাসদের কাছ থেকে শস্য আদায় করতো। আর শস্যের বাজারও সীমাবদ্ধ ছিলো বলে জমিদারদের আদায়েরও সীমাবদ্ধ ছিলো। এখন অন্যান্য পণ্যের বাজার বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শস্যের বাজার বেড়ে গেল। তার ফলে জমিদারদের আদায়েরও আর সীমা থাকলো না। চাষীদের ও ভূমিদাসদের উপর শোষণ হাজার গুণ বেড়ে গেল। অনেক চাষী ও ভূমিদাস গ্রামে আর টিকতে না পেরে, পালিয়ে শহরে চলে যেতে লাগলো কাজের খোঁজে। জমিদাররা এই পালিয়ে যাওয়া তখন আইন করে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করলো। আবার কোনো কোনো দেশে জমিদার নিজেই চাষীদের জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের জমিতে ভেড়া চরাতে লাগলো। কারণ সেখানে তখন পশম তৈরি খুব লাভজনক ছিলো। এমনি করে চাষীরা জমি থেকে বিতাড়িত হয়ে ও দরিদ্র হয়ে পড়ায় গ্রামের কুটিরশিল্পীদের ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেল। কারণ এতোদিন গ্রামের চাষী ও ভূমিদাসরাই তাদের জিনিসপত্র কিনতো। এখন গ্রামের কুটিরশিল্পীরাও শহরে কাজের খোঁজে চলে গেল।

দেখতে দেখতে শহরের পর শহর ফেঁপে উঠলো। শহরের লোকসংখ্যা খুব বেড়ে গেল। সেখানে বড় বড় কারখানা তৈরি হলো। কারখানায় শ্রমবিভাগ আরও সুক্ষ্ম হলো। কলকজা আবিষ্কার হলো। তখন দশজন শ্রমিকের কাজ একজন শ্রমিক করতে লাগলো। আর এই সব জিনিস বিক্রির জন্য নতুন নতুন বাজার খুঁজে নিতে হলো। এভাবেই ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার হলো, আমেরিকা আবিষ্কার হলো। এসব দেশ হলো মাল বিক্রির মস্ত জায়গা, তাই এদের বলা হয় বাজার। এই সব বড় বড় বাজার পেয়ে বণিকরা জেঁকে বসলো।

কিন্তু জমিদাররা তখন রাজ্যের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আইন তৈরির অধিকার তাদেরই হাতে। কাজেই বাণিজ্যে বণিকদের অসুবিধা হতে লাগলো খুব। এক জমিদারী থেকে আর এক জমিদারীতে মালপত্র নিয়ে গেলে তাদের শুল্ক দিতে হতো। সময় সময় জমিদার তাদের মাল বাজেয়াপ্ত করে নিতো অতি সামান্য অজুহাতে। বণিকরা তখন রাজাকে টাকা-পয়সা দিয়ে প্রচুর সাহায্য করতে লাগলো, জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের শাসনে আনবার জন্য। বণিকদের সাহায্য নিয়ে রাজা এই সব জমিদারদের পরাস্ত করে দিলো। এক

একটা দেশে শক্তিশালী গভর্নমেন্ট স্থাপিত হলো। ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের দিক থেকে সমস্ত দেশ এক হয়ে গেল। দেশের ভেতর আর ভাগ কিছুই থাকলো না। জমিদাররা বহু পূর্বেই তাদের বিলাসিতার খরচ যোগাতে না পেরে বণিকদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো এবং ঋণ নেবার সময়ে শহরের ব্যাপারে অনেক ক্ষমতা বণিকদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলো। এবার শহরগুলো সম্পূর্ণরূপে বণিকদের হাতে চলে গেল। ধীরে ধীরে এরা এতো শক্তিশালী হয়ে উঠলো যে, ফরাসী বিপ্লবের পর সমস্ত দেশটাই বণিকদের হাতে এসে পড়লো। এরা নিজেদের ইচ্ছামতো আইন-কানুন তৈরি করে নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর লাভবান হতে লাগলো। এরপর থেকে পুঁজিবাদী বণিকতন্ত্রের যুগ শেষ হলো। কল-কারখানার যুগ আরম্ভ হলো। সমাজের অধিকাংশ জিনিসপত্র বিনিময়ের জন্য তৈরি হতে লাগলো। স্বাভাবিক উৎপাদন প্রণালী ধ্বংস হয়ে গিয়ে পণ্য উৎপাদন প্রণালী প্রচলিত হলো, গোটা সমাজটা কেনাবেচা করে জীবনধারণ করতে লাগলো।

[পাঁচ]

পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী

পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এখানে জিনিসপত্র এক একটা বড় বড় কারখানায় কলকব্জার সাহায্যে হাজারে হাজারে তৈরি হয় এবং কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক এসে মজুরির বিনিময়ে খাটে। কারখানায় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল কল মালিকদেরই থাকে এবং কল মালিক উৎপন্ন জিনিসপত্র বাজারে বিক্রি করে। বিনা স্বার্থে যে কল মালিক কারখানা চালু রাখে তা নয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে লাভ করা। লাভের জন্যই সে ব্যবসা করে।

এইসব কলকব্জা, যন্ত্রপাতি কিনে কারখানা চালু করতে গেলে অনেক টাকার দরকার হয়। এই টাকাকে বলে **পুঁজি বা মূলধন**। একবার উৎপাদন আরম্ভ করতে পারলে যে লাভ হয়, তা থেকে পুঁজি বাড়িয়ে বাড়িয়ে কারখানা আরও বড় করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রথম কারখানা আরম্ভ করার জন্য কল মালিকরা টাকা কোথায় পেল? এর উত্তর দিতে গিয়ে অনেক বলেন, আয় থেকে লোকে বাঁচিয়ে জমা করে করে পুঁজি সঞ্চয় করেছিলো। কিন্তু সামন্তযুগে এক জমিদার ছাড়া আর সকলেরই আয় ছিলো খুব সামান্য। সুতরাং অধিকাংশের পক্ষে কিছু

বাঁচানো সম্ভবই ছিলো না। কী করে প্রথম পুঁজি সঞ্চিত হয়েছিলো– তার খানিকটা আভাস আমরা আগের অধ্যায়ে পেয়েছি। এ পুঁজির অধিকাংশই লুণ্ঠন, ডাকাতি ও নিষ্ঠুর শোষণের ফল। বণিকরা কী করে কুটিরশিল্পীদের শোষণ করতো, তা আমরা দেখেছি। চাষীদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বণিকরা তাদেরও ঠকাতে ছাড়তো না। কিন্তু তারা সবচেয়ে বেশি ধন সঞ্চয় করেছিলো এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্যবসা করে, **নিগ্রো দাস ব্যবসায়ে** ও আমেরিকার ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে। এই সময় বড় বড় কোম্পানি গড়ে এরা এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসে। **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও** এদের ভেতর একটি। এরা এশিয়া ও আফ্রিকায় এসে যে ব্যবসা করতো, তাকে লুট ও ডাকাতি বলাই ঠিক হবে। এদের কর্মচারী পর্যন্ত এতো বেশি ধনী হয়ে দেশে ফিরতো যে ওদের দেশের লোকও ওদের 'নবাব বলে বিদ্রুপ করতো। আফ্রিকার নিগ্রোদের যেভাবে জঙ্গলে গিয়ে শিকার করে বন্দী করে ক্রীতদাস করে দেশ-বিদেশে (বিশেষ করে আমেরিকায়) চালান দিতো, তার ইতিহাস যেমনই ঘৃণ্য তেমনই নিষ্ঠুর। এই দাস ব্যবসায়ে বহু লোক মস্ত ধনী হয়ে গেছে এবং দেশে তারা সম্মানও পেত বিস্তর, এখন যেমন কল মালিকরা পায়। আমেরিকার সোনার গন্ধ পেয়ে এরা দলে দলে আমেরিকা ছুটেছিলো জোঁকের মতো তাদের ব্যবসার প্রথম পুঁজি যোগাড় করতে। চার্লি চ্যাপলিনের 'গোল্ডরাস্' ফিল্মে এই বিষয়টা কৌতুকের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। সেখানে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের প্রায় ধ্বংস করে দিয়ে এরা পুঁজি যোগাড় করেছিলো।

কার্ল মার্কস তাঁর বিখ্যাত বই 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে এক জায়গায় লিখেছেন-

'এইরূপে আমেরিকার সোনা রূপার খনি আবিষ্কার, ঐ সব দেশের লোকেদের ঐ জায়গা থেকে একেবারে মুছে ফেলা বা ক্রীতদাসে পরিণত করা বা খনির ভেতর তাদের কবর দেওয়া, ইস্ট ইন্ডিজ দখল ও লুণ্ঠন এবং আফ্রিকাকে নিগ্রো ক্রীতদাস শিকারের ক্ষেত্রে পরিণত করা- এইগুলো হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর আরম্ভ। এই সব শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রথমে পুঁজি সংগ্রহ করা হয়।'

এমনিভাবে অসংখ্য মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিয়ে বণিকরা তাঁদের পুঁজি সংগ্রহ করেছিলো। কিন্তু পুঁজি থাকলেই পুঁজিবাদী উৎপাদন চালু করা যায় না। তার জন্য হাজার হাজার মজুরেরও দরকার হয়। মজুর না হলে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী অচল। এই মজুরের যোগাড় হলো কী করে? মজুররা স্বেচ্ছায় আনন্দের সঙ্গে কারখানায় যে কাজ করতে এসেছে- তা নয়। কারখানায় এসে তারা বিশেষ সুখে ছিলো না। ১৭/১৮ ঘন্টা অবধি তাদের কাজ করাতে হতো। আর মাইনে যা পেত, তাতে কোনো মতে বেঁচে থাকা চলতো। ছোট ছোট

ছেলেরা কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে কলের পাশেই ঘুমিয়ে পড়তো, তখন সর্দার এসে চাবুক মেরে তাদের ঘুম থেকে তুলতো অথবা ঘুম ভাঙ্গার জন্য শীতের রাতে ঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে আনতো। এরকম অবস্থার ভেতর কাজ করতে তারা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় আসে নি। অবস্থায় পড়ে বাধ্য হয়ে এসেছিলো।

চাষী ও ভূমিদাসদের জমিদার অত্যাচার করে ভিটে-ছাড়া করে তাড়িয়ে দিলো। তারা বেঁচে থাকার আর অন্য উপায় না দেখে শহরে এসে কারখানায় কাজ নিতে বাধ্য হলো। চাষীরা নিঃস্ব হয়ে পড়ায় গ্রামের কুটিরশিল্পীরাও ব্যবসা হারিয়ে শহরে আসতে বাধ্য হয়। শহরের কুটিরশিল্পীরাও প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে কলমালিকের দ্বারস্থ হতে লাগলো। এমনি করে চাষী, ভূমিদাস, কুটিরশিল্পী ও শিক্ষানবীসরা বাঁচবার দ্বিতীয় উপায় না দেখে, কারখানায় এসে কাজ করতে বাধ্য হলো। কল মালিকদেরও সুবিধে হলো খুব। এদের কম মাইনে দিয়ে খাটিয়ে তারা বিস্তর লাভ করতে লাগলো। এমনি করে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী শুরু হলো পুঁজি ও মজুর যোগাড় করে এবং যতোই এই প্রণালীতে উৎপাদন চালু হতে লাগলো, পুঁজিও ততোই বেড়ে যেতে লাগলো। পুঁজি বাড়ার সাথে সাথে আরো জোরে এ প্রণালী চলতে থাকলো।

[ছয়]

মূল্য

আমরা আগে দেখেছি যে, পণ্যের দুটো গুণ আছে। এক, পণ্য আমাদের কাজে লাগে অর্থাৎ আমাদের কোনো না কোনো অভাব মেটায়। আর দুই, পণ্য বাজারে কেনাবেচনা হয়। অভাব না মেটালে সে পণ্য বাজারে কেনাবেচা হতে পারে না। যে জিনিস কোনো কাজে লাগে না, তা কেউ কেনে না। কাজেই কেনাবেচার জিনিস হতে হলে পণ্যের অভাব মেটানোর ক্ষমতা থাকা চাই-ই। পণ্যের এই অভাব পূরণ করার ক্ষমতাকে বলে **ব্যবহারিক মূল্য**। যে জিনিসের যতো বেশি অভাব পূরণের ক্ষমতা, তার ব্যবহারিক মূল্যও ততো বেশি। কিন্তু ব্যবহারিক মূল্য থাকলেই জিনিসপত্র কেনাবেচা হয় না। যেমন বাতাসের ব্যবহারিক মূল্য খুব বেশি। বাতাস না হলে আমরা দু'এক মিনিটের বেশি বাঁচতে পারি না। কিন্তু বাতাস কি বাজারে কেনাবেচা হয়? কাজেই ব্যবহারিক মূল্য থাকলেই জিনিসপত্র পণ্য হয় না। পণ্য হতে গেলে অর্থাৎ বাজারে কেনাবেচার উপযুক্ত হতে গেলে, জিনিসপত্র মানুষের পরিশ্রমের ফল হওয়া

দরকার। যে জিনিস পেতে গেলে কোনো পরিশ্রম দরকার হয় না, ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায়, সে জিনিস কেউ পয়সা খরচ করে কেনে না– অর্থাৎ সে জিনিস পণ্য হতে পারে না। পণ্যের এই ক্রয় ও বিক্রয়ের অর্থাৎ বিনিময়ের ক্ষমতা বা গুণকে বলা হয় **বিনিময় মূল্য**। কোনো কোনো পণ্যের অন্যান্য জিনিসপত্র কেনার ক্ষমতা খুব কম। তাদের বিনিময় মূল্য কম। আবার কোনো কোনো পণ্যের এই ক্ষমতা খুব বেশি, তাদের বিনিময় মূল্যও খুব বেশি। বিনিময় মূল্য পেতে গেলে পণ্যের শুধুমাত্র ব্যবহারিক মূল্য থাকলে চলবে না, মানুষের পরিশ্রমের ফল হওয়া চাই। যে পণ্য তৈরি করতে যতো বেশি পরিশ্রম লাগে, তার বিনিময় মূল্য ততো বেশি হয়। মনে করো, বাজারে এক জোড়া কাপড়ের বদলে এক বস্তা ধান বিনিময় হচ্ছে। সুতরাং আমরা লিখতে পারি–

১ জোড়া কাপড় = ১ বস্তা ধান

কাপড় আর ধান কোনো দিক দিয়ে সমান হলো? তাদের ব্যবহারিক মূল্য নিশ্চয়ই সমান নয়। কাপড় যে অভাব পূরণ করে, ধান সে অভাব পূরণ করে না। আবার ধান যে কাজে লাগে, কাপড় সে কাজে লাগে না। ধান থেকে চাল করে খাওয়া যায়, তাতে ক্ষুধা মেটে। কিন্তু কাপড় খেয়ে ক্ষুধা মেটানো কষ্ট। কাজেই ব্যবহারিক মূল্যের দিক দিয়ে এদের তুলনা চলে না। এরা কোনো দিক দিয়ে তা হলে সমান? এরা বিনিময় মূল্যের দিক দিয়ে সমান। এক জোড়া কাপড়ের যে বিনিময় মূল্য এক বস্তা ধানেরও সেই বিনিময় মূল্য। এদের বিনিময় মূল্য সমান হলো কী করে? এক জোড়া কাপড় তৈরি করতে যে পরিশ্রম লেগেছিলো, এক বস্তা ধান তৈরি করতেও সেই পরিশ্রম লেগেছে বলে। ঐ পরিশ্রম দিয়েই যদি ২ বস্তা ধান তৈরি করা যেতো, তবে ১ জোড়া কাপড় ২ বস্তা ধানের সমান হতো। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, যে জিনিসের ভেতর যতো বেশি পরিশ্রম থাকবে তার বিনিময় মূল্য ততো বেশি হবে।

কিন্তু চাষীর ধান তৈরির পরিশ্রমের সঙ্গে তাঁতীর কাপড় তৈরির পরিশ্রমের তুলনা হতে পারে না। চাষীর পরিশ্রম এক রকমের আর তাঁতীর পরিশ্রম অন্য রকমের। সুতরাং কী করে এদের সমান বলি, বা একটা অপরটার দ্বিগুণ বলি? পণ্যের যেমন দুটো বিভিন্ন গুণ আছে, তেমনিই পরিশ্রমেরও দুটো বিভিন্ন রূপ আছে। একটা হচ্ছে **বাস্তব বা মূর্ত রূপ (concrete labour)** আর একটা হচ্ছে **সাধারণ বা বিমূর্ত রূপ (abstract labour)**। যে কোনো রকম পরিশ্রমই করা হোক না তাতে খানিকটা শারীরিক ও মানসিক শক্তি ব্যয়িত হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

চালিত হয় এবং কিছুটা পরিমাণে শরীরের ক্ষয় হয়। পরিশ্রমকে যখন যে কাজের ভিতর দিয়ে পরিশ্রম করা হচ্ছে তার থেকে আলাদা করে কোনো ধরনের পরিশ্রম করা হচ্ছে তা না দেখে শুধু পরিশ্রম হিসেবেই দেখি, শুধু শারীরিক ও মানসিক শক্তি ব্যয় হিসেবেই দেখি, তখন পরিশ্রমকে বলবো **সাধারণ বা বিমূর্ত শ্রম**। এ ক্ষেত্রে চাষীর শ্রমকে চাষের কাজে নিযুক্ত পরিশ্রম বলে ধরবো না। তাঁতীর শ্রমকে তাতে কাজে নিযুক্ত শ্রম বলে ধরবো না। শুধু তাদের কাজের জন্য যে পরিশ্রম ব্যয়িত হয়, সেই পরিশ্রম নেবো। **বাস্তব শ্রমের** বেলায় কিন্তু এই সাধারণ শ্রম কীভাবে ব্যয়িত হচ্ছে– তা দেখবো। তাঁতের কাজ করলে বলবো, তাঁতীর শ্রম আর চাষের কাজ করলে বলবো চাষীর শ্রম। সাধারণ বিমূর্ত শ্রমের দিক দিয়ে পরিশ্রমের ভেতর কোনো পার্থক্য নেই, শুধু কম বেশির মাত্রা আছে। তাঁতীর শ্রম, চাষীর শ্রম আর অন্যান্য সব শ্রম একই শ্রেণীভুক্ত। এই সকল কাজে যে শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে শুধু সেটাই নিচ্ছি। কিন্তু বাস্তব বা মূর্ত শ্রমের বেলা তাঁতীর শ্রম থেকে চাষীর শ্রম নিশ্চয়ই আলাদা। সেইজন্য যখন বলি, এক জোড়া কাপড় তৈরির পরিশ্রমের সঙ্গে এক বস্তা ধান তৈরির পরিশ্রম সমান, তখন আমরা পরিশ্রমের বাস্তব বা মূর্ত রূপ তুলনা করি না, সাধারণ বা বিমূর্ত রূপ তুলনা করি।

পণ্যে যেমন ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময় মূল্য এক সঙ্গেই থাকে, তেমনি পরিশ্রমের এই দুটো রূপও একসঙ্গেই থাকে। সাধারণ শ্রম ব্যয়িত হতে পারে না বাস্তব শ্রমের রূপ না নিয়ে।

পণ্যের বিনিময় মূল্য কিন্তু এই সাধারণ শ্রমের উপর নির্ভর করে এবং এই দিক দিয়ে বিচার করোলেই পণ্যের মধ্যে আমরা তুলনা আনতে পারি।

কিন্তু পরিশ্রম হলেই মূল্য সৃষ্টি হয় না। মূল্য সৃষ্টি করতে হলে এই পরিশ্রম সমাজের পক্ষে আবশ্যকীয় হওয়া চাই। অর্থাৎ যে পণ্য তৈরি হবে তা সমাজের কারো কোনো না কোনো কাজে লাগা চাই, কারো কোনো না কোনো অভাব পূরণ করা চাই। কারো কোনো অভাব পূরণ যদি সে পরিশ্রমের দ্বারা না হয় তবে সে শ্রম পণ্ড হবে। তাতে কোনো বিনিময় মূল্য সৃষ্টি হবে না। কারণ সে পরিশ্রমের দ্বারা তৈরি জিনিস কেউ কিনবে না। মনে করো, তুমি খুব পরিশ্রম করে একটা ছবি আঁকলে। কিন্তু সে ছবি এমন হলো যে ব্যান্ডেজে টিনচার আইডিন ঢেলে দিলে তার চেয়ে ভালো ছবি হয়। তাহলে তোমার পরিশ্রম যতো কঠোর পরিশ্রমই হোক না কেন, সমাজের পক্ষে তা অনাবশ্যক হবে। এরকম অনাবশ্যক শ্রমমূল্য সৃষ্টি (বিনিময় মূল্যকেই সংক্ষেপে মূল্য বলবো) করবে না। তাহলে দেখতে পাচ্ছি, সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় সাধারণ শ্রম দিয়ে মূল্য সৃষ্টি হয়।

কিন্তু সমস্যা এখানেই দূর হলো না। মনে করো, একজন তাঁতী খুব বেশি নিপুণ আর পরিশ্রমী, আর একজন ভালো কাজ জানে না। কার পরিশ্রম দিয়ে কাপড়ের মূল্য ঠিক করা হবে? নিপুণ যে সে অল্প পরিশ্রমে অনেক বেশি জোড়া কাপড় তৈরি করবে। এর ফলে প্রত্যেক জোড়া কাপড় তার কম পরিশ্রম থাকবে এবং মূল্যও কম হবে। আর অজ্ঞ তাঁতী যে, সে হয়তো একজোড়া তৈরি করতে এক মাসই লাগিয়ে দেবে। সুতরাং তার কাপড়ে এক মাসের পরিশ্রম থাকবে এবং মূল্যও খুব বেশি হবে। কিন্তু একই রকম কাপড়ের দু'রকম মূল্য হতে পারে না। মূল্য তাহলে কী করে ঠিক হবে? মূল্য কোনো ব্যক্তি-বিশেষের পরিশ্রম দিয়ে ঠিক হবে না। ঠিক হবে গড়ে প্রত্যেক জোড়া কাপড়ে কতো পরিশ্রম দরকার হয় তাই দিয়ে। গড়ে যদি ২৪ ঘণ্টার পরিশ্রম লাগে, তবে তাই দিয়েই কাপড়ের মূল্য ঠিক হবে। মনে করো, সমাজে ৩ খানা কাপড় তৈরি হয়েছে। প্রথমটায় ১ ঘণ্টার পরিশ্রম লেগেছে, দ্বিতীয়টায় ২ ঘণ্টার ও তৃতীয়টায় লেগেছে ৩ ঘণ্টার পরিশ্রম। তাহলে ৩ খানা কাপড়ে মোট ৬ ঘণ্টার পরিশ্রম লেগেছে। সুতরাং গড়ে প্রত্যেকটা কাপড়ে ২ ঘণ্টার পরিশ্রম লেগেছে। অতএব প্রতিটি কাপড়ের মূল্য হবে ২ ঘণ্টার পরিশ্রমের সমান। যে তাঁতী ১ ঘণ্টায় কাপড় তৈরি করেছে সে-ও ২ ঘণ্টার মূল্য পাবে। আর যার ৩ ঘণ্টা লেগেছে, সে-ও ২ ঘণ্টার মূল্য পাবে। এই রকমভাবে গড়পড়তা পরিশ্রমের সময় দিয়ে মূল্য নির্ধারিত হবে।

কেউ কেউ আবার অল্প সময় খাটলেও, খুব বেশি পরিশ্রম করতে পারে। আবার কেউ কেউ অনেকক্ষণ খাটলেও এমন হালকাভাবে খাটে যে, তাতে বিশেষ পরিশ্রম হয় না। একে বলে **পরিশ্রমের ঘনত্ব (intensity of labour)**। অল্প সময় হলেও পরিশ্রম যদি খুব কঠোর হয়, তবে তার ঘনত্ব বেশি। আর যদি পরিশ্রম খুব কম হয়, তবে তার ঘনত্ব কম। মূল্য মাপার সময় আমাদের এই পরিশ্রমের ঘনত্বও হিসাবের ভেতর নিতে হবে। গড়ে পরিশ্রমের যে ঘনত্ব, সেই ঘনত্বই আমরা হিসাবে নেব।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, পণ্যের মূল্য সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় সাধারণ শ্রমের গড়পড়তা নিপুণতা ও ঘনত্ব দিয়ে সৃষ্টি হয়। এই শ্রম আবার সময় দিয়ে মাপা হয়। যতো বেশি ঘণ্টা শ্রম করা হবে, ততো বেশি মূল্য সৃষ্টি হবে। সুতরাং কোনো জিনিসের মূল্য কতো হবে, তা নির্ভর করে কতো ঘণ্টার সামাজিক শ্রম ঐ পণ্য তৈরির জন্য ব্যয়িত হলো- তার উপর।

কিন্তু পণ্য বাজারে এনে যখন হাজির করা হয়, তখন কেউ বলে না, আমার কাপড়ের মূল্য ২৪ ঘণ্টা সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় পরিশ্রম। পণ্যের মূল্য

বাজারে প্রকাশ করা হয় ও মাপা হয় অন্য পণ্যের সঙ্গে তুলনা করে। যেমন এক জোড়া কাপড় এক বস্তা ধানের সমান। টাকা-পয়সা প্রচলিত থাকলে, টাকার সাহায্যে মূল্য প্রকাশ করা হয়। টাকার সাহায্যে মূল্য মাপলে, তাকে বলে দাম। যেমন, একজোড়া কাপড়ের দাম ২০ টাকা। দাম কিন্তু সব সময় ঠিকমতো মূল্য মাপতে পারে না। কারণ দাম শুধু যে মূল্যের উপর নির্ভর করে- তা নয়। দাম অনেক অংশে পণ্যের চাহিদা ও আমদানির উপর নির্ভর করে। বাজারে যদি অনেক পণ্য এসে যায়, তাহলে পণ্য যারা বিক্রি করতে চায়, তাদের ভেতর বিক্রির জন্য প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। সবাই তার নিজের জিনিসটা বিক্রি করতে চায়। এবং ক্রেতার সংখ্যা কম হওয়ায় বিক্রি করার জন্য দাম কমিয়ে দেয়। এমনি করে আমদানি বেশি হলে দাম পড়ে যায়। আবার চাহিদা বেশি হলে দাম চড়ে যায়। ক্রেতারা সবাই জিনিস কেনার জন্য পরস্পরের ভেতর প্রতিযোগিতা করে এবং একে অন্যের চেয়ে বেশি দাম দিতে চায়, যাতে জিনিসটা সে কিনতে পারে। এমনি করে চাহিদা ও আমদানির টানাপোড়েনে দাম ওঠানামা করতে থাকে। কিন্তু দামের ওঠানামা মূল্যের কাছাকাছিই থাকে। মনে করো, কতকগুলি সেলাইয়ের কল আর পেন্সিল বিক্রি হবে। সেলাইয়ের কলের চাহিদা দশ আর আমদানিও দশ। পেন্সিলেরও চাহিদা দশ আর আমদানিও দশ। দুটোর মূল্যই কি সমান হবে? তা হবে না। কারণ সেলাইয়ের কল তৈরিতে অনেক বেশি পরিশ্রম লেগেছে বলে এর মূল্য অনেক বেশি। আর পেন্সিলে কম পরিশ্রম লেগেছে বলে মূল্য অনেক কম। সেলাইয়ের কলের চাহিদা যদি বাড়ে বা আমদানি কমে, তাহলে মূল্য থেকে দাম খানিকটা চড়ে যাবে। আর যদি চাহিদা কমে যায় বা আমদানি বেড়ে যায়, তাহলে দাম মূল্যের নীচে নেমে যাবে। চাহিদা ও আমদানি যখন সমান হবে তখন মূল্য ও দাম সমান হবে।

শ্রম সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় কি'না পণ্য বাজারে উপস্থিত না করলে, তা বোঝা যায় না। যদি পণ্য সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় হয়, তাহলে মূল্যের দামেই পণ্য বিক্রি হয়ে যায়। আর যদি অনাবশ্যক হয়, তাহলে মূল্যের চেয়ে তার দাম অনেক নেমে যায়। দাম নেমে গেলে বুঝতে হবে, ঐ পরিশ্রম অন্য কোনো পণ্য তৈরির কাজে লাগানো উচিত। আবার যদি সমাজের দরকার খুব বেশি বেড়ে যায়, তাহলে দাম মূল্যের চেয়ে বেশি উঠে যায়। তখন বুঝতে হবে, অন্য জিনিস তৈরি না করে এই জিনিসই তৈরি করতে হবে।

[সাত]

বিনিময় ও টাকা

আদিম যুগে বিনিময় ছিলো আকস্মিক গোছের। হয়তো একদল শিকারী একদল চাষীর কাছ থেকে মাংসের বদলে কিছু শস্য নিয়ে নিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে বিনিময় প্রথা বেড়ে যেতে থাকে। প্রথম প্রথম বিনিময় হতো পণ্যের বদলে পণ্য দিয়ে। টাকা তখনও লোকে জানতো না। এ রকম বিনিময়কে বলে বার্টার বা অদলবদল। অদলবদলে অসুবিধা অনেক। মনে করো, একজন চাষীর এক জোড়া কাপড় দরকার, তার কিছু ধান বাড়তি আছে। ধান দিয়ে সে কাপড় কিরতে চায়। এ রকম অবস্থায় তাকে এমন আর একজনকে খুঁজে বের করতে হবে যে কাপড় দিয়ে ধান কিনতে ইচ্ছুক। যতোদিন সে সেরকম একজন না পাবে ততোদিন আর কাপড় কেনা তার হবে না। তাই বিনিময় প্রথা যখন চালু হয়ে উঠলো, তখন বিনিময়ের সুবিধার জন্য এমন একটা পণ্যের দরকার হলো, যা সবাই সব সময়ে কিনতে রাজি আছে। মনে করো, গরুই এরকম একটা পণ্য। সবাই গরু কিনতে সবসময়ই রাজি। কারণ চাষীর সমাজে গরু সব সময়ই সবার লাগে। যে চাষীর ধান বিক্রি করে কাপড় কেনার দরকার, সে চাষী গরুর বদলে ধান বিক্রি করলো এবং পরে যার কাপড় বিক্রি করা দরকার গরু দিয়ে তার কাছ থেকে কাপড় কিনলো। অদলবদলের যুগে বিনিময় ছিলো-

ধান = কাপড়

এখন হলো– **ধান = গরু = কাপড়**

এতে গরুর সাহায্যে কেনাবেচা খুব সহজেই হয়ে গেলো। এটা সম্ভব হলো, কেননা গরুর জন্য একটা সাধারণ চাহিদা আছে। সবাই সব সময় গরু নিতে ইচ্ছুক। এর ফলে গরুর দ্বারা সমাজে কেনাবেচা হতে লাগলো। অর্থাৎ গরু 'ধনে' বা টাকায় পরিণত হলো। তখন এমনি করে যেসব পণ্য সবাই নিতে রাজি ছিলো সে সব পণ্যই টাকার কাজ করেছে। গরু, ভেড়া, ঘোড়া, কুড়াল, কাপড়, কড়ি, তামা, লোহা এবং সর্বশেষে রূপা ও সোনা টাকার কাজ করেছে। রূপা ও সোনা অন্যান্য সব জিনিসগুলোকে হারিয়ে দিয়ে একমাত্র টাকা হবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। তার কারণ হচ্ছে, রূপা ও সোনা নষ্ট হয় না, এমনকি অনেকদিন রাখলে ক্ষয় হয়েও যায় না। আর এদের ছোট ছোট টুকরায় ভাগ

করা যায়, তাতে ওজনের ক্ষতি হয় না। আবার অল্প ওজনের ভেতরেই, সোনা ও রূপার মূল্য থাকে অনেক। তাতে অনেক টাকা পকেটে করে নিয়ে চলাফেরায় অসুবিধা নেই। পঞ্চাশ টাকার জিনিস কিনে যদি গরুর টাকায় দাম দিতে চাও, গরুটাকে কাটলে চলবে না। তোমাকে খুঁজে পেতে আর একটা গরু বের করতে হবে যার মূল্য পঞ্চাশ টাকা। ঘোড়ার টাকার প্রচলন হলে তারও অনেক অসুবিধা ছিলো, তবে টাকার পিঠে চড়ে বাজারে জিনিস কিনতে যাওয়া যেতো। সোনা-রূপার প্রচলন হলে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এই যে, সোনা-রূপা পৃথিবীর সব দেশের লোকেই সব সময় নিতে রাজি। এর ফলে সোনা বা রূপা দিয়ে জিনিসপত্র কিনতে কিছু অসুবিধা হতো না। সোনা বা রূপা প্রথমে ওজন করে করে কেনাবেচা হতো। এতে অসুবিধা ছিলো এই যে, সোনা বা রূপা খাঁটি কি'না তা পরীক্ষা করাবার জন্য আবার একদল লোকের দরকার হতো। এরা প্রত্যেকবার বিনিময়ের সোনা বা রূপা পরীক্ষা করে দিতো এবং তার জন্য মজুরি হিসেবে কিছু পেত। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য রাষ্ট্র থেকে টাকা তৈরি করে বের করতে লাগলো। এতে প্রত্যেকবার ওজন করার দরকার রইলো না, আর টাকা খাঁটি কি'না সে সম্বন্ধেও কোনোও সন্দেহ কারো রইলো না। এমনি করে সমাজে টাকার চল হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কাগজের টাকা বের হলো। আমরা আগে দেখেছি, কোনো জিনিসের টাকা হতে হলে সবাই তা নিতে রাজি থাকা চাই। কাগজের টাকা নিতে বিক্রেতারা রাজি হলো, কারণ কাগজের টাকা বদলে গভর্নমেন্ট সব সময়ই রূপা বা সোনার টাকা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকলো। কাগজের টাকা চালু হবার ফলে যতোখানি সোনা বা রূপা গভর্নমেন্টের থাকা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা বাজারে ছাড়া সম্ভব হলো। কেননা কাগজের টাকা বা নোটের উপর সবার বিশ্বাস থাকায়, খুব কম লোকেই এসে নোটের বদলে সোনা বা রূপা চায়। এর ফলে অল্প সোনা বা রূপা দিয়ে অনেক টাকার কেনাবেচা করানো যেতে লাগলো।

টাকার প্রথম কাজ তাহলে দেখতে পাচ্ছি, দুটো পণ্যের মাঝখানে থেকে তাদের বিনিময় করানো। এছাড়া টাকার আরো অনেক কাজ আছে। বাজারে পণ্যের মূল্য টাকায়ই প্রকাশ করা হয়। টাকা সেইজন্য পণ্যের মূল্যের মাপকাঠি। কিন্তু আমরা আগে দেখেছি, এ মাপকাঠিটা খুব ভালো মাপকাঠি নয়, কারণ এটা সব সময় একই থাকে না, ওঠানামা করে। এই মাপকাঠিটাকে বলা হয় 'দাম'। এছাড়া টাকার আরেক কাজ হচ্ছে মূল্য জমা করে রাখা। পণ্য জমা করে রাখলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং নষ্ট হয়ে গেলে পণ্যের আর কোনো মূল্য থাকে না। কিন্তু পণ্যকে যদি টাকায় রূপান্তরিত করে রাখা যায়, তাহলে তার

মূল্য নষ্ট হয় না। কারণ টাকার মূল্য নষ্ট হবার ভয় কম। টাকা নিতে সবাই সব সময়েই রাজি থাকবে। তাছাড়া যখনই ইচ্ছা টাকাকে আবার পণ্যের সঙ্গে বদল করে নেওয়া যাবে।

টাকার আর একটা কাজ হচ্ছে, ধারে কেনাবেচার সুবিধা করে দেওয়া। বিনিময় করলে কেনাবেচা একসঙ্গেই হয়ে যায়। কিন্তু টাকা থাকার ফলের ধারে কেনার সুবিধা হয়েছে। কোনো পণ্য কিনে বিক্রেতা যদি রাজি হয়, তাহলে তখনই দাম না দিয়ে পরে সুবিধামতো দাম দিতে পারে। এই রকম ধারে কেনাবেচার সুবিধা হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব বিস্তার হয়েছে।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, টাকার কাজ মোটামুটি চারটে- বিনিময়ের সাহায্য করা, মূল্যের মাপকাঠি হওয়া, মূল্য জমা করে রাখার কাজ করা ও লেনদেনের কাজ করা। টাকা আবিষ্কার হওয়ায়, বিনিময়ের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব সুবিধা হয়েছে।

টাকার যেমন সুবিধা আছে, তেমনি অসুবিধাও আছে অনেক। টাকা একটা জোরদার পাগলা ঘোড়ার মতো। তাকে লাগাম দিয়ে বাগ মানানো ভয়ঙ্কর কঠিন কাজ। একবার যদি বাগের বাইরে চলে যায়, তাহলে আর রক্ষা নেই। সমস্ত উৎপাদন প্রথা একেবারে ওলটপালট করে দেয়। সমাজে মোট যা টাকার দরকার তার চেয়ে বেশি টাকা যদি বের করে দেওয়া হয়, তাহলে জিনিসপত্রের দাম খুব বেড়ে যায়। একে বলে **মুদ্রাস্ফীতি বা inflation**। আবার টাকা কম হয়ে গেলে দাম পড়ে যেতে থাকে, একে বলে **মুদ্রাসঙ্কোচ বা deflation**। গত যুদ্ধের সময় আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট জনসাধারণের সাহায্য না পেয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের দিয়ে যুদ্ধ চালানোর চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। ফলে অজস্র টাকার নোট ছাপিয়ে কন্ট্রাক্টরদের, কল-মালিকদের দেওয়া হয় যুদ্ধের জন্য নানারকম জিনিসপত্র তৈরি করে দেবার জন্য। কন্ট্রাক্টরদের, কল-মালিকদের দেওয়া হয় যুদ্ধের জন্য নানারকম জিনিসপত্র তৈরি করে দেওয়ার জন্য। কন্ট্রাক্টররা আবার সেই টাকা বেতন বাবদ মজুর ও অধীনস্থ কর্মচারীদের দেয়। তারা এই টাকা নিয়ে নানারকম জিনিসপত্র কিনবার জন্য বাজারে গিয়ে হাজির হয়। এদিকে যুদ্ধের জন্য জিনিসপত্র তৈরি হতে থাকে বলে সমস্ত কল-কারখানা যুদ্ধের কাজেই ব্যস্ত থাকে। তাই জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র তৈরি হয় খুব কম। ক্রেতা টাকার নোটে পকেট বোঝাই করে বাজারে হাজির হলেও, দোকানের সেলফ (তাক) অধিকাংশই থাকে খালি। তখন ক্রেতাদের ভেতর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, কে কতো বেশি দাম দিয়ে কিনতে পারে। দোকানদাররাও সুবিধে বুঝে দাম হাঁকতে থাকে খুব চড়িয়ে। ফলে, দেখতে

দেখতে সব জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। এই রকম টাকা খুব বেশি ছাপানোর ফলে, জিনিসপত্রের দাম বেশি বেড়ে যাওয়াকেই বলে **'মুদ্রাস্ফীতি'** বা **'ইনফ্লেশান'**। মুদ্রাস্ফীতি হলে তখন ব্যবসায়ীদের খুব লাভ হয়। কারণ কোনো জিনিস কিনে দু'দিন ঘরে রাখতে পারলেই অনেক বেশি দামে বিক্রি করা যায়। এর ফলে দামের স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীরা যা-ও সামান্য জিনিস বাজারে থাকে তা আটক করে ফেলে। বেশি দাম পাবে এই আশায় বিক্রি করতে চায় না। ফলে জিনিসপত্রের দাম আরো বাড়ে।

ব্যবসায়ীরা এই রকমভাবে লাভ করলেও, দামের স্ফীতি হলে বেতনভোগী যারা তাদের কষ্টের অবধি থাকে না। কারণ দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেতন বাড়ে না। ফলে আগে হয়তো ১০০ টাকা বেতনে যে সব জিনিসপত্র কিনতে পারতো, তখন ২৫০ টাকাতেও তা কিনতে পারে না। ফলে, অর্ধাহারে-অনাহারে এদের দিন কাটাতে হয়। এই জন্য দামের স্ফীতির ফলে ব্যবসায়ী, পুঁজিবাদী ইত্যাদি ধনিক শ্রেণী আরও ধনী হয়ে ওঠে, আর যারা গরিব, সামান্য বেতনভোগী, তাদের দারিদ্র্য এতো বেড়ে যায় যে, দুর্দশার অন্ত থাকে না।

[আট]

বাড়তি মূল্য

পুঁজিবাদের আগে সমস্ত যুগে জিনিসপত্র তৈরি হতো ব্যবহারের জন্য, বিনিময় করে লাভ করার জন্য নয়। বিনিময় যদিও কিছু পরিমাণে ছিলো, কিন্তু তা হতো এক পণ্য দিয়ে অন্য পণ্য পাবার জন্য, লাভের আশায় নয়। কিন্তু পুঁজিবাদের যুগে বিনিময়ের উদ্দেশ্য গেল বদলে। প্রধানত বণিকের হাতে বিনিময় একটা লাভ করার উপায়ে পরিণত হয়। আগের সমস্ত যুগে বিনিময় ছিলো এই রকম–

পণ্য–টাকা–পণ্য

আর এখন পুঁজিবাদের যুগে বিনিময়ের উদ্দেশ্য বদলে গিয়ে হলো-

টাকা–পণ্য–টাকা

অর্থাৎ টাকা দিয়ে পণ্য কেনা হলো এবং পণ্য বিক্রি করে আবার টাকা পাওয়া গেল। কিন্তু শেষে যে টাকা পাওয়া গেল তা আগের টাকার চেয়ে বেশি। এই বেশি টাকা পাবার জন্য পুঁজিবাদী কেনাবেচা করলো। পণ্য পাওয়া আর বিনিময়ের উদ্দেশ্য থাকলো না। বিনিময়ের প্রধান উদ্দেশ্য এখন হয়ে দাঁড়ালো

এই বেশি টাকা অর্থাৎ লাভ। মনে করো, একজন পুঁজিবাদী ১০০ টাকায় একটা জিনিস কিনলো। তারপর ২০০ টাকায় বিক্রি করলো। সুতরাং তার এই বিনিময়ের ফলে ১০০ টাকার পুঁজি বেড়ে গিয়ে ২০০ টাকা হলো। অর্থাৎ ১০০ টাকা বেড়ে গেল।

পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথায় এইরূপ বিনিময়ের ফলে যে পরিমাণ পুঁজি বেড়ে যায়, তাকে বলে বাড়তি মূল্য। আমাদের উদাহরণ ১০০ টাকা বাড়তি মূল্য।

এখন প্রশ্ন, এই বাড়তি মূল্য কোত্থেকে এলো? স্বভাবত মনে হবে কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করলেই পুঁজিবাদীরা এই বাড়তি মূল্যটা পেতে পারে। কিন্তু গোটা সমাজ যদি আমরা ধরি, তাহলে দেখতে পাবো কেনাবেচার ভেতর দিয়ে এই বাড়তি মূল্য সৃষ্টি হতে পারে না। মনে করো, সমাজে তিনজন পুঁজিবাদী 'ক', 'খ' আর 'গ' কেনাবেচা করছে :

নাম	কার কাছ থেকে	কার কাছে	কতো দামে	কতো দামে	লাভ (+)
	কিনলো	বেচলো	কিনলো	বেচলো	ক্ষতি (-)
ক	খ	গ	১০০	১১০	+১০
খ	গ	ক	১০০	১০০	০
গ	ক	খ	১১০	১০০	-১০

ক + খ + গ মিলে মোট লাভ ০০

'ক' 'খ'-এর কাছ থেকে কিনলো ১০০ টাকায় এবং 'গ'-এর কাছে বেচলো ১১০ টাকায়, তাতে তার লাভ হলো ১০ টাকা। মনে করো, 'খ' 'গ'য়ের কাছ থেকে কিনলো ১০০ টাকায়। আগেই দেখেছি সে 'ক'-এর কাছে বিক্রি করেছে ১০০ টাকায়। কাজেই তার লাভ হলো না কিছুই। 'গ' আগেই দেখেছি, 'ক'-এর কাছ থেকে ১১০ টাকায় কিনেছে এবং 'খ'-এর কাছে ১০০ টাকায় বিক্রি করেছে। কাজেই তার বরং লোকসান হলো। মোট তিন জনের কেনাবেচা মিলে বাড়তি মূল্য কিছু হলো না। কেনাবেচার ভেতর দিয়ে শুধু 'গ'-এর পকেট থেকে টাকা গিয়ে 'ক'-এর পকেটে হাজির হলো। বিনিময়ের দ্বারা মূল্য বৃদ্ধি পায় না, শুধু হস্তান্তর হয় মাত্র। অথচ আমরা চোখের সামনে দেখছি, গোটা সমাজে মোট পুঁজির পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো পুঁজিবাদী লোকসান দিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সমগ্র পুঁজিবাদীরা মোট তাদের পুঁজির পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়ে ফেলছে। কেনাবেচার

ভেতর দিয়ে মোট পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাই না। কেনাবেচার ভেতর দিয়ে কারো কারো লোকসান হচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণ তার লোকসান হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণ অপর একজনের লাভ হচ্ছে। কাজেই মোট পুঁজির পরিমাণ ঠিক থেকে যাচ্ছে। তাহলে মোট পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছে কোত্থেকে এবং কী করে?

মোট পুঁজির মূল্য বাড়াতে হলে পুঁজিবাদীকে এমন পণ্য খুঁজে বের করতে হবে, যা কি'না পুঁজিবাদী তার মূল্য বাড়িয়ে ফেলতে পারে। যদি কোনো কৌশলে তার মূল্য বাড়িয়ে ফেলতে পারে, তাহলে তা যখন বিক্রি করবে তখন তা থেকে কেনা মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য পাবে।

কাজেই কেনাবেচা ভেতর দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি ব্যক্তিগতভাবে হলেও, সমাজগতভাবে হতে পারে না। সুতরাং বাড়তি মূল্যের সূত্র বিনিময়ের ভেতর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আগেই বলেছি, এর জন্য এমন পণ্য দরকার হবে, যা কিনে পুঁজিবাদী তার মূল্য বাড়িয়ে ফেলতে পারে।

একমাত্র পণ্য, যার মূল্য এরকমভাবে বাড়িয়ে ফেলা সম্ভব, তা হচ্ছে শ্রমশক্তি। পুঁজিবাদী যুগে শ্রমশক্তি এই রকম একটা পণ্যে পরিণত হয়। শ্রমিকের একটা শরীর থাকে, সুতরাং তার শ্রমশক্তি অর্থাৎ পরিশ্রম করার ক্ষমতাও থাকে। শ্রমিকের বাঁচবার আর দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। তাই তার একমাত্র যা সম্বল তাই সে বিক্রির করে। অর্থাৎ তার শ্রমশক্তি কল মালিকের কাছে বিক্রি করে। কল মালিক এই শ্রমশক্তি কিনে নিয়ে তা খাটায়। শ্রমশক্তি যখন কাজে লাগানো হয় তখন তাকে বলে পরিশ্রম। শ্রমশক্তি ও পরিশ্রম বা শ্রমের ভেতর পার্থক্য ভালো করে বোঝা দরকার। এরোপ্লেনের উড়বার শক্তি আছে। কিন্তু ঠিক ওড়া ও উড়তে পারার মধ্যে পার্থক্য অনেক। তেমনি, শ্রমিক কাজ করুক আর নাই করুক, তার পরিশ্রম করার একটা ক্ষমতা আছে। এই শক্তিটাই শ্রমশক্তি। যখন সে এই শক্তিটা ব্যবহার করে- তখনই তা হয় পরিশ্রম। শ্রমশক্তি একটা পণ্য এবং মালিক শ্রমিকের কাছ থেকে এই পণ্য কেনে। এই পণ্যের মূল্য কী কী করে ঠিক হয়? অন্যান্য পণ্যের মূল্যের মতোই এরও মূল্য ঠিক হয়। তার মানে এই পণ্য তৈরি করতেও যতোখানি সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় পরিশ্রম দরকার তা দিয়ে এর মূল্য ঠিক হয়। অর্থাৎ শ্রমিককে বেঁচে থাকতে হলে ও তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বাঁচাতে হলে কতকগুলো পণ্য তাকে কিনতে হয়, যেমন ভাত, ডাল, কাপড়-চোপড়, ঘরবাড়ি, ছেলে-মেয়ের শিক্ষার খরচ, ওষুধপত্রের খরচ ইত্যাদি। এসবের যতো মূল্য শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্যও ততো হবে। অর্থাৎ যে রকম শ্রমশক্তি সে বিক্রি করে সেই রকম শ্রমশক্তি তৈরি করতে যা

খরচপত্র হয়, তাই দিয়ে শ্রমশক্তির মূল্য ঠিক হয়। মনে করো, কোনো একজন শ্রমিক ১০ ঘণ্টা খাটে। এই দশ ঘণ্টা খাটুনিতে তার শরীরের মাংসপেশী, স্নায়ু ইত্যাদি কিছুটা ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় পূরণ করতে হলে তাকে কিছুটা খাবার খেতে হবে, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম নিতে হবে। এই রকমভাবে উপযুক্ত খাওয়া-পরা ও থাকা পেলেই সে ১০ ঘণ্টা কাজ করার মতো শ্রমশক্তি অর্জন করতে পারবে। সুতরাং এই ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করার মতো শক্তি অর্জন করতে হলে যতোখানি মূল্যের জিনিসপত্র তাকে খরচ করতে হবে, তার শ্রমশক্তির মূল্যও ততোখানি হবে। যদি তার মোট দৈনিক ১ টাকা খরচ করতে হয়, তাহলে তার একদিনের শ্রমশক্তির মূল্য হবে ১ টাকা। এখানে বলা প্রয়োজন যে, শ্রমিক শুধু নিজের শরীরের জন্যই যেটা খরচ করে, কেবল সে খরচই তার শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারণ করে- তা নয়। তার পরিবারের ভরণ-পোষণের খরচের যে অংশটা তার বহন করতে হয়, সেটাও এই খরচের ভেতরে ধরতে হবে। কেননা সে যদি তার পরিবারের ভরণ-পোষণের খরচ না পায়, তাহলে শ্রমিকদের বেঁচে থাকা ও ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণ করা হবে না, অর্থাৎ তারা সব মরে যাবে। তাহলে পুঁজিবাদীরা মজুরের অভাবে উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হবে। শ্রমিকদের পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার সবটাই অবশ্য শ্রমিকদের বহন করতে হয় না। কারণ তাদের বাড়ির মেয়েরা এবং শিশুরাও ছোটবেলা থেকেই আয় করে নিজেদের ভরণ-পোষণের একটা অংশ বহন করে। মোটামুটিভাবে আমরা বলতে পারি যে, শ্রমিকের একদিনের শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হবে তার ও তার পরিবারবর্গের একটা অংশের একদিনের ভরণ–পোষণের মোট খরচ দিয়ে। এই খরচ যতো বেশি হবে, শ্রমশক্তির মূল্যও ততো বেশি বেশি হবে এবং এই খরচ যতো কম হবে শ্রমশক্তির মূল্যও ততো কম হবে। এই কারণে চালের দাম বাড়লে, তাদের ভরণ-পোষণের খরচও বেড়ে যায় এবং তার ফলে একদিনের শ্রমশক্তি তৈরি করতে তাদের বেশি খরচ করতে হয়।

পুঁজিবাদী যুগে কুটিরশিল্পী ও চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়ে উৎপাদন-যন্ত্র (যেমন, জমি, তাঁত ইত্যাদি) সমস্ত খুইয়ে বসে। ফলে তারা সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়। জায়গা, জমি, ঘর-দোর সব বিক্রি করে তখন তারা নিরুপায় হয়ে কারখানায় গিয়ে কাজ নেয়। সবকিছু দেনার দায়ে কিংবা জমিদার মহাজনের অত্যাচারে খুইয়ে দিলেও তাদের শরীরটা কিন্তু তাদেরই থাকে। দাসপ্রথার সঙ্গে পুঁজিবাদী প্রথার এইখানে তফাৎ। দাসপ্রথায় শ্রমিকের নিজের শরীরের উপর তার নিজের কোনো অধিকার নেই। তাই শরীরও তার মালিকের। ফলে মালিক তার

শরীরের ভরণ-পোষণের ভার বহন করতো এবং তার শরীর রোগা হেয় গেলে মালিকদের লোকসান হতো। কিন্তু পুঁজিবাদী প্রথায় শ্রমিকরা স্বাধীন শ্রমিক। কাজেই তার শরীর রক্ষা করার দায়িত্ব তার নিজের। মালিক তার কাছ থেকে দাসপ্রভুদের মতো তার শরীরটা কিনে নেয় না, কিনে নেয় তার একদিনের পরিশ্রম করার ক্ষমতা অর্থাৎ তার শ্রমশক্তি। মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের এই চুক্তি হয়- মজুর একদিন তার কারখানায় খাটবে এবং মালিক তাকে এই একদিনের শ্রমশক্তির যা মূল্য- তাই দেবে। এইরূপে মালিকেরা চুক্তি করে শ্রমিকের কাছ থেকে তাদের শ্রমশক্তি কিনে নেয় এবং যেহেতু এই শ্রমশক্তিই তাদের একমাত্র সম্পদ তাই মজুররাও এই শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয় বাঁচার তাগিদে।

কিন্তু শ্রমশক্তির একটা অদ্ভুত গুণ আছে, যা আর কোনো পণ্যেই নেই। তা হচ্ছে এই যে- একদিনের শ্রমশক্তির যা মূল্য, শ্রমশক্তি ব্যবহার করে তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য সৃষ্টি করা যায়। মনে করো, একদিনের শ্রমশক্তির মূল্য ১ টাকা। কিন্তু শ্রমশক্তি ব্যবহার করে ১ টাকার অনেক বেশি মূল্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। অর্থাৎ শ্রমিক একদিনের পরিশ্রমে যে শুধু নিজেদের একদিনের ভরণ-পোষণের জন্য খরচ করার মতো মূল্যই তৈরি করতে পারে তা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি পারে। শ্রমশক্তির এই গুণটা আছে বলেই মালিকেরা শ্রমশক্তি ব্যবহার করে বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করতে পারে।

এবারে কী করে ম্যাজিকের মতো বাড়তি মূল্য সৃষ্টি হয়, তাই আমরা দেখবো। মনে করো, একটা কাপড়ের কলের মালিক কাপড় তৈরির জন্য আট ঘণ্টা কাজ করার চুক্তিতে ১ টাকা দরে শ্রমশক্তি কিনলো। কিন্তু শ্রমশক্তি থাকলেই চলবে না। তাকে সুতো, অন্যান্য কাঁচামাল ও কলকজা কিনতে হবে। এই সব কিনে সে কাজ আরম্ভ করলো। কাপড় যা তৈরি হলো তাতে সুতোর যা মূল্য ছিলো, তা তৈরি কাপড়ের ভেতর চলে গেল, কল-কজারও কিছুটা ক্ষয় হলো এবং সেই মূল্যটাও কাপড়ের ভেতর চলে গেলো। এসবেও কিন্তু নতুন মূল্য কিছু সৃষ্টি হলো না। আগেরই সৃষ্ট মূল্য, যা কলকজা ও সুতোর মধ্যে ছিলো এখন তা কাপড়ের ভেতরে চলে এলো। নতুন মূল্য যা সৃষ্টি হলো, সেটা শ্রমশক্তি ব্যয় করে হলো। কারণ শ্রমশক্তিই একমাত্র পণ্য যা ব্যবহার করলে মূল্য সৃষ্টি হতে পারে। শুধু যে মূল্য সৃষ্টি হতে পারে তা নয়, শ্রমশক্তির এমন ক্ষমতা আছে যে, নিজের যা মূল্য তা সৃষ্টি করে আরও অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করতে পারে। শ্রমিক যদি আট ঘণ্টা কলে কাজ করে, তবে হয়তো চার ঘণ্টার ভেতরই সে তার নিজের শ্রমশক্তির যা মূল্য, মানে যা সে মজুরি পায়, তা তৈরি করে ফেলতে পারে। বাকি চার ঘণ্টা সে কল মালিকের জন্য কাজ করে এবং এই

বাকি চার ঘণ্টার পরিশ্রমে যে মূল্য তৈরি হয় সেটা কল মালিকেরই থেকে যায়। তার জন্য শ্রমিক মজুরি পায় না। এটাই হলো বাড়তি মূল্য।

মনে করো, একজন শ্রমিক চার ঘণ্টার পরিশ্রমে শ্রমশক্তির যা মূল্য তা তৈরি করে ফেলে, অর্থাৎ ১ টাকা মূল্য তৈরি করে ফেলে। তার মানে প্রত্যেক শ্রমিক ঘণ্টায় পঁচিশ পয়সার মূল্য তৈরি করে। আরো মনে করো, ঘণ্টায় সুতো ইত্যাদির যে মূল্যটা কাপড়ের ভেতর চলে যায় তা ১৩ পয়সার সমান। আর কলকব্জার যে মূল্যটা কাপড়ের ভেতর চলে যায় তা ১২ পয়সার সমান। তাহলে ঘণ্টায় যে পণ্য তৈরি হয় তার মূল্যের পরিমাণ হচ্ছে-

পরিশ্রম	-	২৫ পয়সা
সুতো ও কাঁচামাল	-	১৩ "
কলকব্জা	-	১২ "
মোট	-	৫০ পয়সা

অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় ৫০ পয়সার মূল্য তৈরি হয়। সুতরাং ৮ ঘণ্টায় ৪ টাকার মূল্য তৈরি হবে। কল মালিকের দৈনিক ৮ ঘণ্টায় খরচ হবে কতো?

মজুরি	-	১.০০ টাকা
সুতো ও কাঁচামাল	-	১.০৪ "
কলকব্জা	-	০.৯৬ "
মোট	-	৩.০০ টাকা

অর্থাৎ কল মালিক ৩ টাকার পুঁজি খাটিয়ে ৪ টাকার মূল্য তৈরি করতে পারবে। সুতরাং প্রত্যেক শ্রমিকের উপর দৈনিক তার ১ টাকা করে লাভ থাকবে। যদি তার কারখানায় ৫০০ শ্রমিক থাকে, তাহলে দৈনিক সে ৫০০ টাকার বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করতে পারবে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি শ্রমশক্তি নিজের মূল্যের চেয়ে বেশি যে মূল্যটা সৃষ্টি করে সেইটাই হচ্ছে মালিকের লাভ। দিনের ভেতর কয়েক ঘণ্টা খেটে শ্রমিক তার নিজের মজুরির সমান মূল্য তৈরি করে ফেলে, আর বাকি ক'ঘণ্টা সে যে মূল্য সৃষ্টি করে সেটা থেকেই মালিকের বাড়তি মূল্য উঠে আসে।

[নয়]

বাড়তি মূল্যের হার

বাড়তি মূল্যের কারণ তাহলে দেখতে পাচ্ছি, প্রথম শ্রমশক্তির নিজের মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য তৈরির ক্ষমতা আছে বলে, এবং দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদীর নিকট শ্রমিকরা তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয় বলে। উৎপাদন যন্ত্রে (অর্থাৎ যে সব জিনিসপত্রের সাহায্যে পরিশ্রম করে পণ্য উৎপাদন করা যায় যেমন, জমি, খনি, কারখানা, কলকব্জা, কাঁচামাল ইত্যাদি) পুঁজিবাদীর একচেটিয়া অধিকার থাকার জন্যে শ্রমিকরা পুঁজিবাদীর কাছে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কী করে পুঁজিবাদীরা উৎপাদন যন্ত্রে এরূপ একচেটিয়া অধিকার পেল, তা আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে দেখেছি। কিন্তু উৎপাদন যন্ত্রে একচেটিয়া অধিকার পাবার পর তারা এই বাড়তি মূল্য তৈরির কাজে উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহার করতে লাগলো। তখনই উৎপাদন যন্ত্র হলো পুঁজি। যেকোনো উৎপাদন যন্ত্র বাড়তি মূল্য তৈরির কাজে নিয়োজিত হলে তাকে আমরা বলতে পারি পুঁজি। পুঁজিবাদীদের সমর্থক যারা তারা কিন্তু পুঁজির অন্য সংজ্ঞা দেয়। তারা বলে, যেকোনো পণ্য উৎপাদনের কাজে লাগলেই তা পুঁজি। এরকমভাবে পুঁজির সংজ্ঞা দিলে পুঁজি চিরকাল ধরে ছিলো ও চিরকাল থাকবে এইটাই বুঝায় এবং পুঁজির সঙ্গে উৎপাদন যন্ত্রের কোনো পার্থক্য থাকে না। একটা বানর যদি একটা লাঠি দিয়ে ফল পাড়ে, তাহলে যেহেতু লাঠিটা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং লাঠিটা হবে পুঁজি আর বানরটা হবে একজন সম্ভ্রান্ত পুঁজিবাদী। বানরকে পুঁজিবাদী বলতে বর্তমান পুঁজিবাদীরাও নিশ্চয়ই রাজি হবেন না। উৎপাদন যন্ত্র অবশ্য চিরকাল থাকবে। কিন্তু উৎপাদন যন্ত্রের পুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়া অর্থাৎ বাড়তি মূল্য সৃষ্টির কাজ, সমাজের একটা বিশেষ স্তরে এসেই হয়েছে, অতীতে ছিলো না ভবিষ্যতেও থাকবে না। পুঁজিকে উৎপাদন যন্ত্রের সঙ্গে এক করে দেখা মানে পুঁজির আসল রূপ লুকিয়ে রাখা এবং এটাকে একটা স্থায়ী অবস্থা বলে চালানো। পুঁজির আসল কাজ হলো বাড়তি মূল্য বৃদ্ধি করা এবং এই কাজ দিয়েই তার পরিচয়।

পুঁজিকে আবার দু'রকম ভাগে ভাগ করা যায়- **পরিবর্তনশীল ও অপরিবর্তন পুঁজি (variable and constant capital)**। কল মালিক তার পুঁজি দিয়ে দু'রকম জিনিস কেনে। এক হচ্ছে শ্রমশক্তি আরেক হচ্ছে সুতো, কাঁচামাল, কলকব্জা ইত্যাদি। সুতো, কাঁচামাল, কলকব্জা ইত্যাদির মূল্য যতো ছিলো ঠিক

ততটাই উৎপাদিত পণ্যের ভেতরে চলে যায়, এদের মূল্যের কিছু পরিবর্তন হয় না। এজন্য এদের বলে অপরিবর্তনশীল পুঁজি। পুঁজির অন্য ভাগ যা শ্রমশক্তির জন্য খরচ হয়, তা কিন্তু পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। এইজন্য একে বলে পরিবর্তনশীল পুঁজি।

সুতরাং কল মালিক তার মোট পুঁজির যে অংশটা মজুরদের বেতন দিতে খরচ করছে তাকে আমরা বলবো- পরিবর্তনশীল পুঁজি। আর যে অংশটা কলকব্জা, কাঁচামাল ইত্যাদির উপর খরচ করছে, তাকে বলবো অপরিবর্তনশীল পুঁজি।

আমরা আগে দেখেছি, শ্রমিকরা নিজেদের শ্রমশক্তির যা মূল্য তার চেয়ে যতো বেশি মূল্য তৈরি করতে পারে, ততো বেশি পুঁজিবাদীর বাড়তি মূল্য বাড়ে। শ্রমিকেরা যদি ৮ ঘণ্টা খাটে এবং এই ৮ ঘণ্টার ৪ ঘণ্টায়ই যদি নিজেদের শ্রমশক্তির যা মূল্য তা তৈরি করে ফেলতে পারে, তাহলে আর বাকি ৪ ঘণ্টায় যে মূল্য তৈরি হবে সেই মূল্যটা পুঁজিবাদী আত্মসাৎ করবে। এটাই হলো তার বাড়তি মূল্য।

শ্রমিক মোট যতোক্ষণ কারখানায় কাজ করে, তাকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম ভাগ হচ্ছে, সেই সময়টা যখন সে তার নিজের শ্রমশক্তির যতোখানি মূল্য ততোখানি মূল্যের জিনিসপত্র তৈরি করতে লাগাচ্ছে। আমাদের উদাহরণে, আমরা দেখেছি, শ্রমিক নিজের শ্রমশক্তির যতো মূল্য, ততো মূল্যের জিনিসপত্র ৪ ঘণ্টায় তৈরি করছে। এই সময়টাকে আমরা **আবশ্যকীয় শ্রমসময় (necessary labour time)** বলবো । দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে, অবশিষ্ট সে সময়টা যখন সে কল-মালিকের জন্য বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করে। এই সময়টায় যতো মূল্য সে সৃষ্টি করে তা কলমালিকের পকেটস্থ হয়। এই বাড়তি মূল্য সৃষ্টির সময়টাকে আমরা **বাড়তি শ্রমসময় (surplus labour time)** বলবো ।

পুঁজিবাদী কতো পরিমাণ বাড়তি মূল্য শ্রমিকদের খাটিয়ে ওঠাতে পারছে, তা নির্ভর করবে- প্রথমত, মোট কতোখানি সময় মালিক মজুরদের খাটিয়ে নিতে পারছে তার ওপর। যতো বেশি ঘণ্টা তাদের খাটাতে পারবে ততো বেশি বাড়তি মূল্য তাদের দিয়ে তৈরি করাতে পারবে। দ্বিতীয়ত, আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কতোখানি লাগছে তার উপর। আবশ্যকীয় শ্রম-সময় যতো বেশি লাগছে, বাড়তি মূল্য সৃষ্টির সময় ততো কমে যাবে। ফলে বাড়তি মূল্যও তৈরি হবে কম। এইজন্য পুঁজিবাদীরা চেষ্টা করে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমিয়ে দিতে। আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমাবার দুটো উপায় আছে। প্রথম উপায় হচ্ছে, শ্রমশক্তির মূল্য কমিয়ে দেওয়া। শ্রমশক্তির মূল্য যদি কমিয়ে দিতে পারে, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রমিক নিজের শ্রমশক্তির মূল্য তৈরি করে নিতে

পারে এবং বাকি সময়টা তাকে দিয়ে বাড়তি মূল্য তৈরি করানো যায়। মনে করো, শ্রমশক্তির মূল্য দৈনিক ১ টাকা এবং এই ১ টাকার মূল্য তৈরি করতে শ্রমিকের ৪ ঘণ্টা সময় দরকার। এখন যদি কোনো উপায়ে শ্রমশক্তির মূল্য ৫০ পয়সা করে ফেলা যায়, তাহলে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় ৩ ঘন্টার জায়গায় ২ ঘণ্টা করে ফেলা যায়। ২ ঘণ্টার পরিশ্রমেই শ্রমিক তার নিজের মজুরিটা তুলে দিতে পারবে। কাজেই মোট যে ৮ ঘণ্টা সে কারখানায় খাটছে, তার বাকি ৬ ঘণ্টাই সে বাড়তি মূল্য তৈরি করবার জন্য দিতে পারবে।

(ক) এখন কথা হচ্ছে এই যে, কী কৌশলে মালিক শ্রমশক্তির মূল্য কমিয়ে দিতে পারে? শ্রমশক্তির মূল্য আমরা দেখেছি, নির্ভর করে ভরণ-পোষণের খরচের উপর। ভরণ-পোষণের খরচ যতো বেশি হবে শ্রমশক্তির মূল্য ততো বেশি হবে, আর ভরণ-পোষণের খরচ যতো কম হবে শ্রমশক্তির মূল্যও ততো কম হবে। সুতরাং ভরণ-পোষণের খরচ কম করে দিতে পারলে, শ্রমশক্তির মূল্যও কম করে দেওয়া যায়। ভারণ-পোষণের খরচ আবার নির্ভর করে, শ্রমিকরা যে সব জিনিসপত্র কেনে তার দামের উপর, যেমন চাল, ডাল, তেল, নুন, কাপড়, বাড়ীভাড়া ইত্যাদির উপর। এই সব জিনিসের দাম সস্তা করে দিতে পারলে, ভরণ-পোষণের খরচও কমে যায়। ভরণ-পোষণের খরচ কমে গেলে শ্রমশক্তির মূল্যও কম করে দেওয়া যায়। এই সব জিনিসের দাম সস্তা করে দেওয়া যায় যদি এই সব জিনিসপত্র কম পরিশ্রমে তৈরি করানো যায়। অর্থাৎ এই সব শিল্পের উন্নতি করানো যায় এবং বিদেশ থেকে সস্তায় এই সব জিনিস আমদানি করা যায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রথম যখন চালু হয়, তখন ইংল্যান্ডে Corn Law নামে একটা আইন ছিলো। এই আইন অনুযায়ী বিদেশ থেকে সস্তা দামের শস্য ইংল্যান্ডের বাজারে আমদানি নিষিদ্ধ ছিলো। জমিদাররা এই আইন করেছিলো যাতে বেশি দামে শস্য বিক্রি করতে পারে। কিন্তু এই আইনের ফলে পুঁজিবাদীরা দেখলো শস্যের দাম বেশি থাকায়, শ্রমিকদের মজুরিও তাদের বেশি দিতে হয়। তাই তারা জোরদার আন্দোলন করে এই আইন তুলে দিলো। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সস্তা হয়ে গেল এবং শ্রমিকদের ভরণ-পোষণের খরচ খুব কমে গেল। তখন পুঁজিবাদীরা শ্রমিকদের মজুরিও কম করে দিলো।

(খ) আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমানোর দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে- শ্রমের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেওয়া। শ্রমের ঘনত্ব বাড়িয়ে দিলে অল্প সময়ে অনেক বেশি মূল্য সৃষ্টি হয় এবং আবশ্যকীয় শ্রম-সময় কমে যায়। পরিশ্রমের ঘনত্ব বাড়াতে হলে শ্রমিককে খুব বেশি খাটাতেও হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যক্ষগুলো খুব দ্রুত চালনা

করাতে হয়। কলকব্জা আবিষ্কারের একটা উদ্দেশ্যই থাকে পরিশ্রমের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেওয়া। কলের চাকা শ্রমিকদের ইচ্ছা মতো ঘোরে না, শ্রমিককেই চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা চালাতে হয়। চাকা যতো বেশি ঘোরে, শ্রমিককে ততো দ্রুত হাত পা চালাতে হয়। কল মানুষের দাস না হয়ে মানুষই কলের দাস হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারটা তোমরা চার্লি চ্যাপলিনের 'মডার্ন টাইমস্' নামক বিখ্যাত ফিল্মে দেখতে পাবে। এমনিভাবে নানা প্রকার কলকব্জা ও নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করে কল মালিক শ্রমের ঘনত্ব বাড়াবার চেষ্টা করে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, বাড়তি মূল্যের হার বা শোষণের হার বাড়াবার তিনটি উপায় আছে- (ক) কাজের সময় বাড়িয়ে দেওয়া, (খ) শ্রমশক্তির মূল্য অর্থাৎ মজুরি কমিয়ে দেওয়া, (গ) শ্রমের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেওয়া।

বাড়তি মূল্যের মোট পরিমাণ বাড়াতে হলে মজুরের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কারণ প্রত্যেক মজুরের উপর যদি তার ৫০ পয়সা বাড়তি মূল্য হয়, তাহলে ১০০০ মজুর থাকলে ৫০০ টাকা বাড়তি মূল্য তৈরি হবে। এইরূপে মজুরের সংখ্যা যতো বেশি হবে, বাড়তি মূল্যের পরিমাণ ততো বেশি হবে।

[দশ]

মজুরি

আমরা আগে দেখেছি, শ্রমশক্তি বিক্রি করে শ্রমিক যে দাম পায়, তাই হলো মজুরি। সুতরাং মজুরি হচ্ছে **শ্রমশক্তির দাম**। কিন্তু অন্যান্য পণ্যের মতোই শ্রমশক্তির দাম যে শ্রমশক্তির মূল্যের সমান হবে- তার কোনো মানে নেই। শ্রমশক্তির দাম অর্থাৎ মজুরি শ্রমশক্তির মূল্যের চেয়ে বেশি হতে পারে, কমও হতে পারে। মজুরি শ্রমশক্তির মূল্যের চেয়ে বেশি হবে, না কম হবে, না সমান হবে, তা নির্ভর করে- (১) শ্রমিকদের একতা ও সংঘবদ্ধ হওয়ার উপর (যদি তারা খুব সংঘবদ্ধ হয়, তাহলে কল মালিক তাদের শ্রমশক্তির ন্যায্য মূল্য না দিয়ে পারে না। কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে যদি কাজের জন্য প্রতিযোগিতা থাকে, তবে কল মালিক সহজেই তাদের মজুরি কমিয়ে মূল্যের চেয়ে তার দাম কম করে দিতে পারে, (২) আর কল মালিকের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে কি'না তার ওপর।

শ্রমশক্তির মূল্য আবার নির্ভর করে শ্রমিক যে সব জিনিসপত্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, সেই সব জিনিসের মূল্যের উপর। এক এক শ্রেণীর লোক এক এক

রকমভাবে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। তাই তারা যে সব জিনিসপত্র ব্যবহার করে, তা-ও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাদের খাওয়া দাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদ সব কিছুই হয় আলাদা। যে যেসব জিনিসপত্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, সে সেই সব জিনিসপত্র না পেলে ভয়ঙ্কর অসুবিধা বোধ করে। এমন মজুরি যদি তাকে দেওয়া হয়, যাতে ঐ সব জিনিসপত্র সে কিনতে পারে না, তাহলে সে ঐ কাজ ছেড়ে বেশি বেতনের কাজের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। ঐসব ব্যবহারের জিনিসপত্র দিয়ে ঠিক করা হয় তার জীবিকার মান (standard of living) এই জীবিকার মান শুধু যে খাবার-দাবার ও পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়ে ধার্য হয়– তা নয়। অন্যান্য আরও অনেক জিনিস এর ভেতর ধরতে হয়। কতকগুলো জিনিস থাকে যেগুলো না হলে বাঁচা যায় না। যেমন খাদ্য, সাধারণ কাপড়-চোপড় ও ঘরদোর। এগুলোকে বলে বাঁচার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য (necessaries for existence)। আর কতোগুলো থাকে যেগুলোর ব্যবহার লোকে এমন অভ্যাস করে ফেলে যে, সেগুলো না হলে খুবই অসুবিধা অনুভব করে। যেমন পান, তামাক, বিড়ি, চা ইত্যাদি। এগুলোকে বলে অভ্যাসগত আবশ্যকীয় দ্রব্য (coventional necessaries)। আর কতকগুলো থাকে, যেগুলো না হলে মরে যায় না বা খুব অসুবিধা কিছু মনে হয় না, কিন্তু সেগুলি হলে কাজ করার ক্ষমতা বেশ বাড়ে, যেমন দুধ, ডিম, মাখন ইত্যাদি। এগুলোকে বলে কার্যক্ষমতার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য (necessaries for efficiency)। এই তিন রকম জিনিসপত্র নিয়ে জীবিকার মান গঠিত হয়। জীবিকার মানের ভেতর শুধু শ্রমিকের নয়, তার পরিবারের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার খরচ ধরতে হবে। শ্রমশক্তির মূল্য এই জীবিকার মান দিয়ে ঠিক হয়।

কল মালিকের মজুরি সাধারণত দু'রকমভাবে হিসাব করে দিয়ে থাকে। এক, কাজের সময় অনুযায়ী, যেমন দিন বা সপ্তাহ মাস হিসাবে। দুই, পণ্য তৈরি অনুযায়ী। এই দু' রকমের যে রকম ভাবেই দেওয়া হোক শ্রমিককে তাতে বোঝানো হয়, পুরো দিনের মজুরিই সে পেল অথবা যেমন সে কাজ করেছে সেই মতো বেতনই পেল। অর্থাৎ এভাবে মজুরি দিলে একটা সময় শ্রমিক যে কল মালিকের জন্য বিনে পয়সায় খেটে দিচ্ছে, তা সে বুঝতে পারে না। এমনিভাবে কল মালিকেরা তাদের শোষণ শ্রমিকের কাছ থেকে লুকোতে পারে।

[এগারো]

যান্ত্রিক সংগঠন ও মুনাফার হার

আমরা আগে দেখেছি, পুঁজিবাদী শ্রমশক্তি কিনে তা কারখানায় ব্যবহার করে বাড়তি মূল্যের সৃষ্টি করে। এই বাড়তি মূল্য শ্রমিকরা তৈরি করলেও, এতে মালিকেরই অধিকার এবং এটাই মালিকের **লাভ বা মুনাফা**। বাড়তি মূল্য বাড়লে মুনাফাও বাড়ে। কিন্তু মুনাফার হার মাপার সময় কল মালিক শুধু পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে বাড়তি মূল্যের তুলনা করে না, তুলনা করে মোট পুঁজির সঙ্গে। এর ফলে মুনাফার হার বাড়তি মূল্যের হারের চেয়ে অনেক কম দেখা যায়। মনে করো, একজন কল মালিকের মোট পুঁজি ১০,০০০ টাকা। এই ১০,০০০ টাকার মধ্যে ৯,৫০০ টাকাই সে কলকব্জা, কাঁচামাল ইত্যাদি পরিবর্তনশীল পুঁজির জন্য খরচ করলো এবং বাকি টাকা শ্রমশক্তি কেনার জন্য মজুরি হিসেবে অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসেবে ব্যয় করলো। আরো মনে করো, শ্রমিকরা যতোক্ষণ খাটছে, তার অর্ধেক সময় শ্রমশক্তির মূল্য তৈরি করছে এবং বাকি তার অর্ধেক যাচ্ছে তাদের মজুরি হিসেবে এবং অর্ধেক থাকছে কলমালিকের কাছে বাড়তি মূল্য হিসেবে। অর্থাৎ যদি কলমালিক ৫০০ টাকা খরচ করে মজুরি দেবার জন্য, তাহলে শ্রমিকরা আর ৫০০ টাকার বাড়তি মূল্য তৈরি করছে। সুতরাং ৫০০ টাকা মজুরির উপর ৫০০ টাকার বাড়তি মূল্য হচ্ছে। অর্থাৎ বাড়তি মূল্যের হার শতকরা ১০০ টাকা। পরিবর্তনশীল পুঁজির উপর মালিক যতো খরচ করছে সে খরচটা তো উঠে আসছেই। উপরন্তু ঠিক ততো পরিমাণই বাড়তি মূল্যও মালিকের পকেটে উঠে আসছে। এই বাড়তি মূল্যের হারটাকে আমরা শোষণের হার বলতে পারি। কেননা, শ্রমিকদের কী পরিমাণ মজুরি দিচ্ছে এবং কী পরিমাণ শ্রমিকদের উৎপন্ন মূল্য মালিক পকেটে পুরছে, তা এ থেকে বোঝা যায়।

কিন্তু পুঁজিবাদী মুনাফার হার বের করবার সময় পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে বাড়তি মূল্যের তুলনা করে না। সে দেখে মোট কতো সে ব্যবসায় খাটিয়েছিলো এবং মোট কতো টাকা তার লাভ হয়েছে। অর্থাৎ মোট বাড়তি মূল্যের সঙ্গে সে তার মোট পুঁজির তুলনা করে। আমাদের উদাহরণটি নিলে কল মালিকের মোট খেটেছে ১০,০০০ টাকা। মোট বাড়তি মূল্য ৫০০ টাকা। সুতরাং ১০,০০০ টাকায় তার ৫০০ টাকা লাভ হয়েছে। অর্থাৎ শতকরা ৫ টাকা মাত্র তার লাভ। সুতরাং মুনাফার হার দেখে শ্রমিকরা কী পরিমাণ শোষিত হচ্ছে, তা বোঝা যায়

না। তা বুঝতে হলে আমাদের বাড়তি মূল্যের হার বের করতে হবে।

উৎপাদনের মোট পুঁজির পরিবর্তনশীল অংশের তুলনায় অপরিবর্তনশীল অংশের পরিমাণকে বলে **উৎপাদনের যান্ত্রিক সংগঠন**। যদি পরিবর্তনশীল অংশের তুলনায় অপরিবর্তনশীল অংশ খুব বেশি হয়, অর্থাৎ পুঁজির যে অংশটা মজুরি হিসাবে দেওয়া হয়, তার তুলনায় যে অংশটা কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির জন্যে খরচ হয়, তা যদি খুব বেশি হয়, তাহলে যান্ত্রিক সংগঠন বেশি বলে ধরতে হবে। যতো বেশি যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হবে এবং তার ফলে উৎপাদন শক্তি যতো বেশি বাড়বে, ততো যান্ত্রিক সংগঠন বাড়বে। আমাদের উদাহরণে অপরিবর্তনশীল পুঁজি = ৯,৫০০ টাকা এবং পরিবর্তনশীল পুঁজি = ৫০০ টাকা। সুতরাং যান্ত্রিক সংগঠন হচ্ছে-

$$\frac{\text{অপরিবর্তনশীল পুঁজি}}{\text{পরিবর্তনশীল পুঁজি}} = \frac{৯৫০০}{৫০০} = ১৯$$

মুনাফার হার নির্ভর করে- (ক) বাড়তি মূল্যের হারের উপর। কারণ, বাড়তি মূল্যের হার যতো বাড়বে, বাড়তি মূল্য ততো বাড়বে এবং বাড়তি মূল্য যতো বাড়বে মুনাফা ততো বেশি হবে। (খ) মুনাফার হার নির্ভর করে যান্ত্রিক সংগঠনের উপর। যান্ত্রিক সংগঠন যতো বাড়বে মুনাফার হার ততো কমবে, এবং যান্ত্রিক সংগঠন যতো কমবে মুনাফার হার ততো বাড়বে। কারণ মুনাফার উৎপত্তি হয় বাড়তি মূল্য থেকে, বাড়তি মূল্য আবার জন্মে শ্রমশক্তি ব্যবহারের ফলে। যান্ত্রিক সংগঠন বাড়ানো মানে অনেক বেশি যন্ত্রপাতি বাড়ানো এবং কম শ্রমশক্তি ব্যবহার করা ও মজুরদের সাহায্য ছাড়া কলেই সব কাজ করিয়ে নেওয়া। ফলে মজুরের সংখ্যা কমে যাবে এবং বাড়তি মূল্যের পরিমাণও কমে যাবে। সুতরাং কম শ্রমশক্তি ব্যবহার করা মানে কম বাড়তি মূল্য তৈরি হওয়া। কম বাড়তি মূল্য তৈরি হওয়ায় মুনাফাও কম দেখা যায়। মুনাফার হার নির্ভর করে, বাড়তি মূল্যের হারের উপর এবং অপরিবর্তনশীল পুঁজি ও পরিবর্তনশীল পুঁজির অনুপাতের উপর। বাড়তি মূল্যের হার যতো বাড়বে, মুনাফা ততো বাড়বে এবং অপরিবর্তনশীল পুঁজির তুলনায় পরিবর্তনশীল পুঁজি যতো কমবে মুনাফা ততো কমবে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মনে করো, ক, খ ও গ তিনজন কল মালিক পণ্য উৎপাদন করছে। তাদের পুঁজি, যান্ত্রিক সংগঠন ইত্যাদি উল্লেখ করা হলো।

ক, খ ও গ তিনজনেরই পুঁজি সমান, বাড়তি মূল্যের হারও সমান। কিন্তু

প্রত্যেকেরই যান্ত্রিক সংগঠন ভিন্ন। 'ক'-এর যান্ত্রিক সংগঠন সবচেয়ে বেশি। এর ফলে তার মুনাফার হারও সবচেয়ে কম, মাত্র শতকরা ৫ টাকা। 'খ'-এর যান্ত্রিক সংগঠন 'ক'-এর চেয়ে কম, কিন্তু 'গ'-এর চেয়ে বেশি। সুতরাং তার মুনাফার হারও 'ক'-এর চেয়ে বেশি, কিন্তু 'গ'-এর চেয়ে কম। আর 'গ'-এর যান্ত্রিক সংগঠন সবচেয়ে কম বলে তার মুনাফার হার সবচেয়ে বেশি।

যান্ত্রিক সংগঠন কম হওয়ায় 'গ' বাড়তি মূল্য তৈরি করে বেশি এবং মুনাফাও বেশি হারে সৃষ্টি করে। কিন্তু এই অতিরিক্ত হারে মুনাফা তার কপালে জোটে না। পণ্য উৎপাদন করে সে এই সব বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু বাজারে বিক্রি না করলে এই সব পণ্য আবার টাকায় রূপান্তরিত হয় না এবং পণ্যের মূল্য টাকায় রূপান্তরিত করতে না পারলে, তার এতো হাঙ্গামার কোনো তাৎপর্যই থাকে না। বাজারে এই সব পণ্য যদি ঠিক মূল্যে বিক্রি করতে পারে, তবেই সে বাড়তি মূল্য বাজিয়ে সিন্দুকে তুলতে পারে। বাজারে গিয়ে কিন্তু 'গ'-কে অসুবিধায় পড়তে হয়, সেখানে 'ক' এবং 'খ' ও তাদের জিনিসপত্র নিয়ে হাজির থাকে। ক, খ ও গ মিলে মোট যে পরিমাণ মূল্যের সৃষ্টি করেছে, তা হচ্ছে তিন জনেরই মোট পুঁজি ও বাড়তি মূল্যের সমান। মোট পুঁজি হচ্ছে প্রত্যেকের ১০,০০০ টাকা করে। 'ক'-এর বাড়তি মূল্য হচ্ছে ৫০০ টাকা, 'খ'-এর হচ্ছে ৫,০০০ টাকা, আর 'গ'-এর হচ্ছে ৯,৫০০ টাকা। মোট বাড়তি মূল্যের পরিমাণ হচ্ছে ১৫,০০০ টাকা। তাহলে ক, খ ও গ তিনজনে মিলে মোট মূল্য সৃষ্টি করলো ৪৫,০০০ টাকা। মনে করো, মোট ৪৫,০০০ পণ্যই তারা তৈরি করেছে। 'ক'-এর যান্ত্রিক সংগঠন সবচেয়ে বেশি, সুতরাং সে সবচেয়ে বেশি পণ্য তৈরি করবে। 'ক'-এর চেয়ে কম করবে 'খ' এবং 'গ' সবচেয়ে কম পণ্য তৈরি করবে। মনে করো, 'ক' তৈরি করেছে ২০,০০০, 'খ' করেছে ১৫,০০০ এবং 'গ' করেছে ১০,০০০। ৪৫,০০০ পণ্য তৈরি হওয়ায় এবং মোট ৪৫,০০০ টাকার মূল্য তৈরি হওয়ায়, প্রত্যেক পণ্যের মূল্য হবে ১ টাকা করে। সুতরাং পণ্য বিক্রি করে 'ক' পাবে ২০,০০০ টাকা, 'খ' পাবে ১৫,০০০ টাকা এবং 'গ' পাবে ১০,০০০ টাকা। অতএব 'ক'-এর লাভ হবে ১০,০০০ টাকা, 'খ'-এর লাভ হবে ৫,০০০ টাকা এবং 'গ'-এর কিছু লাভ হবে না। এখন পরের পৃষ্ঠায় হিসাবটা দেখলে জিনিসটা আরো পরিষ্কারভাবে বুঝবে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, সমাজে মোট ১৫,০০০ টাকার বাড়তি মূল্য তৈরি হয়েছিলো। আর এই ১৫,০০০ টাকার ভেতর 'গ' একাই তৈরি করিয়েছে ৯,৫০০ টাকার। কিন্তু যান্ত্রিক সংগঠন কম হওয়ায়, এই বাড়তি মূল্য ভোগ করা তার হয়ে উঠলো না। বাজারের নিয়ম অনুযায়ী 'ক'-এর পকেটে গিয়ে হাজির হলো।

উচ্চ যান্ত্রিক সংগঠন	মধ্যম যান্ত্রিক সংগঠন	নিম্ন যান্ত্রিক সংগঠন
ক	খ	গ
মোট পুঁজি= ১০,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
অপরিবর্তনশীল পুঁজি = ৯,৫০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	৫০০ টাকা
পরিবর্তনশীল পুঁজি = ৫০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	৯,৫০০ টাকা
বাড়তি মূল্যের হার = শতকরা ১০০ টাকা	শতকরা ১০০ টাকা	শতকরা ১০০ টাকা
সুতরাং মোট বাড়তি মূল্য- ৫০০/০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	৯,৫০০ টাকা
সুতরাং মুনাফার হার = $\frac{৫০০}{১০,০০০} \times ১০০$	$\frac{৫০০০}{১০,০০০} \times ১০০$	$\frac{৯,৫০০}{১০,০০০} \times ১০০$
= ৫ টাকা শতকরা	= ৫০ টাকা শতকরা	= ৯৫ টাকা শতকরা

কী রকমভাবে 'ক' 'গ'-এর তৈরি এই বাড়তি মূল্য পকেটস্থ করলো। 'ক' ২০,০০০ পণ্য তৈরি করেছে এবং মোট খরচ হয়েছে তার ১০,০০০ টাকা। সুতরাং তার প্রত্যেকটা পণ্যে ৫০ পয়সা খরচ হয়েছে। কিন্তু বাজারে মোট ৪৫,০০০ টাকার মূল্য তৈরি হওয়ায় এবং ৪৫,০০০ হাজার পণ্য তৈরি হওয়ায়, প্রত্যেকটা পণ্যের মূল্য হয়েছে ১ টাকা করে। সুতরাং 'ক' প্রত্যেকটা পণ্যে ৫০ পয়সা লাভ করেছে। এবং ২০,০০০ হাজার পণ্য তৈরি করে, তার মোট লাভ হয়েছে ১০,০০০ টাকা। কিন্তু 'গ' মাত্র ১০,০০০ পণ্য তৈরি করেছে এবং প্রত্যেক পণ্য তৈরি করতে তার খরচ পড়েছে ১ টাকা করে। সুতরাং তার লাভ কিছু হয়নি। এইজন্য বাজারে যে যতো সস্তায় যতো বেশি পণ্য তৈরি করতে পারবে, তার ততো বেশি লাভ হবে এবং সে ততো বেশি পরিমাণে অপরের উৎপাদিত বাড়তি মূল্য নিজের পকেটস্থ করে ফেলতে পারবে। এই কারণে পুঁজিবাদী উৎপাদনের যান্ত্রিক সংগঠন বাড়াতে এতো ব্যগ্র থাকে। আমাদের উদাহরণে 'গ' যদি কিছু বাড়তি মূল্য হাত করতে চায়, তাহলে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে- তার কারখানার যান্ত্রিক সংগঠন খুব শীঘ্র বাড়িয়ে ফেলা। এ যদি সে করতে পারে, তবে সে কিছু লাভ করে টিকে থাকতে পারবে। নতুবা 'ক' ও 'খ' তার তৈরি বাড়তি মূল্য সব নিয়ে নেবে এবং কিছুদিনের ভেতরই তাকে লোকসানের জন্য লালবাতি জ্বলতে বাধ্য করবে। এইজন্য পুঁজিবাদীরা লাভ যা করে তা খরচ করে না ফেলে, তার একটা মোটা অংশ আবার পুঁজি হিসেবে খাটায় এবং যন্ত্রপাতির উন্নতির জন্য ব্যয় করে। এমনভাবে পুঁজি বেড়েই চলে।

কিন্তু আমরা আগে দেখেছি, মুনাফার হার নির্ভর করে বাড়তি মূল্যের হারের উপর এবং যান্ত্রিক সংগঠনের উপর। বেশি বেশি পুঁজি লাগিয়ে যন্ত্রপাতির উন্নতি করা মানেই যান্ত্রিক সংগঠন বাড়িয়ে দেওয়া এবং যান্ত্রিক সংগঠন বাড়া মানে আবার মুনাফার হার কমে যাওয়া। যদিও যান্ত্রিক সংগঠন বাড়ালে পুঁজিবাদীর ব্যক্তিগতভাবে অন্যান্য পুঁজিবাদী অপেক্ষা মুনাফা বেড়ে যায়, কিন্তু শ্রেণী হিসাবে তাদের মুনাফার হার কমে যেতে থাকে। সুতরাং যতোই যান্ত্রিক সংগঠন বাড়ানো যায়, ততোই মুনাফার হার কমে যায়। এই মুনাফার হার কমে যাওয়া পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার একটা বিশেষ রীতি।

মুনাফার হার কমে যাওয়ার ফলে মোট মুনাফাও কমে যেতে থাকে। কিন্তু পুঁজিবাদী-উৎপাদন প্রথার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা। মুনাফাই যদি কমে গেল, তাহলে আর উৎপাদন করে লাভ কী? কাজেই মোট মুনাফা কমে যেতে থাকলেই পুঁজিবাদীরা উৎপাদন কমিয়ে দেবে বা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু মুনাফার হার কমে গেলেও, মোট মুনাফা যাতে কমে না যায়। তার একটা উপায় করা

	মোট পুঁজি	বাড়তি মূল্য	মোট উৎপাদিতো মূল্য	পণ্য	বাজার দাম	পণ্য বিক্রির মোট আয়	পণ্য তৈরির খরচ	লাভ
ক	১০,০০০	৫০০	১০,৫০০	২০,০০০	১	২০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
খ	১০,০০০	৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১	১৫,০০০	১০,০০০	৫০,০০০
গ	১০,০০০	৯,৫০০	১০,০০০	১০,০০০	১	১০,০০০	১০,০০০	০
মোট	৩০,০০০	১৫,০০০	৪৫,০০০	৪৫,০০০				১৫,০০০

যায়। উপায় হচ্ছে মুনাফা যে হারে কমে যাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি হারে পুঁজি বাড়ানো। মনে করো, মুনাফার হার প্রথম বছর শতকরা ৪০ টাকা। তারপর হলো ২০ টাকা। তারপর হলো ১০ টাকা। পুঁজি যদি হয় ১০০ টাকা, তাহলে প্রথম বছরে মোট লাভ হবে ৪০ টাকা। দ্বিতীয় বছরে পুঁজি যদি দ্বিগুন করা যায়, অর্থাৎ ২০০ টাকা করা যায়, তাহলে মোট লাভ বজায় থাকে অর্থাৎ ৪০ টাকায় থাকে এবং তারপরের বছর পুঁজি আবার দ্বিগুন করলে অর্থাৎ ৪০০ টাকা করলে লাভ ৪০ টাকাই থাকে। সুতরাং এ রকম ৪০ টাকা লাভ রাখতে গিয়েই, পুঁজিবাদীকে প্রত্যেক বছর পুঁজি দ্বিগুন বাড়িয়ে যেতে হবে। কিন্তু ১০০ টাকা পুঁজি খাটিয়ে পাচ্ছিলো ২০০ টাকা এবং ৪০ টাকার পুঁজি খাটিয়েও যদি সেই ৪০ টাকাই পায়, তাহলে আর তার পুঁজি বাড়িয়ে লাভ কী? কাজেই দ্বিতীয় বছর ২০০ টাকার বেশি পুঁজি তাকে বাড়াতে হবে। তাহলেই ৪০ টাকার চেয়ে মুনাফা কিছু বেশি হবে। তৃতীয় বছর ৪০০ টাকার বেশি পুঁজি বাড়াতে হবে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার অস্তিত্ব তাহলে নির্ভর করছে উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর বেগে পুঁজি বাড়িয়ে যাওয়ার উপর।

কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথার সঙ্কটও এই পুঁজি বাড়ানো থেকে আসে। কারণ পুঁজি বেড়ে যাওয়ায় যান্ত্রিক সংগঠনও বেড়ে যায় এবং তার ফলে মুনাফার হার আবার কমে যেতে থাকে। এবং যতোই মুনাফার হার কমে যায়, মুনাফা বজায় রাখার জন্য পুঁজি ততো বাড়িয়ে দিতে হয়। এই হলো **পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার সঙ্কট**। মুনাফার হার কমে গেলে পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে হয়। আর পুঁজির পরিমাণ যতো বেড়ে যায়, মুনাফার হারও ততোই কমে আসে। কিন্তু পুঁজি বাড়াবারও একটা সীমা আছে। যখনই পুঁজি বাড়ানো থমকে দাঁড়ায়, তখনই উৎপাদন প্রথার ভেতরেও অচল অবস্থা এসে যায়। অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, অনেক শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। একেই বলে **ব্যবসা-সঙ্কট**।

উৎপাদিত পণ্য কল মালিক নিজে বাজারে বিক্রি করে না। ব্যবসায়ীদের উপর বিক্রির ভার থাকে এবং এর জন্য বাড়তি মূল্যের একটা অংশ ব্যবসায়ীকে দিতে হয়। কতো অংশ দেবে তা প্রতিযোগিতার উপর এবং পণ্যের আমদানি ও চাহিদার উপর নির্ভর করে।

[বারো]

সুদের হার ও ব্যাংক

মানুষ সাধারণত তাদের যা আয় (মুনাফার থেকেই হোক আর শ্রমশক্তি বিক্রি করেই হোক) তার সবটা খরচ করে ফেলে না। একটা অংশ বাঁচিয়ে জমা করে রাখার চেষ্টা করে। যাদের আয় খুব কম, তাদের পক্ষে অবশ্য বাঁচানো সম্ভব হয় না। কিন্তু আয় একটু বেশি হলেই কিছুটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা অধিকাংশ লোকে করে থাকে। বিভিন্ন উদ্দেশে লোকে টাকা জমায়। যাদের আয় কোটি কোটি টাকা, তারা খরচ করার উপায় পায় না বলেই জমায়। পৃথিবীতে মোট প্রত্যেক বছর যতো টাকা জমে, তার অধিকাংশ এদের কাছে জমা হয়। খুব ছোট একটা অংশ জমে এমন লোকদের কাছে, যাদের আয় কম হলেও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচার জন্যই যারা জমায়। হঠাৎ বেকার হয়ে গেলে বা একটা অসুখ-বিসুখে পড়লে যাতে একেবারে অসহায় হয়ে না পড়ে, তার জন্যই এ সব লোকেরা টাকা-পয়সা কিছু জমানোর চেষ্টা করে।

টাকা জমিয়ে আজকাল মানুষ সাধারণত ব্যাংকে রাখে। ব্যাংকে রাখলে টাকা যেমন চোর-ডাকাতের হাত থেকে নিরাপদে থাকে, তেমনি কিছু সুদও ব্যাংক দিয়ে থাকে। এই টাকাকে বলে **জমা বা আমানত (deposit)**।

ব্যাংক কিন্তু এ টাকা সিন্দুকে ফেলে রাখে না। ব্যাংক এ টাকা ব্যবসায়ী ও কল মালিকদের ধার দেয়। আমানতকারীকে তার জমার উপর ব্যাংক যে সুদ দেয়, তার চেয়ে বেশি সুদে কল মালিকদের সে ধার দেয়। এই সুদের যে কম-বেশি, তার থেকেই ব্যাংকের লাভ হয়। কল মালিক ও ব্যবসায়ীরা এই টাকা নিয়ে ব্যবসায় খাটায়। কল মালিক শ্রমশক্তি ক্রয় করে ও শোষণ করে যে বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করে, তার থেকেই ব্যাংকের সুদ দেয়।

সুদের হার ঠিক হয় কল মালিকের পুঁজির চাহিদা ও ব্যাংকে আমদানির পরিমাণ দিয়ে। যদি কল মালিকরা দেখে যে পুঁজি খাটিয়ে বেশ ভালো মুনাফা পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে তারা আরো বেশি পুঁজি খাটাতে চায় এবং ফলে ব্যাংকগুলো সুবিধা পেয়ে সুদের হারও বাড়িয়ে দেয় এবং বাড়তি মূল্যের একটা মোটা অংশ নিয়ে নেয়। কিন্তু যখন কল মালিকরা দেখে যে মুনাফা পড়ে যাচ্ছে, তখন তারা আর বেশি পুঁজি খাটাতে চায় না। ফলে পুঁজির চাহিদা কমে যায় এবং ব্যাংকে

জমা টাকা পড়ে থাকে। ব্যাংকে টাকা জমা থাকলে ব্যাংকের লোকসান, কারণ যারা জমা রাখে তাদের গচ্ছিত টাকার সুদ দিতে হয়। কাজেই ব্যাংক তখন সুদের হার কমিয়ে দেয়, যাতে কল মালিকরা সুদ কম দেখে টাকা নেয়।

তেমনি ব্যাংকে অনেক বেশি টাকা যদি লোকে জমা দেয়, তাহলে ব্যাংক আমানতকারীদের যে সুদ দেয়, তা কমিয়ে দেয়, তখন ব্যাংকে কম জমা পড়ে। চাহিদার তুলনায় যদি আমানত কম হয়ে যায়, তাহলে সুদের হার ব্যাংক আবার বাড়িয়ে দেয়। এমন করেই বাড়তি মূল্যের কতো অংশ ব্যাংক পাবে, আর কতো অংশ পুঁজির আসল মালিক অর্থাৎ আমানতকারী পাবে- তা ঠিক হয়।

ব্যাংকের কাজ যে শুধু টাকা ধার দেওয়া বা আমানত রাখা- তা নয়। ব্যাংকের আরেকটা বড় কাজ হচ্ছে, চেক ব্যবস্থা চালু করা। টাকা জমা দেওয়ার পর ব্যাংক আমানতকারীকে একটা চেক বই দিয়ে দেয়। আমানতকারী কোনোও জিনিস কিনে তার দাম চেকে লিখে নাম সই করে দিলে, বিক্রেতা জিনিসের দামের জন্য নগদ টাকা চায় না, চেক পেয়েই খুশী হয়। চেকটা হচ্ছে ব্যাংকের উপর আমানতকারীর একটা হুকুম, যে টাকা লেখা থাকবে তাতে সেই টাকা চেক যার নামে থাকবে তাকে দেবার জন্য। বিক্রেতা এই চেক পেয়ে ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়। এবং ব্যাংক আমানতকারীর জমা টাকা থেকে কেটে চেকে যতো টাকা লেখা থাকে, ততো টাকা বিক্রেতাকে দিয়ে দেয়। বিক্রেতার যদি টাকার দরকার না থাকে, তাহলে ঐ টাকা ব্যাংকেই নিজের নামে জমা রেখে দিতে পারে। ব্যাংক তখন আমানতকারীর জমা থেকে কেটে সেই টাকাটা বিক্রেতার নামে জমা করে রাখে।

এই চেক দিয়ে কেনাবেচার নাম **ব্যাংক ক্রেডিটে কেনাবেচা**। চেকে যারা কেনাবেচা করে তাদের অধিকাংশেরই ব্যাংকে টাকা জমা থাকে এবং কিছু বিক্রি করে চেক পেলেই তা ব্যাংকে জমা করতে পাঠিয়ে দেয়। এর ফলে চেকে যতো টাকার কেনাবেচা হয়, তার অধিকাংশতেই টাকা তোলা হয় না। নগদ ছাড়াই এই সব কেনাবেচা হয়ে যায়। ব্যাংক শুধু ক্রেতার জমা থেকেই কেটে বিক্রেতার হিসাবে জমা করে দেয়। এর ফলে একদিকে কেনাবেচার যেমন সুবিধা হয়, তেমনি আবার টাকাও কেনাবেচার জন্য কম লাগে।

এই ব্যাংক ক্রেডিট চালু রাখার ফলে ব্যাংক যা টাকা জমা পায়, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা ধার দিতে পারে। কারণ চেকে কেনাবেচা হয় বলে টাকার খুব কম দরকার হয়। যে ব্যাংক থেকে টাকা ধার নেয় তাকে শুধু একটা চেক বই দিয়ে দিলেই হয়। সে জিনিসপত্র কিনে চেকে দাম দিয়ে দেয় এবং চেক এসে আবার ব্যাংকে বিক্রেতার নামে জমা হয়। এর ফলে ব্যাংক এক পয়সা

না রেখেও, হাজার হাজার টাকা ধার দিতে পারে। এই রকম খালি সিন্দুক থেকে হাজার হাজার টাকা ধার দিয়েই ব্যাংকের আয় সব চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

কিন্তু ব্যাংকের সিন্দুক একেবারে খালি করলেও চলে না। কেননা, সব চেক যে জমা হবার জন্যে আসে- তা নয়। কিছু কিছু চেক টাকা তুলবার জন্যও আসে। এই সব চেকের মালিকরা এসে টাকা চায়। ব্যাংক যদি তখন টাকা না দিতে পারে, তাহলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড বেধে যায়। চারিদিকে রটে যায় যে, ব্যাংক জমা টাকা দিতে পারছে না। অমনি দেখতে দেখতে হাজার হাজার লোক, যারা সেই ব্যাংকে টাকা জমা রেখেছে, তারা টাকার দুশ্চিন্তায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যাংকের দুয়ারে এসে হাজির হয় এবং এসেই তাদের টাকা দাবি করে। ব্যাংক জমা টাকার অধিকাংশ ধার দিয়ে দেয়, কাজেই জমা টাকা ফেরত দিতে পারে না। হয়তো তাকে অন্য ব্যাংকের কাছে ছুটতে হয় টাকা ধারের জন্য, নয় গভর্নমেন্টের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে হয়। কিন্তু ধার বা সাহায্য যদি না পায়, তাহলে বাধ্য হয়েই তাকে দরজা বন্ধ করে লাল বাতি জ্বালিয়ে দিতে হয়। সেই জন্য ব্যাংক সব সময় কিছু পরিমাণে টাকা সিন্দুকে জমা রেখে দেয়, যাতে আমানতদারদের টাকার চাহিদা সব সময়েই মিটিয়ে তাদের বিশ্বাস অটুট রাখতে পারে। এই টাকাটাকে বলে **মজুত টাকা (reserve)**। এইভাবে টাকা ধার দিয়ে ও ব্যাংক ক্রেডিট চালু করে সমাজে মোট যতো বাড়তি মূল্য তৈরি হয়, তার একটা মোটা অংশ ব্যাংকের সিন্দুকে হাজির হয়।

[তেরো]

জমির খাজনা

সমাজের যতো রকম উৎপাদনযন্ত্র আছে তার ভেতর জমি বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। কারণ মানুষের সবচেয়ে আবশ্যকীয় দ্রব্য হলো খাদ্য, তার অধিকাংশ জমি ছাড়া তৈরি হতে পারে না। অন্যান্য উৎপাদন যন্ত্রের সঙ্গে জমির প্রভেদ বিশেষ কিছুই নেই। শুধু প্রভেদ এই যে- জমি ভিন্ন উৎপাদন যন্ত্রে, যেমন কলকব্জায়, মানুষের পরিশ্রমের ভাগ বেশি, আর প্রকৃতি-প্রদত্ত জিনিসের ভাগ কম থাকে। কিন্তু জমিতে প্রকৃতি-প্রদত্ত জিনিসের অংশ বেশি এবং মানুষের পরিশ্রমের ভাগ কম থাকে। এর ফলে অন্যান্য উৎপাদন যন্ত্র যেমন ইচ্ছে করোলেই বাড়িয়ে ফেলা যায়, জমির পরিমাণ ও উর্বরতা ততো শীঘ্র বা সহজে বাড়ানো যায় না। কিন্তু তাই বলে

জমি একেবারে প্রকৃতির দান, আর কল-কব্জা শুধু পরিশ্রম, আর কিছু না– এরূপ বলাও ভুল হবে।

পুঁজিবাদী যুগের বহু পূর্ব থেকেই জমিতে জমিদারের একচেটিয়া অধিকার ছিলো। এই একচেটিয়া অধিকার থাকার ফলে জমিদার জমি থেকে উৎপাদিত মূল্যের একটা অংশ আদায় করে থাকে, একেই বলে **জমির খাজনা (rent).** এই খাজনার হার নির্ভর করে কোনো জমি কতো ভালো এবং তাতে কতো বাড়তি ফসল তৈরি হলো তার উপর। মনে করো, দু' খানা জমি 'ক' ও 'খ'। 'ক' জমিটা খুব ভালো, আর 'খ'টা খারাপ। দুটোতেই সমান পরিশ্রম ব্যয় করা হলো। কিন্তু ফসল হলো 'ক' জমিটাতে ১০ মণ এবং 'খ' জমিটাতে ৫ মণ। বাজারে এই ফসলের এমন দাম হওয়া চাই, যাতে 'খ'-এর চাষের খরচ ও সাধারণত পুঁজির উপরে যে হারে মুনাফা পাওয়া যায় সেই হারে মুনাফা উঠে আসে। চাষের খরচের ভেতর শুধু যে বীজ ধান, গরু, লাঙ্গল, সার, জলসেচ ও যাদের দিনমজুর খাটালো তাদের মজুরি এবং ফসল বাজারে আনবার খরচ ধরতে হবে তাই নয়, চাষীর নিজের ও তার পরিবারের যারা ফসল উৎপাদনের কাজে খেটেছে তাদের সকলের মজুরিও ধরতে হবে। এই সব খরচ নিয়ে মনে করো মোট খরচ হয়েছে ২৩ টাকা এবং চাষী এই ২৩ টাকার মুনাফা ২ টাকা আশা করে। সুতরাং এই ৫ মণ ফসল বিক্রি করে তার এই ২৫ টাকার খরচটা উঠে যাওয়া চাই। অর্থাৎ বাজারে ফসলের দাম মণ প্রতি ৫ টাকা হওয়া চাই। দাম ৫ টাকার কম হলে চাষীর এ জমি চাষ করে লোকসান হবে, ফলে এ জমি চাষ করা সে ছেড়ে দেবে। যদি দাম ৫ টাকার বেশি হয় তাহলে এ জমির চেয়ে খারাপ জমি চাষ করেও সে লাভ করতে পারবে। তাতে ফসল কম হবে কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় সে জমি চাষের খরচ পুষিয়ে যাবে। মনে করো ফসলের দাম ৫ টাকা করে। তাহলে 'খ' জমিখানা থেকে চাষীর আয় হবে মোট ২৫ টাকা। 'ক' জমি যার তার আয় হবে ১০ মণ ফসলে ৫০ টাকা। অর্থাৎ 'ক' জমির চাষীর বাড়তি আয় হবে ২৫ টাকা।

কিন্তু এই ২৫ টাকা সে রাখতে পারবে না। কারণ অন্যান্য চাষীও এই জমিখানা নেওয়ার জন্য জমিদারকে ধরাধরি করতে থাকবে এবং যে বেশি খাজনা দিতে চাইবে জমিদার তাকেই জমিটা দেবে। চাষীদের ভেতর এই প্রতিযোগিতার ফলে জমির খাজনা ২৫ টাকা অবধি উঠে যাবে। ২৫ টাকার বেশি উঠবে না, কারণ তাহলেই চাষীর আয় ২৫ টাকার কম হয়ে যাবে এবং লোকসান হবে। ফলে সে হয় অন্য জমি চাষ করবে, নয় তার পুঁজি ২৩ টাকা অন্যভাবে খাটাবে। কিন্তু খাজনা বাড়তি আয়ের সমান থাকে তখনই, যখন- (১) চাষীদের ভেতর

প্রতিযোগিতা থাকে, (২) জমিদার খাজনা বেশি চাইলে চাষীরা অন্য জমি দেখে নিতে পারে বা অন্য কাজে চলে যেতে পারে। চাষীদের ভেতর সাধারণ প্রতিযোগিতা যথেষ্ট দেখা যায়, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে, যেখানে চাষবাসই হচ্ছে লোকের প্রধান জীবিকা এবং লোকসংখ্যা খুব বেশি। এই প্রতিযোগিতার প্রচণ্ডতায় চাষীদের ভেতর দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনোখুনি ও মামলা-মোকদ্দমা লেগেই থাকে। কিন্তু চাষীদের অন্য কোনো রকম কাজের সুবিধা না থাকলে এবং চাষীদের সংখ্যার তুলনায় জমির অভাব থাকলে, জমিদার জমির খাজনা বাড়তি আয়ের চেয়েও বাড়িয়ে দিতে পারে। এরকম অবস্থায় জমিদার যে শুধু স্বাভাবিক মুনাফার অংশটা নিয়ে নেয়– তা নয়, আরও অনেক বেশি দাবি করে। চাষীর বাঁচবার দ্বিতীয় উপায় কিছু থাকে না বলে নিজের আয় থেকে জমিদারকে এই অংশটা তাকে দিতে হয়। এর ফলে তার বাঁচার জন্য সবচেয়ে যতো কম আয় দরকার তা-ও তার থাকে না এবং সে জন্যই কিছুদিনের ভেতর সে দেনায় ডুবে যেতে বাধ্য হয়।

পুঁজিবাদের যুগে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হওয়ার ফলে ও ব্যবসা সঙ্কটের ফলে হাজার হাজার লোক বেকার থাকতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় চাষীরা যে অন্য কাজের দিকে চলে যাবে, তা আর সম্ভব হয় না। বাধ্য হয়েই তাদের চাষের কাজে থাকতে হয়। এই সুযোগ নিয়ে জমিদার তার শোষণ বাড়িয়ে দেয়। তাই চাষীদের দুরবস্থা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। শুধু যে জমিদারের খাজনা দিয়েই সে নিষ্কৃতি পায় তা নয়, নানা রকম কর তার উপর চাপানো হয়। খাজনার ভার, দেনার দায়, জমিদারের কর্মচারীদের বেআইনি আদায় ইত্যাদির বোঝা, আর হাজার হাজার রকমের শোষণ চাষীর জীবনকে দুঃসহ করে তোলে।

[চৌদ্দ]

ব্যবসা–সঙ্কট ও বেকার

যে কোনো রকম সমাজই হোক না কেন, তাতে বেঁচে থাকতে হলে শুধু একবার জিনিসপত্র উৎপাদন করে শেষ করে দিলে চলে না, বারে বারে উৎপাদন দরকার হয়। কারণ জিনিসপত্র একদিকে যেমন উৎপাদিত হতে থাকে, তা নষ্টও হয়ে যায়। এই সব জিনিসপত্র যেমন নষ্ট হয়, তেমনই তা আবার পূরণ করা দরকার। উৎপাদন সেই জন্য একটা স্রোতের মতো চলতে থাকে। এই

রকম বারে বারে উৎপাদনকে বলে **পুনরুৎপাদন**। পুনরুৎপাদন দু'রকম হতে পারে, **সরল পুনরুৎপাদন** এবং **বর্ধিত পুনরুৎপাদন**। যে পরিমাণ জিনিসপত্র প্রতি বছর ক্ষয় হয়ে যায়, শুধু সেই পরিমাণ জিনিসপত্রই যদি তৈরি হয়, তাহলে তাকে বলে সরল পুনরুৎপাদন। আর যদি উৎপাদন তার চেয়ে বেশি হয় এবং প্রত্যেক বছর বেড়ে যেতে থাকে, তাহলে তাকে বলে বর্ধিত পুনরুৎপাদন। যে সব সমাজ বহুদিন ধরে সভ্যতার একই স্তরে রয়েছে, সেই সব সমাজের শুধু সরল উৎপাদান দেখা যায়। সরল উৎপাদন সেইজন্য সমাজের রীতি নয়, বর্ধিত উৎপাদনই সাধারণত সমাজে হয়ে থাকে।

সরল উৎপাদনই হোক আর বর্ধিত উৎপাদনই হোক, যে সব জিনিসপত্র উৎপাদিত হয় সেগুলোকে আমরা দু' ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম বিভাগে পড়ে সে সব জিনিসপত্র যা আমাদের অভাব পূরণের জন্য আমরা প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করি। এগুলোকে বলা হয় **ব্যবহারিক দ্রব্য**। যেমন ভাত, কাপড়, ঘর, বাড়ি, চেয়ার, টেবিল, ফুটবল, সিনেমা ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে, ঐ সব ব্যবহারিক দ্রব্য তৈরি করতে যে সব জিনিসপত্র দরকার হয় তা, যেমন যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, কাঁচামাল, জমিজমা, খনি ইত্যাদি। এগুলোর নাম হচ্ছে **উৎপাদন যন্ত্র**। উৎপাদন যন্ত্র তৈরির বিভাগ এবং ব্যবহারিক দ্রব্য তৈরির বিভাগ বারে বারে না লিখে এদের জন্য আমরা দুটো সঙ্কেত ব্যবহার করবো। উৎপাদন যন্ত্র উৎপাদন বিভাগের জায়গায় লিখবো I (উচ্চারণ-আই)। আর ব্যবহারিক পণ্যের বদলে লিখবো II (উচ্চারণ-পাই)। মনে করো, কোনো পুঁজিবাদী এক বছরে যতো উৎপাদন করালো তাতে তার খরচ পড়লো-

যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি অপরিবর্তনশীল
পুঁজি বাবদ = ৪০০ টাকা

মজুরদের মজুরি বাবদ (অর্থাৎ পরিবর্তনশীল
পুঁজি বাবদ) = ৩০০ টাকা

মোট = ৭০০ টাকা।

মনে করো, এই মোট ৭০০ টাকা খরচ করে ৩০০ টাকার বাড়তি মূল্য তৈরি হলো। তার মোট মূল্য হবে-

পরিবর্তনশীল পুঁজি - ৩০০ টাকা
অপরিবর্তনশীল - ৪০০ টাকা
ও বাড়তি মূল্য - ৩০০ টাকা

মোট - ১,০০০ টাকা

সমাজে প্রত্যেক বছর মোট যতো উৎপাদন যন্ত্র তৈরি হয়, তার মূল্য হবে যতোখানি কলকব্জা, কাঁচামাল ইত্যাদি অপরিবর্তনশীল পুঁজির মূল্য উৎপাদন যন্ত্রের ভেতর চলে গেছে। ও যতোখানি শ্রমশক্তির মূল্য অর্থাৎ মজুরি হিসেবে দেওয়া হয়েছে এবং যতোখানি বাড়তি মূল্য তৈরি হয়েছে, তা একসঙ্গে যোগ করলে যতো হবে- তার সমান। অতএব কারখানায় মোট যতো জিনিসপত্র তৈরি হবে তার মূল্য ১,০০০ টাকা।

সুতরাং উৎপাদন যন্ত্রের মোট মূল্য হবে = অপরিবর্তনশীল পুঁজি+পরিবর্তনশীল পুঁজি+বাড়তি মূল্য।

তেমনি ব্যবহারিক পণ্য যতো কিছু তৈরি হলো তার মূল্যও হবে, সেসব তৈরি করতে মোট অপরিবর্তনশীল পুঁজি কতোটা খরচ হলো, কতোটা পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসেবে ব্যয়িত হলো ও কতোখানি বাড়তি মূল্য তৈরি হলো, তার উপর।

সুতরাং ব্যবহারিক পণ্যের মোট মূল্য = অপরিবর্তনশীল পুঁজি+পরিবর্তনশীল পুঁজি+বাড়তি মুল্য।

প্রত্যেক বছর পুঁজিবাদীরা যে বাড়তি মূল্য পায় তার কিছুটা নিজেদের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ এবং বিলাসিতার জন্য ব্যয় করে। এই অংশটা দিয়ে তারা নানা রকম ব্যবহারিক দ্রব্য কেনে। বাকি যেটা থাকে সেটা তারা আবার ব্যবসায়ে খাটায় নতুন পুঁজি হিসেবে। এই নতুন পুঁজি আবার দু'রকম ভাবে ব্যবহার করে; একটা অংশ দিয়ে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অপরিবর্তনশীল পুঁজি কেনে, আর একটা অংশ পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসেবে মজুরদের শ্রমশক্তি কিনতে খরচ করে।

I বিভাগে যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। এই যন্ত্রপাতি কেনে কারা? কিছুটা কেনে I বিভাগের পুঁজিবাদীরাই। তাদের কিছুটা কিনতে হয় নিজেদের কারখানার কলকব্জা যে সব ক্ষয় হয়ে গেল, তা পূরণ করবার জন্য এবং নতুন পুঁজি যেটা তারা ব্যবসায়ে খাটাতে চাচ্ছে তার জন্য অপরিবর্তনশীল অংশটা দিয়েও কিছু যন্ত্রপাতি কেনে। এইরূপে I বিভাগের মধ্যেই পুরাতন যন্ত্রপাতি ক্ষয়পূরণ করার জন্য এবং নতুন যন্ত্রপাতি বসাবার জন্য I বিভাগের তৈরি যন্ত্রপাতি কিছুটা বিক্রি হয়ে যায়। বাকি যেটা থাকে সেটা তাদের II বিভাগের পুঁজিবাদীদের কাছে বিক্রি করতে হবে। নতুবা এই সব যন্ত্রপাতি আর বিক্রি হবে না। II বিভাগ তৈরি করে ভাত, কাপড় ইত্যাদি ব্যবহারিক দ্রব্য। এদের জিনিস কেনে কারা? কিছুটা II বিভাগের লোকেরাই কেনে। বাকিটা তাদের বিক্রি করতে হয় I বিভাগের কাছে।

এখন I বিভাগ যতো মূল্যের যন্ত্রপাতি II বিভাগের কাছে বিক্রি করতে চাইছে,

II বিভাগ যদি ঠিক ততো মূল্যের খাবার-দাবার, ধুতি, শাড়ী ইত্যাদি I বিভাগের কাছে বিক্রি করতে চায়, তাহলেই দু'বিভাগেরই সব জিনিসপত্র বিক্রি হয়ে যাবে। নতুন এক বিভাগ যদি অন্য বিভাগের চেয়ে বেশি মূল্যের জিনিস তৈরি করে ফেলে, তাহলেই আর তাদের সমস্ত জিনিস বিক্রি হবে না। কিছু জিনিস অবিক্রিত থেকে যাবে। ফলে এই বিভাগের পুঁজিবাদীদের লোকসান হবে। তখন পুঁজিবাদীরা উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে মজুর ছাঁটাই করে দেবে এবং কারখানা বন্ধ করে দেবে। মজুর ছাঁটাই করে দিলে বা মজুরদের মাইনে কমিয়ে দিলে, তারা জিনিসপত্র কিনতে পারবে না। কারণ, চাকরি না থাকলে পকেটে পয়সা থাকে না। আর পকেটে পয়সা না থাকলে জিনিসপত্র কিনবে কোত্থেকে? কাজেই বাজারে যেটুকুও বা জিনিসপত্র আগে বিক্রি হচ্ছিলো, তখন তা আরও কম বিক্রি হতে থাকবে। মজুররা বেকার হয়ে গেলে II বিভাগের জিনিসপত্র বিক্রি কমে যাবে। কারণ, মজুররা ভাত-কাপড়, চাল-ডাল ইত্যাদি ব্যবহারিক দ্রব্যই বেশি কেনে। এমন অবস্থায়ই এই সব জিনিস বাজারে অবিক্রীত পড়ে থাকতে দেখা যায়। এ জিনিসগুলো বিক্রি না হলে II বিভাগের পুঁজিবাদীদের লোকসান হতে থাকে। তখন তারা কারখানা বন্ধ করে দেয়। ফলে কলকব্জা বিক্রিও কমে যায় এবং I বিভাগের পুঁজিবাদীদেরও লোকসান হতে থাকে। তখন I বিভাগের পুঁজিবাদীরা তাদের কারখানা বন্ধ করে দিতে এবং উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ফলে সেখানকার মুজররাও বেকার হয়ে পড়ে। তখন তারা II বিভাগের যে সব জিনিসপত্র কিনতো, তা আর কিনতে পারে না। ফলে II বিভাগের যেটুকুও বা উৎপাদন হচ্ছিলো তা-ও বন্ধ হয়ে যেতে থাকে এবং আরো বেশি শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এইরূপে ব্যবসা-সঙ্কট ও বেকার ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

পুঁজিবাদীর উৎপাদনের একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফা। সুতরাং উৎপাদন যন্ত্র বা ব্যবহারিক দ্রব্য যা-ই সে উৎপাদন করুক, বাজারে বেচতে হবে। বাজারে বেচতে পারলেই বাড়তি মূল্য যেটা উৎপাদিত হলো তা টাকায় রূপান্তরিত হবে, এবং যতো টাকা ব্যবসায় লাগিয়েছিলো, তার চেয়ে অনেক বেশি টাকার আওয়াজ শুনে মনে মনে সে প্রচুর আনন্দ পাবে।

কিন্তু বাজারে বেচতে গিয়ে পুঁজিবাদীদের মাঝে বড় মুশকিলে পড়তে হয়। সেই মুশকিলটাই আমরা এবার দেখবো।

পূর্বেই বলেছি I বিভাগে যন্ত্রপাতি তৈরি হয়। তার কিছুটা I বিভাগেই বিক্রি হয়ে যায়। বাকিটা কিন্তু বিক্রি করতে হয় II বিভাগের কাছে। II বিভাগ তৈরি করে ভাত, কাপড় ইত্যাদি। এগুলোর কিছুটা II বিভাগের লোকরাই কেনে।

বাকিটা তাদের বিক্রি করতে হয় I বিভাগের লোকদের কাছে।

I বিভাগে যতো বাড়তি মূল্য সৃষ্টি হয়, তার পরিমাণ মনে করো ৩০০ টাকা। এই তিনশ' টাকার ১০০ টাকা পুঁজিবাদী নিজের ও পরিবারের জন্য খরচ করে, ১০০ টাকা নতুন শ্রমশক্তি কিনবার জন্য খরচ করে অর্থাৎ মজুরি দেয় এবং বাকি ১০০ টাকায় যন্ত্রপাতি কেনে। মনে করো, পুঁজিবাদীর যে পুরাতন যন্ত্রপাতি খরচ হয় তার পরিমাণ ৪০০ টাকা এবং পুরানো শ্রমশক্তির মজুরি হিসাবে ৩০০ টাকা খরচ করে। সুতরাং I বিভাগে, অর্থাৎ উৎপাদন-যন্ত্র বিভাগে, যেসব পণ্য তৈরি হয় তার মোট মূল্য হলো-

	যন্ত্রপাতি	(C)	-	৪০০ টাকা
	শ্রমশক্তি	(V)	-	৩০০ টাকা
বাড়তি মূল্য	পুঁজিবাদীর খরচ	(a)	-	১০০ টাকা
	নতুন শ্রমশক্তি	(bv)	-	১০০ টাকা
	নতুন যন্ত্রপাতি	(bc)	-	১০০ টাকা
		মোট	**-**	**১,০০০ টাকা।**

II বিভাগে, অর্থাৎ ব্যবহারিক পণ্য বিভাগেও, এইরূপ উৎপাদিত ব্যবহারিক দ্রব্যের মোট মূল্য মনে করো,

	যন্ত্রপাতি	(C)	-	২০০ টাকা
	শ্রমশক্তি	(V)	-	২০০ টাকা
বাড়তি মূল্য	পুঁজিবাদীর খরচ	(a)	-	৫০ টাকা
	নতুন শ্রমশক্তি	(bv)	-	৫০ টাকা
	নতুন যন্ত্রপাতি	(bc)	-	১০০ টাকা
		মোট	**-**	**৬০০ টাকা।**

এখন দেখা যাক, I বিভাগের ১০০০ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি তারা কাদের কাছে কতো বিক্রি করতে পারে এবং II বিভাগের ৬০০ টাকা মূল্যের ব্যবহারিক দ্রব্য

কোথায় কতো বিক্রি হতে পারে। I বিভাগের উৎপাদিত ১,০০০ টাকার পণ্যের ভেতর I বিভাগের ভেতরই পুরাতন যন্ত্রপাতি পূরণের জন্য ৪০০ টাকা এবং নতুন যন্ত্রপাতির জন্য ১০০ টাকার পণ্য বিক্রি হয়ে যেতে পারে। ১,০০০ টাকার ভেতর তাহলে ৫০০ টাকার মূল্যের যন্ত্রপাতি I বিভাগের ভেতরই বিক্রি হয়ে যায়। বাকি ৫০০ টাকার যন্ত্রপাতি তাকে II বিভাগের কাছে বিক্রি করতে হয়।

II বিভাগের ৬০০ টাকার ব্যবহারিক দ্রব্যের ভেতর II বিভাগের পুঁজিবাদীরাই কেনে ৫০ টাকার। পুরাতন শ্রমিকরা কেনে ২০০ টাকার এবং নতুন শ্রমিকেরা কেনে ৫০ টাকার দ্রব্য। সুতরাং II বিভাগের উৎপাদিত ৬০০ টাকা ব্যবহারিক দ্রব্যের ভেতর II বিভাগের ভেতরই বিক্রি হয়ে যায় ৩০০ টাকার দ্রব্য। বাকি ৩০০ টাকার দ্রব্য তাকে বিক্রি করতে হয় I বিভাগের কাছে।

সুতরাং, I বিভাগ যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে চায় ৫০০ টাকার II বিভাগের কাছে। আর II বিভাগ ৩০০ টাকার ব্যবহারিক দ্রব্য বিক্রি করতে যায় I বিভাগের কাছে। ফলে II বিভাগের ৩০০ টাকার ব্যবহারিক দ্রব্য বিক্রি হয়ে যায় I বিভাগের কাছে এবং I বিভাগের ৩০০ টাকার যন্ত্রপাতি বিক্রি হয়ে যায় II বিভাগের কাছে। সুতরাং II বিভাগের সমস্ত পণ্যই বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু I বিভাগের ২০০ টাকার পণ্য অবিক্রিত থেকে যায়। ফলে I বিভাগের পুঁজিবাদীদের এই ২০০ টাকা লোকসান হয়। উৎপাদিত সব যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে না পারলে তখন তারা উৎপাদন কমিয়ে দেবে। অর্থাৎ অনেক মজুর ছাঁটাই করে দেবে, এবং যারা থাকবে তাদের বেতনও কমিয়ে দেবে। ফলে মজুরদের আয় কমে যাবে। আগে তারা ব্যবহারিক দ্রব্য ভাত, কাপড় ইত্যাদি যা কিনছিলো, তা আর কিনতে পারবে না। কাজেই II বিভাগের অনেক জিনিস অবিক্রিত থেকে যাবে এবং তারা লোকসান দিতে থাকবে। ফলে সেখান থেকেও মজুর ছাঁটাই ও বেতন কমানো হবে এবং যতোই এই মজুর ছাঁটাই ও বেতন কমানো চলবে, ততোই মজুরের আয় কমে যাবে ও তারা বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারবে না। ফলে আরো বেশি পরিমাণ জিনিসপত্র বাজারে অবিক্রিত হয়ে পড়ে থাকবে। কিছুদিনের ভেতর এতো বেশি জিনিসপত্র বাজারে জমা হয়ে উঠবে যে বাধ্য হয়ে II বিভাগের পুঁজিবাদীরা কারখানা বন্ধ করে দেবে। ফলে, I বিভাগের তৈরি যন্ত্রপাতি তারা আর কিনবে না, এবং I বিভাগেও লোকসান যেতে থাকবে। তখন তারা কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। এইরূপে একদিকে যেমন অবিক্রিত জিনিসপত্র বাজার বোঝাই হয়ে থাকবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কেনার ক্ষমতা না থাকায় হাজার হাজার বেকার

মজুরকে না খেয়ে তিলে তিলে মরতে হবে। একদিকে যেমন কারখানা, কলকজা, কাঁচামাল স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকবে, অন্যদিকে মজুররা কাজের অভাবে না খেতে পেয়ে মরবে। বেকার মজুর আর অচল কারখানা, মজুত খাদ্যদ্রব্য আর ক্ষুধার্ত মানুষ পাশাপাশি অবস্থান করবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার পরিণতিকে বলে **ব্যবসা-সঙ্কট**। I বিভাগ ও II বিভাগের উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না বলে এইরূপ বিপর্যয় ঘটে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথায় এইরূপ I ও II বিভাগের উৎপাদনের মধ্যে অসামঞ্জস্য যে আকস্মিকভাবে হয়- তা নয়। বরং তা সামঞ্জস্য হওয়াটাই বেশি আকস্মিক। কারণ, আমরা আগে দেখেছি, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- উৎপাদনযন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও মুনাফার জন্য উৎপাদন। উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত অধিকার থাকে বলে পুঁজিবাদীরা যার যেমন খুশি জিনিসপত্র তৈরি করায়। ফলে I বিভাগে কতো পরিমাণ উৎপাদন হবে এবং II বিভাগে কতো পরিমাণ উৎপাদন হবে তার কিছুই ঠিক থাকে না। শুধু তাই নয়, কোন্ ব্যবসায়ে কতো পরিমাণ নতুন পুঁজি খাটাবে তা-ও পুঁজিবাদীর নিজের খেয়ালের উপর নির্ভর করে। ফলে I বিভাগের কতোটা নতুন পুঁজি খাটবে এবং II বিভাগেই বা কতোটা খাটবে তার কিছু স্থিরতা থাকে না। I বিভাগে নতুন পুঁজি বেশি খাটলে, I বিভাগে উৎপাদন বেশি হয়ে যায়। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি বেশি তৈরি হয়ে যায়। আর II বিভাগে নতুন পুঁজি খাটলে II বিভাগের উৎপাদন, অর্থাৎ কাপড় চোপড়, জুতো, খাবার ইত্যাদি বেশি তৈরি হয়ে যায়। I বিভাগে উৎপাদন বেশি হলে যন্ত্রপাতি অবিক্রিত হয়ে থাকে এবং ব্যবসা-সঙ্কট এখান থেকে শুরু হয়, আর II বিভাগের উৎপাদন বেশি হলে কাপড় চোপড় ইত্যাদি ব্যবহারিক দ্রব্য অবিক্রিত পড়ে থাকে এবং এই সব জিনিসপত্র তৈরি কারখানা থেকে ব্যবসা-সঙ্কট আরম্ভ হয়। কিন্তু যেখান থেকেই আরম্ভ হোক, একবার আরম্ভ হলে দেখতে দেখতে দাবানলের মতো দাউ দাউ করে তা সমস্ত কারখানায় কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসা-সঙ্কটের ধাক্কা শুধু যে কলকারখানাগুলোর উপরই পড়ে তা নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, রেল-চলাচল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি উৎপাদনের যাবতীয় ক্ষেত্রে ব্যবসা-সঙ্কটের বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়ে পড়ে। কেনাবেচা কমে যায় ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে আসে. মাল চলাচল কমে যায় বলে রেল ও জাহাজ কোম্পানি লোকসান দিতে থাকে। ব্যাঙ্কের লাভ হয় পুঁজিবাদীদের টাকা ধার দিয়ে; পুঁজিবাদী ব্যবসা-সঙ্কটের ফলে কারখানা বন্ধ করে দেয়, তাই ব্যাঙ্কের টাকা আর শোধ দিতে পারে না। তখন ব্যাঙ্কও ফেল পড়ে। এইরূপে চারিদিকে একটা সঙ্কট দেখা দেয়।

তাছাড়া লাভের জন্য উৎপাদন করে বলে, পুঁজিবাদীরা মজুরদের মজুরি কিছুতেই বেশি দিতে চায় না। কারণ মজুরি যতো বেশি দেবে, মুনাফা ততো কমে যাবে। কিন্তু মজুরি কম দেওয়ার ফলে মজুরেরা কাপড়-চোপড় জুতো, জামা, খাবার-দাবার ইত্যাদি ব্যবহারিক দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে কিনতে পারে না। অপরদিকে মজুরদের মাইনে যতো কম দেবে পুঁজিবাদীদের ততো বেশি লাভ হবে এবং যতো বেশি তাদের লাভ হবে ততো বেশি টাকা তারা নতুন পুঁজি হিসেবে খাটাবে। যতো পুঁজি খাটাবে ততো উৎপাদন বেড়ে যাবে। এইরূপে একদিকে উৎপাদন ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলবে, অপরদিকে মজুরের বেতন কম থাকার ফলে, মজুরদের কেনার ক্ষমতা তেমন বাড়বে না। ফলে ব্যবহারিক দ্রব্য অনেক অবিক্রিত থাকবে এবং এই বিভাগে ব্যবসা-সঙ্কট আরম্ভ হবে। এই বিভাগে ব্যবসা-সঙ্কট আরম্ভ হলে তা কিছুদিনের মধ্যেই যন্ত্রপাতি উৎপাদন বিভাগেও ছড়িয়ে পড়বে এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত উৎপাদন ক্ষেত্রেই সঙ্কট দেখা দেবে।

ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পুঁজিবাদীরা কী উপায় অবলম্বন করে? মুনাফা হয় না বলেই পুঁজিবাদীরা কলকারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। সুতরাং কোনো রকমে যদি মুনাফার হার বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই লাভের আশায় পুঁজিবাদীরা আবার কলকারখানা খুলবে। শ্রমিকরা আবার কাজ পাবে এবং ব্যবসা-সঙ্কট দূর হবে। কিন্তু আমরা জানি, মুনাফার হার নির্ভর করে বাড়তি মূল্যের হার এবং কারখানার যান্ত্রিক সংগঠনের উপর। বাড়তি মূল্যের হার যতো বেশি হয় মুনাফার হার ততো বেশি হয় এবং যান্ত্রিক সংগঠন যতো বেশি হয় মুনাফার হার ততো কমে। সুতরাং মুনাফার হার বাড়ানোর জন্য পুঁজিবাদীরা উৎপাদন-সংগঠনের উন্নতি করবে, শ্রমের ঘনত্ব বাড়ে এমন সব উৎপাদন প্রথা, শ্রমবিভাগও কলকজ্জা চালু করবে। সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক সংগঠন কমানোর জন্য যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দেবে এবং পুঁজি বিদেশে চালান দিতে চেষ্টা করবে এবং বাজার খালি করার জন্য উৎপাদিত পণ্য নষ্ট করে দেবে।

সাধারণত তিন রকম উপায়ে পুঁজিবাদীরা ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করতে থাকে। প্রথমত, অবিক্রিত জিনিসপত্র নষ্ট করে দিয়ে, গম পুড়িয়ে দিয়ে, শস্য সমুদ্রের জলে ঢেলে দিয়ে, যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলে। এইভাবে গত ১৯৩০-৩৩ সালের ব্যবসা-সঙ্কটের সময় কতো কোটি কোটি মণ গম পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, কতো কোটি কোটি মণ কফি আমাজোনা নদীতে ঢালা হয়েছে, কতো ফলমূল, কমলালেবু যে আটলান্টিকের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে- তার হিসাব নেই। অথচ এই সময়েই এক আমেরিকাতেই ১৩০ লাখ মজুর বেকার

হয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে কী কষ্টে যে অর্ধাহারে-অনাহারে ভিক্ষা করে দিনপাত করছিলো, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ঐ সব অবিক্রিত জিনিসপত্র ক্ষুধার্ত মজুর ও তাদের শিশুদের বিনা পয়সায় দিয়ে দিলে বাজার নষ্ট হয়ে যেত।

ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, এইসব অবিক্রিত মাল বিদেশের বাজারে, বিশেষ করে কলোনির বাজারে বিক্রি করা চেষ্টা করা। এই উদ্দেশে বিদেশি বাজার দখল করার জন্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর ভেতর পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এই প্রতিযোগিতার ফলে বিদেশি মাল যাতে দেশে ঢুকে দেশের বাজা দখল করে নিতে না পারে, তার জন্য বিদেশি আমদানির উপর উচ্চ হারে **মাশুল বা ট্যাক্স** বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশই উচ্চ মাশুল বসিয়ে দেওয়ায় একদিক দিয়ে কারো বিশেষ সুবিধা হয় না। শুধু কে কতো বেশি মাশুল বসাতে পারে তার একটা 'রেস' চলে।

বিদেশি বাজার দখল করার আরেকটা উপায় হচ্ছে **দেশের টাকার মূল্য কমিয়ে দেওয়া**। ইংরেজিতে একে বলে depreciation of currency। মনে করো, একটা ডলারে যতোখানি সোনা আছে তার মূল্য ৩ টাকা। ডলারের মূল্য অর্ধেক করে দেওয়া হলো, অর্থাৎ ডলারের সোনার পরিমাণ অর্ধেক করে দেওয়া হলো। ফলে এক ডলারের মূল্য এখন হবে ১.৫০ টাকা। সুতরাং আগে আমেরিকার যে জিনিসের মূল্য ছিলো ১ ডলার অর্থাৎ ৩.০০ টাকা, এখন সেটা ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রি হবে ১.৫০ টাকা। ফলে আমেরিকার জিনিসপত্রের দাম ভারতবর্ষে অর্ধেক হয়ে যাবে এবং সস্তা হয়ে যাবার জন্যে লোকে অন্য দেশের জিনিস না কিনে আমেরিকার জিনিস কিনবে। কিন্তু আমেরিকার দেখাদেখি সব দেশই এই রকম তাদের দেশের টাকার মূল্য কমিয়ে দেবে। ফলে কারো কিছু লাভ হবে না।

বিদেশি বাজার দখল করার আরেক উপায়কে বলে **ডাম্পিং**। বিদেশি বাজার দখল করার জন্য পুঁজিবাদীরা সময় সময় পড়তা অপেক্ষা কম দরে বিদেশের বাজারে জিনিস বিক্রি করার চেষ্টা করে এবং এইভাবে যে লোকসানটা হয় তা তাদের ক্রেতাদের কাছ থেকে বেশি দাম আদায় করে ও মজুরদের কম মজুরি দিয়ে পুষিয়ে নেয়। এইভাবে বিদেশের বাজার দখল হবার পর অবশ্য এরা আবার দাম চড়িয়ে ঘাটতি মুনাফা সুদে-আসলে তুলে নেয়। এই রকমভাবে ব্যবসা-সঙ্কটের ফলে প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশের পরস্পরের সঙ্গে রেশারেশি চলে এবং এই রেশারেশি শেষে একদিন রক্তারক্তিতে গিয়ে দাঁড়ায়।

ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তৃতীয় উপায় হচ্ছে, **রেশনেলাইজেসন (rationalisation)** বা উৎপাদন-সংগঠনের উন্নতি। রেশনেলাইজেসনের মানে

হচ্ছে, কারখানার সংগঠনের উন্নতি করে উৎপাদনের পড়তা কমিয়ে ফেলা। এতে এমন সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও ব্যবহার করা হয়, যাতে করে শ্রমিকের পরিশ্রমের ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং অল্প সময় খাটিয়ে তাদের কাছ থেকে খুব বেশি কাজ আদায় করে নেয়া যায়। তারপর শ্রমবিভাগও এমন ভাবে করা হয় যাতে শ্রমিকের ১ সেকেন্ডও ফাঁকি দেওয়ার অবসর না থাকে। উদাহরণস্বরূপ **কনভেয়ার সিসটেমের** কথা বলা যায়। এই প্রথা অনুযায়ী মোটর গাড়ির কারখানার ছাদের কাছে মোটর ইঞ্জিনের কাঠামোটা একটা বেল্টের সাহায্যে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। এই ঝুলন্ত কাঠামোটা তারপর ধীরে ধীরে কারখানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ঘুরে আসে। নীচের শ্রমিকরা লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং প্রত্যেকের এক একটা কাজ ভাগ করা থাকে। যেমন কেউ হয় একটা স্ক্রু বসিয়ে দেয়; তারপরের শ্রমিক সেই স্ক্রুটাকে শক্ত করে এঁটে দেয় ইত্যাদি। মোটর গাড়ির কাঠামোটা যেমন যেমন চলতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মজুরদের এই অল্প সময়ের ভেতর তার নিজের কাজ শেষ করে দিতে হয়। যদি কোনো মজুর নিজের কাজ না করে কিংবা একটু অলসতা করে, তাহলে সমস্ত কারখানার কাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তাই সে কিছুতেই কাজে অলসতা করতে পারে না। মোটর গাড়ির কাঠামোটা যতো শীঘ্র চলে মজুরকেও ততো শীঘ্র হাত চালিয়ে কাজ শেষ করে দিতে হয়। এইরূপে মজুরের শরীর থেকে সমস্ত শ্রমশক্তিটুকু নিঃশেষে আদায় করে নিয়ে তবে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। উৎপাদনের সাংগঠনিক উন্নতির অন্য উপায় হচ্ছে, পুঁজিবাদীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর করে দিয়ে সব কোম্পানি মিলে একটা বড় কোম্পানি করে একচেটিয়া ব্যবস্থা স্থাপন করা। এই রকম একচেটিয়া কোম্পানি স্থাপন করতে পারলে, তার সবচেয়ে বড় সুবিধা হয় এই যে, মজুরদের খুব ভালো করে শোষণ করা যায়। মজুরদের এক জায়গায় থেকে চাকরি গেলে অন্য জায়গায় গিয়ে যে চাকরি নেবে সে সুবিধে আর থাকে না। কাজেই পেটের দায়ে বাধ্য হয়েই তাদের পুঁজিবাদীদের শর্তে কাজ করতে হয়। একচেটিয়া ব্যবসার দ্বিতীয় সুবিধা হচ্ছে, ক্রেতাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র বিক্রি করে বেশি দাম আদায় করা যায়। এইরূপে অপরের উৎপাদিত মূল্য একচেটিয়া পুঁজিবাদী আত্মসাৎ করোতে পারে। তৃতীয় সুবিধা হচ্ছে এই যে, সব পুঁজিপতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গভর্নমেন্টের উপর চাপ দিয়ে বিদেশি জিনিসের উপর শুল্ক ও অন্যান্য নানারকম সুবিধা আদায় করে নিতে পারে। মজুরদের উন্নতিমূলক সমস্ত আন্দোলনের বিরোধীতাও তারা ভালোভাবে করতে পারে। এই সব কারণে পুঁজিবাদীরা একজোট হয়ে একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপন করে।

এইরূপে উৎপাদিত যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারিক দ্রব্য নষ্ট করে দিয়ে ও মজুরদের কঠোরভাবে শোষণ করে পুঁজিবাদীরা ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করে। যথেষ্ট পরিমাণে জিনিসপত্র নষ্ট করে দেবার পর বাজার কিছুটা খালি হয়। বিদেশি জিনিসের উপর মাশুল বসিয়ে দেওয়ায় দেশের বাজার থেকে বিদেশি জিনিসপত্র বিতাড়িত হয় এবং 'উৎপাদনের সাংগঠনিক উন্নতি' করেও মজুরদের উপর শোষণ বাড়িয়ে দিয়ে জিনিসপত্র উৎপাদনের পড়তা কমিয়ে ফেলা হয়। ফলে কারখানার চাকা আবার আস্তে আস্তে ঘুরতে আরম্ভ করে। মজুররা কিছু কিছু কাজ পেতে থাকে এবং যতোই তারা কাজ পায় ততোই তাদের জিনিসপত্র কিনবার ক্ষমতা বাড়ে এবং বাজারে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়লে উৎপাদনও বাড়ে এবং মজুররা আরো বেশি কাজ পেতে থাকে ও চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে যায়। এইরূপে ব্যবসা-সঙ্কট দূর হয়ে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজারে খুব কেনাবেচা হয়, উৎপাদনও খুব বেড়ে যায়, এবং পুঁজিবাদীদের মুনাফাও বেড়ে যায়। ব্যবসা-সঙ্কট দূর হয়ে গিয়ে উৎপাদন, কেনাবেচা ও মুনাফার এতো দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়াকে বলা হয় ব্যবসা স্ফীতি (boom)। কিন্তু এই ব্যবসা-স্ফীতি বেশি দিন চলতে পারে না। পুঁজিবাদী উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে এগুলোও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অবশেষে হঠাৎ এমন একটা সময় আসে যখন ব্যবসা-স্ফীতি থেমে যায়। আবার ব্যবসা-সঙ্কট আরম্ভ হয়। এইরূপে ব্যবসা-স্ফীতি ও ব্যবসা-সঙ্কটের ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদী প্রথ তার ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রত্যেকবার ব্যবসা-সঙ্কট হলে ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার উপায়গুলো ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। কারণ, ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার উপায় আছে, যেমন বিদেশি বাজার দখল, মজুরদের শোষণ বাড়িয়ে দেওয়া, উৎপাদনের সাংগঠনিক উন্নতি, একচেটিয়া কোম্পানি করা, টাকার মূল্য কমিয়ে দেওয়া, এরকম সবগুলো উপায়েরই একটা সীমা আছে। যেমন, একবার একচেটিয়া কোম্পানি গঠন করে ফেললে নতুন করে একচেটিয়া কোম্পানি করার সুবিধা আর পাওয়া যায় না। বিদেশি বাজার দখল করে ফেললে, আবার নতুন করে যুদ্ধ ছাড়া বিদেশি বাজার দখল করা যায় না। এই সকল কারণেই ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়গুলো ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসতে থাকে। অপরদিকে উৎপাদনের সাংগঠনিক উন্নতি ক্রমেই বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণও খুব বাড়ে এবং অবিক্রিত জিনিসপত্রের পরিমাণও বেড়ে যায়। সুতরাং প্রত্যেক বারের ব্যবসা-সঙ্কট আগের ব্যবসা-সঙ্কটের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক, গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

বর্তমান যুগে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছে যে, ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় প্রায় শেষ হয়ে গেছে বললেই চলে। ১৯৩০ সাল থেকে যে ব্যবসা-সঙ্কট শুরু হয়েছিলো, তা থেকে এখনো পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা উদ্ধার পেয়েছে বলা যাবে না। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল অবধি উৎপাদন অবশ্য কিছুটা বেড়েছিলো, বেকারের সংখ্যা কিছুটা কমেছিলো। কিন্তু ১৯৩৮ সালে উৎপাদন কমে যেতে লাগলো, বেকারের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো। ফলে উদ্ধারের আর কোনো উপায় না পেয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে পুঁজিবাদীরা ব্যবসা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করেছিলো। সুতরাং দেখতে পাচ্ছো, যুদ্ধের অন্যান্য কারণের ভেতর ব্যবসা-সঙ্কটও একটা।

[পনেরো]

সাম্রাজ্যবাদী উৎপাদন

আমরা এগারো অধ্যায়ে দেখেছি যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পুঁজির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। প্রত্যেক কারখানা বা কারবার থেকে যে মুনাফা ওঠে তার একটা মোটা অংশ আবার কারখানায় বা কারবারে খাটাতে হয়, নতুবা প্রতিযোগিতায় অন্যান্য পুঁজিবাদীদের কাছে তাকে হেরে যেতে হয়। এইরূপে প্রতিযোগিতার ফলে পুঁজিবাদী কারবারের আকার ক্রমেই বর্ধিত হয়ে যেতে থাকে। ছোট কারখানা বড় কারখানা হয়ে পড়ে, যেখানে ১০০ মজুর কাজ করতো, সেখানে দেখতে দেখতে ১০০০ মজুর কাজ করতে থাকে। পুঁজি যেখানে ১০০০ টাকা ছিলো সেখানে ১০,০০০ টাকা হয়ে যায়। এই রকমভাবে বেড়ে ফেঁপে-ফুলে ওঠাটাই হচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদনের রীতি।

ছোট ছোট কোম্পানিগুলো বড় বড় কোম্পানিগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশি দিন টিকতে পারে না। বড় কোম্পানিগুলো নানান রকম উপায়ে তাদের গ্রাস করে ফেলে। বড় কোম্পানিগুলোর পুঁজি বেশি বলে পড়তার চেয়ে কম দামে লোকসান দিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করে। এতে ছোট পুঁজিওয়ালা প্রতিদ্বন্দ্বীরা বড় পুঁজিবাদীর কাছে হেরে যায় এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় পুঁজিপতির অধিকার তাতে একচেটিয়া হয়। তারপর অবশ্য মনের সুখে দাম চড়িয়ে বড়রা মোটা লাভ ঘরে তুলতে থাকে। কখনো কখনো টাকার জোরে গভর্নমেন্ট হাত করে, আইন করে ছোট কোম্পানিগুলোকে বড় কোম্পানির ভেতর চলে আসতে বাধ্য

করে। কখনো কখনো আবার তারা যাতে কাঁচামাল না পায় তার জন্য কাঁচামাল বিক্রি করে যে সব কোম্পানি, তাদের সঙ্গে গোপনে গোপনে বন্দোবস্ত করে নেয়। কখনো কখনো রেল কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করে, যাতে রেল কোম্পানি তাদের মাল চলাচলের কোনো ব্যবস্থা না করে। এমনকি গুণ্ডা লাগিয়ে ছোট কোম্পানির কারখানা বা গুদামে আগুন লাগিয়ে, বা বোমা ফাটিয়ে ছোট কোম্পানিকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। এইরকম সৎ-অসৎ সব রকম উপায়ে পুঁজিবাদীরা একচেটিয়া কারবার স্থাপন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। কারণ একচেটিয়া কারবার স্থাপন করলে একদিকে যেমন মজুরদের খুব নিংড়ে শোষণ করা যায়, অপরদিকে ক্রেতাদের কাছ থেকে বেশ ইচ্ছা মতো মোটা দাম আদায় করা যায় ও গভর্নমেন্টের উপর চাপ দিয়ে বিদেশের বাজার দখলের সব বন্দোবস্ত করা যায়। এই সকল কারণে এই যুগের পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে **একচেটিয়া কারবার**।

১৮৯০ সাল অবধি সর্বত্র প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের প্রাধান্য দেখা যায়। তারপর থেকে একচেটিয়া কারবাররের উৎপত্তি হতে আরম্ভ করে। আজ এই একচেটিয়া কারবারই পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার প্রধান রূপ হয়ে পড়েছে। এ যুগে যতো উৎপাদন হয় তার অধিকাংশই হয় একচেটিয়া কোম্পানিগুলো দিয়ে। যেমন ধরো, আমেকিরার যুক্তরাষ্ট্রে লোহার মোট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগই হয় ৪টা বড় বড় কোম্পানির দ্বারা। এলুমিনিয়াম উৎপাদন শতকরা ৯৫-১০০ ভাগই একটা প্রকাণ্ড কোম্পানি করে থাকে। রেডিও তৈরি শুধু একটা মাত্র কোম্পানিরই হাতে। এমনি ধারা প্রায় অধিকাংশ জিনিসপত্রের উৎপাদন প্রধানত বড় বড় কয়েকটা কোম্পানির হাতে সীমাবদ্ধ। শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নয়, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সব জিনিসপত্রের উৎপাদনই এইরূপে গোটা কয়েক বড় বড় কোম্পানির হাতে গিয়ে পড়েছে।

জার্মানিতে Verenigte Stalwerker নামে একটা মস্ত বড় একচেটিয়া কোম্পানি ১৯২৬ সালে গঠিত হয়েছিলো। এর হাতে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ লোহা ও ৪০ ভাগ ইস্পাতের উৎপাদন ছিলো। U.S Steel Coporation-এর হাতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোহা উৎপাদনের মোট শতকরা ৪৩ ভাগ ও ইস্পাত উৎপাদনের ৩৯ ভাগ ছিলো। ১৯১৬ সালে জার্মানিতে সোডা, এসিড ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো একত্রিত হয়ে I.G. Farbenindustrie নামে একটা কোম্পানি করে সবাই তাতে যোগ দেয়। এই কোম্পানির হাতে জার্মানির মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ বাতাস থেকে তৈরি নাইট্রিক এ্যাসিড, ১০০

ভাগ কয়লা থেকে উৎপাদিত পেট্রোল ও রঙ, ৪০ ভাগ ঔষধপত্র, ২৫ ভাগ কৃত্রিম সিল্ক ইত্যাদি ছিলো। গ্রেট ব্রিটেনের Imperial Chemical Industries-এর নাম পৃথিবীর সকলেই জানে। এই কোম্পানি ১৯২৬ সালে অনেকগুলো কোম্পানি এক হয়ে গিয়ে তৈরি হয়। এই কোম্পানি বিলেতের শতকরা ৯৫ ভাগ এসিড, সোডা ইত্যাদি মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্য ৯০ থেকে ১০০ ভাগ নাইট্রোজেন, ৪০ ভাগ রঙ ইত্যাদি তৈরি করে। জাপানেও মিৎসুই, মিৎসুবিশি, সুমিটোমা, স্যাসুডা ইত্যাদি কয়েকটি ধনী পরিবারের হাতে অধিকাংশ উৎপাদন সীমাবদ্ধ ছিলো। যেমন, ১৯৩০ সালে ২৫৩ লক্ষ টন কয়লার ভেতর ২৪২ লক্ষ টন কয়লাই 'সেকিটান কোগাইয়ো রেন্‌গোকাই' নামে মিৎসুই ও মিৎসুবিশিদের দ্বারা পরিচালিত একটা কোম্পানি উৎপাদন করেছিলো। এইরূপে উৎপাদনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজকাল এইরূপ বড় বড় কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার দেখতে পাওয়া যায়।

শুধু যে কারখানা-শিল্পে এইরূপ একচেটিয়া উৎপাদন এসে গেছে তা নয়, ব্যাঙ্কের ভেতরেও এই রকম দু'চারটে ব্যাঙ্কের প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়েছে। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলো প্রতিযোগিতায় বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে না পেরে হয় পাততাড়ি গুটিয়েছে, নয় বড় ব্যাঙ্কের শাখা হয়ে গেছে। এইরূপে বিলাতে ১৯০০ সালে মোট ব্যাঙ্ক ছিলো ৯৮টা, ১৯৩৬ সালে এই সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২৬ টাতে। তার ভেতর পাঁচটি ব্যাঙ্কের প্রতিপত্তি আবার এতো বেশি হয়ে গেছে যে এদের লোকে 'the big five' বলে এবং লেনদেনের ব্যাপারে এদের রাজত্ব অপ্রতিহত। তেমনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও ১৯১৪ সালে ছিলো ২৬,২৭৪টা ব্যাঙ্ক, এই সংখ্যা ১৯৩৬ সালে দাঁড়ায় ১৫,৭৫২টাতে। জাপানে ১৯১৪ সালে ১,১৫৫টা ব্যাঙ্ক, এই সংখ্যা ১৯৩৬ সাল দাঁড়ায় ৫৩৬টাতে। এই রকম করে বড় ব্যাঙ্কগুলো ছোট ব্যাঙ্কগুলোকে গিলে ফেলেছে এবং নিজেরা এক একটা দৈত্যের আকার লাভ করেছে।

ব্যাংক, কারখানা ও ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো এইরূপ প্রকাণ্ড দৈত্যের আকার ধারণ করে সময়ে সময়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রবল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এই সংগ্রামের পরিণতি হয় এই যে, এই দৈত্যগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে বৃহত্তর দৈত্যের সৃষ্টি করে।

শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্কের যারা কর্তা তারা ধীরে ধীরে কারখানা ও অন্যান্য কোম্পানিগুলোর উপর তাদের অধিকার বিস্তার করে ফেলে। কারণ, ব্যাঙ্কের কাছ থেকে এই সব কারখানা ও ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলোকে টাকা ধার করে কারবার চালাতে হয়। ফলে তারা ব্যাঙ্কের উপর অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে

এবং ব্যাঙ্ক এই সুযোগে কোম্পানির পরিচালকদের ভেতর নিজেদের আসন করে নেয় এবং অনেক সময় কোম্পানির শেয়ার কিনে কোম্পানিকে হাতের মুঠোর ভেতর এনে ফেলে। এইরূপে সমস্ত উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের মালিকদের প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়। কখনো কখনো আবার বড় বড় একচেটিয়া কোম্পানির মালিকরা ব্যাঙ্কের উপর অধিকার বিস্তার করে ফেলে। অনেক সময় এরা নিজেরাই তাদের পুঁজি বাড়াবার জন্য ব্যাঙ্ক খুলে দেয়। কখনো কখনো এদের লাভের একটা মোটা অংশ দিয়ে ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনে ফেলে। এর ফলে ব্যাঙ্কের উপর তাদের প্রতিপত্তি এসে যায়।

এভাবে সমাজে এক রকম মালিকশ্রেণী জন্মায় যাদের উৎপাদনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকে না, কিন্তু 'এ' ব্যাঙ্কের শেয়ার কেনে, 'ও' ব্যাঙ্কের শেয়ার বেচে, 'এ' 'ও' কোম্পানির শেয়ার নিয়ে কেনাবেচা করে ধীরে ধীরে সমস্ত উৎপাদন-কেন্দ্রের উপরই নিজের প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। এই শ্রেণীর পুঁজিবাদীরা সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকে এবং আড়াল থেকে টাকার খেলা খেলে প্রচুর লাভ করে। সমস্ত বড় বড় কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি ইত্যাদির পরিচালকের পদগুলো এদের একচেটিয়া থাকে। এই রকমভাবে সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক ভাগ্য অল্প কয়েকজন লোকের হাতে এসে পড়ে। যেমন আমেরিকার 'মরগান' ব্যাঙ্ক ১৯২৮ সালে মোট ৭,৪০০ কোটি ডলার মূল্যের বিভিন্ন ব্যবসা চালায়, তখন ৭২ বড় বড় কোম্পানি তাদের হাতে ছিলো। ১৯২৯ সালে ২৪জন বড় ব্যাঙ্কের মালিক ৪৩৮টা কারবারের পরিচালক ছিলো। একজন ব্যাঙ্কেরের হাতেই ছিলো ৪৭টা কারবার। একটা হিসাবে প্রকাশ, ১৫ জন লোক ২,১১৭ টা কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলো।

এই সকল তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, পুঁজিবাদী সমাজের ধন-সম্পত্তি যারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। নাৎসী জার্মানিতে ১০০ থেকে ১৪০ জন মাত্র লোক জার্মানিতে সমস্ত উৎপাদন-যন্ত্রের আসল ঘাঁটিগুলো দখল করেছিলো। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বার্লিনস্থ দূত গেরার্ড বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৬৪ জন লোক সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের ধন-সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। ফ্রান্সের অধিকাংশ উৎপাদন যন্ত্রের মালিক ২০০ পরিবারের কথা সকলের কাছে সুপরিচিত। এই ২০০ পরিবারের ভেতর ১০০ জন লোক সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এইরূপে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথা কয়েকজন লোককে অসাধারণ ধনী করিয়ে দিয়ে তাদের দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সর্বেস্বর্বা করে তোলে।

এমনি একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করার পর যে প্রচুর লাভ হতে থাকে, তা দেশের বাজারে খাটাবার সুযোগ থাকে না। কারণ দেশের বাজারে অবিক্রিত

পণ্যে বোঝাই হয়ে যাবার পরই একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। সুতরাং যে নতুন পুঁজি সৃষ্টি হয় সেটা বিদেশের বাজারে খাটাবার চেষ্টা চলতে থাকে। যে সব দেশের পুঁজিবাদ তেমন জেঁকে বসেনি, সেই অনুন্নত দেশে পুঁজি পাঠিয়ে সেখানকার কাঁচামাল থেকে পণ্য তৈরি করে বিক্রি করলে লাভ অনেক বেশি হয়। কারণ ঐ সব দেশে কাঁচামাল ও মজুরদের খুব সস্তায় পাওয়া যায়, আর মজুর আন্দোলন এই সব অনুন্নত দেশে তেমন শক্তিশালী থাকে না বলে মজুরদের শোষণ করাও যায় খুব আরামে ও শান্তিতে। ফলে ঐ সব অনুন্নত উপনিবেশ বা কলোনিতে পুঁজি রপ্তানি হতে থাকে। পুঁজিবাদের প্রথম যুগে রপ্তানি হয় পণ্য, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুগে পণ্য রপ্তানি কমে যায় এবং পুঁজি রপ্তানিই প্রধান হয়ে পড়ে। কারণ পুঁজি রপ্তানি করে বেশ ভালো সুদ পাওয়া যায় এবং পুঁজি রপ্তানিই প্রধান হয়ে পড়ে কারণ পুঁজি রপ্তানি করে বেশ ভালো সুদ পাওয়া যায় আর মুনাফাও ওঠে অনেক বেশি। কলোনিতে এই পুঁজি রপ্তানি করে তাদের উপকার করার ঝক্কি অবশ্য ব্যাঙ্কগুলোই গ্রহণ করে থাকে। এ ব্যাপারে অবশ্য নেতৃত্ব করে পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেষ্ঠ মানব ধন-কুবেররা। গ্রেট ব্রিটেনের ১৯২৯ সালে এরকম বিদেশি পুঁজির থেকে আয় হয়েছিলো ১২২ কোটি ডলার, যুক্তরাষ্ট্রের হয়েছিলো ৮৮ কোটি ডলার এবং জাপানের হয়েছিলো ৪১/৪ কোটি ডলার। গত যুদ্ধের ভেতর দিয়ে অবশ্য একটা আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। গ্রেটব্রিটেনের অধিকাংশ বিদেশি পুঁজি আমেরিকার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। যুদ্ধের পরে বিদেশের কাছে ধার দেওয়া টাকা আমেরিকারই সবচেয়ে বেশি হলো। ভারতবর্ষ পূর্বে বিলেতের কাছে টাকা ধার নিতো এবং ১৯২৯ সালে বিদেশি পুঁজির সুদ ও লাভ বাবদ মোট ১০ কোটি ডলার তাকে দিতে হয়েছিলো। যুদ্ধের জন্য বিলেতের কাছে ভারতবর্ষ এতো বেশি জিনিসপত্র বিক্রি করেছে যে, তার কাছে ভারতবর্ষের সমস্ত দেনা শোধ হয়েও প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা পাওনা হয়েছিলো।

পুঁজিবাদী দেশের ধন-কুবেররা যে শুধু নিজের দেশে একচেটিয়া ব্যবসা স্থাপন করে নিজেদের একাধিপত্য বিস্তার করে ফেলে তা নয়, অন্যান্য দেশের ধন-কুবেরদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে সমগ্র পৃথিবীটাকে নিজেদের ভেতর ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার চেষ্টা করে। এইরূপে ১৯২৯ সাল জার্মানির শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎ-সরবরাহ কোম্পানি Allegem Elecktrik Gesellscharft-এর সঙ্গে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎ-সরবরাহ কোম্পানি General Electric Company-র ২০ বছরের জন্য একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির হাতে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের, মধ্য

আমেরিকার এবং ক্যানাডার বাজার, আর জার্মান কোম্পানির হাতে থাকে মধ্য ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপের বাজার। এইরূপ আর একটি শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক একচেটিয়া কারবার ছিলো 'গ্লুল্যাম্প কারটেল'। জার্মানি, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, হল্যোন্ড, যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, সুইডেন, ইটালি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সমস্ত বাল্ব তৈরির কারখানাগুলো এই একচেটিয়া কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলো।

পেট্রোলের ব্যাপারে কয়েকটা বড় বড় আন্তর্জাতিক কোম্পানি পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা করে। পৃথিবীর তেলের বাজার প্রধানত এক্সন, রয়েল ডাচ শেল, টেক্সাকো, মোবিল ইত্যাদি কোম্পানির মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। আমেরিকা, ম্যাক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকায় সাধারণত, আমেরিকার এক্সন অয়েল কোম্পানির একচেটিয়া প্রতিপত্তি। সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ চীন, ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সুমাত্রা, যাভা, প্রভৃতি দেশে অয়েল ডাচ শেল ও ব্রিটিশ অয়েল কোম্পানিগুলিরই প্রতিপত্তি বেশি ছিলো। কিন্তু এখানে আমেরিকার এক্সন অয়েল কোম্পানি অনেক শেয়ার কিনে ফেলে তাদের কিছুটা হাত করে ফেলেছে।

এই সব বহুজাতিক কোম্পানিগুলি পৃথিবীর নিজেদের ভেতর ভাগ করে নেবার চুক্তি করলেও তাদের ভেতর প্রতিযোগিতা থামে না এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে তাদের চুক্তি বাতিল হয়ে গিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। কারণ কোনো দেশেরই উৎপাদন প্রথার উন্নতি আর সমস্ত দেশের সঙ্গে সমান তালে চলে না। কোনো কোনো দেশে নানা কারণে হঠাৎ কিছুদিন খুব দ্রুত উন্নতি হয়। আবার কোনো কোনো দেশে একেবারে পিছিয়ে পড়ে। কোনো দেশ হয়তো নতুন উৎপাদনের নতুন কোনো যন্ত্রপাতি তৈরি করে ফেললো, তার ফলে তাদের পড়তা হয়তো খুব কম হয়ে যাবে। তখন তারা দেখবে যে তারা অনায়াসেই তাদের বাজার আরো বাড়িয়ে ফেলতে পারছে। তখন আর কোনো চুক্তির ধার না ধেরে তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির বাজারে তাদের মাল হাজির করবে। এইরূপ অসমান উন্নতির ফলে বিভিন্ন দেশের একচেটিয়া ব্যবসায়ীরদের ভেতর কোনো চুক্তি বেশিদিন টেকে না এবং তাই কিছুদিনের ভেতরেই ভীষণ রকম প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে যায়। এই সমস্ত একচেটিয়া ধন-কুবেরদের যে শুধু তাদের দেশের সমস্ত উৎপাদন-প্রণালীর ও ধনসম্পত্তির উপর প্রতিপত্তি থাকে- তা নয়, দেশের গভর্নমেন্টেও তাদের হাতে থাকে। গভর্নমেন্টকে কোন পদের অধিকারী হবে তা তারা ঠিক করে দেয় এবং গভর্নমেন্টের ক্ষমতা তারা পুরোপুরি কাজে লাগায়। যখন অন্যান্য দেশের

ধন-কুবেরদের সঙ্গে প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, তখন গভর্নমেন্ট তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সব রকম চেষ্টা করে। এইরূপে যুদ্ধের আরম্ভ হয় এবং পৃথিবীর বাজার আবার বিভিন্ন একচেটিয়া ধন-কুবেরেরা নিজেদের ভেতর ভাগাভাগি করে নেয়।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে শুধু যে যুদ্ধের ফলে কোটি কোটি মানুষ মারা পড়ে ও মানুষের দুঃখভোগ চরমে ওঠে- তা নয়, শান্তির সময়েও সাধারণ লোকদের জীবন দারুণ অশান্তিতে ভরে যায়। ব্যবসা-সঙ্কট এসে স্থায়ী আকার ধারণ করে, ফলে হাজার হাজার শ্রমিক স্থায়ীভাবে বেকার হয়ে যায়। যারা কাজ পায় তাদের চাকুরিরও কোনো স্থায়ীত্ব থকে না। এতে অনিশ্চয়তা ও ব্যর্থতাবোধ কোটি কোটি লোকের জীবনকে বিষাক্ত ও দুর্বিষহ করে তোলে। কোটি কোটি লোককে যুদ্ধের যূপকাষ্ঠে হত্যা করে, কোটি কোটি লোকের জীবন বেকারত্বের গ্লানিতে ব্যর্থ করে দিয়ে, কোটি কোটি লোককে শোষণ-যন্ত্রে ফেলে পঙ্গু করে দিয়ে বর্তমান যুগের ধন-কুবেররা তাদের ধন-ভাণ্ডার বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করে।

অবশ্য শুধু এই নয় যে, উৎপাদন যন্ত্র তাদের হাতে পড়ে শোষণ-যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, এর চেয়েও সমস্যার কথা হলো উৎপাদন যন্ত্রকে তারা পুরোপুরিভাবে কাজে লাগায় না। পাছে উৎপাদন আরো বেড়ে গিয়ে ব্যবসা-সঙ্কট তীব্র করে তোলে। এইরূপে জার্মানিতে ১৯২৯ সালে মোট উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র শতকরা ৬৭ ভাগ ব্যবহৃত হতো। ১৯৩২ সালে মাত্র ৩৬ ভাগ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহৃত হচ্ছিলো। আমেরিকায় শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকে। অথচ যখন পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ খাওয়া-পরা ও থাকার অভাবে তিলে তিলে মরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যখন এই উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে মানুষের অভাব মোচন করা ও খাওয়া-পরার অভাব দূর করা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত দরকার, তখন এই ধন-কুবেররা তাদের একচেটিয়া ক্ষমতার বলে উৎপাদন বেশি হতে দেয় না- পাছে তাদের লাভ কমে যায় এই ভয়ে। সুতরাং এদের কাজ হচ্ছে অভাব সৃষ্টি করে মুনাফা উঠানো, অভাব পূরণ করা নয়।

এইরূপ পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী যুগে দেশের ভেতরে কয়েকটা বড় বড় ধন- কুবেরের সৃষ্টি হয়। তাদের হাতে দেশের সমস্ত উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক এসে পড়ে এবং এরা দেশে একচেটিয়া ব্যবসায়ের পত্তন করে। শুধু যে দেশে একচেটিয়া কারবার স্থাপন করেই এরা ক্ষান্ত হয়- তা নয়। অন্যান্য দেশের একচেটিয়া কারবারীদেরে সঙ্গে বোঝাপড়া করে আন্তর্জাতিক কারবার স্থাপন করে থাকে এবং সাময়িকভাবে পৃথিবীটাকে নিজেদের ভেতর

ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। কিন্তু ব্যবসা-সঙ্কটের ধাক্কায় ও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার উন্নতি হওয়াতে এই গোঁজামিল বেশি দিন টেকে না, বিশ্বের বাজার পুনর্বার ভাগ-বাটোয়ারা করার দাবি ওঠে। ফলে যুদ্ধ বাঁধে এবং যারা যুদ্ধে জিতে যায়, তারা পৃথিবীর বাজার দখল করে বসে। পৃথিবীর বাজার দখল করে এরা অনুন্নত দেশগুলোতে এদের পুঁজি পাঠাতে থাকে এবং সেখানকার লোকদের শোষণ করে মোটা রকমের মুনাফা ও সুদ ভোগ করতে থাকে। ফলে কিছুদিনের ভেতর এই সব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পুঁজিবাদীরা আসল উৎপাদনের দিকে আরো বেশি মনোযোগ না দিয়ে, কী করে কলোনির কাছ থেকে সুদ ও মুনাফা উঠাবে সেই দিকে নজর দেয় এবং দেখতে দেখতে এই সব দেশগুলোর বুর্জোয়া সুদখোরের জাতে পরিণত হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের মূল সমস্যা অর্থাৎ ব্যবসা-সঙ্কট, বেকার, যুদ্ধ ইত্যাদি কোনো সমস্যারই সমাধান করতে তো পারেই না, বরং এই সব সমস্যাগুলোকে আরো ঘোরতর আকারে বাড়িয়ে দেয়। ফলে নিজেদের দেশের মজুরদের আক্রমণে, অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর আক্রমনে ও তাদের অধীনস্থ কলোনির লোকদের আক্রমণে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী কাঠামো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ে এবং তার জায়গায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই হলো পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র পরিণতি।

[ষোলো]

বহুজাতিক কোম্পানি

বর্তমান যুগে সাম্রাজ্যবাদ কলোনিগুলোকে সরাসরি তাদের শাসন চালিয়ে অধীন করে রেখে শোষণ করে না, শোষণ করে বহুজাতিক কোম্পানির মারফত। কলোনিগুলোকে সরাসরি শাসন করার হাঙ্গামা অনেক, খরচও প্রচুর। তার থেকে অনেক সুবিধা এই সব দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর সাহায্যে ও সহযোগিতায় তাদের বাজার, শ্রমশক্তি ও প্রকৃতিক সম্পদ শোষণ করা। সরাসরি শাসন করতে গেলে সে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে এবং এই আন্দোলনের ফলে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী সচেতন হয়ে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শোষণ শুধু যে শেষ করে দিতে পারে- তা নয়, তাদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথারই অবসান ঘটিয়ে দিতে পারে। কাজেই আড়ালে থেকে দেশিয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সাহায্যে দেশের সম্পদ ও শ্রমশক্তি শোষণ করাই অনেক বেশি নিরাপদ। এতে করে

সাম্রাজ্যবাদের আসল কাজ- বিদেশ ও কলোনি থেকে সম্পদ ও শ্রমশক্তি শোষণ করা- সম্পূর্ণ বজায় থাকে। অথচ দেশ শাসন করার ঝক্কি কিছুই পোহাতে হয় না, বরং অনেক সহজে এইসব দেশের সম্পদ ও শ্রমশক্তি শোষণ করা যায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সাহায্যে। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে, পুঁজিবাদী কোম্পানিগুলো তাদের বর্ধিত পুঁজি আর দেশের বাজারে পুরোপুরি খাটাতে পারে না। তখন তারা বিদেশে বাজারের খোঁজে বের হয়। বিদেশে নানা প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা ও ব্যাঙ্ক খুলে বন-সম্পদ, খনি ও কাঁচামাল সংগ্রহ করে এবং সেই সব দেশের কুশলী ও অকুশল শ্রমিক-কর্মচারীদের খাটিয়ে প্রচুর লাভ করতে থাকে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশের বড় বড় কোম্পানিগুলো যারা বিদেশে পুঁজি খাটিয়ে সেই সব দেশের ধন-সম্পদ ও শ্রমশক্তি ব্যবহার করে লাভ আদায় করে তাদেরকে **বহুজাতিক কোম্পানি** বলা হয়। এরা বহুজাতিক এই অর্থে নয় যে, এই সব কোম্পানি অনেকগুলো জাতির সমবেত চেষ্টার ফল। এরা বহুজাতিক এই হিসাবে যে সাম্রাজ্যবাদী দেশের কোম্পানি হলেও, বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করে বহু দেশের সম্পদ ও শ্রমশক্তি এরা শোষণ করে।

বহুজাতিক কোম্পানির প্রসার

গত মহাযুদ্ধের পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদী দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো দ্রুত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ফেলেছে। বিদেশের বাজারে পুঁজি খাটানোর হার খুব দ্রুত বাড়ছে। বহুজাতিক কোম্পানি আজ সাম্রাজ্যবাদী উৎপাদন-প্রথার প্রধান বাহন হয়ে উঠেছে।

জাতিসংঘ থেকে বহুজাতিক কোম্পানির সম্বন্ধে যে তথ্য বেরিয়েছে তা থেকে দেখা যায়, পৃথিবীর ভেতর প্রায় অর্ধেক বহুজাতিক কোম্পানিই হচ্ছে আমেরিকান। সবচেয়ে বড় ১০০টা কোম্পানির ভেতর ৪৭টা আমেরিকান, ১২টা জাপানি, ১২ জার্মান, ৯টা বৃটিশ, ৮টা ফরাসী, ৩টা ওলন্দাজী, ৩টা ইটালীয়, ৩টা সুইস ও বাকি ৪টা অন্যান্য দেশের। এই সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশের শক্তি কতোটা এবং কোন দেশ কতোটা উগ্রভাবে সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার জন্য তৎপর হয়েছে।

পৃথিবীর ভেতর সবচেয়ে বড় কোম্পানি হলো আমেরিকার জেনারেল মোটর কর্পোরেশন। ১৯৮৫ সালে এদের বার্ষিক বিক্রি ছিলো ৯৬৩৭ কোটি ডলার। অর্থাৎ ভারতবর্ষের বার্ষিক আয় ১১,৬৭৪ কোটি ডলারের ৮২.৫৫ শতাংশ।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমেরিকার একসন নামে তেলের কোম্পানি। এদের বার্ষিক বিক্রি ৮৬৬৭ কোটি ডলার। এই সব কোম্পানিগুলো পৃথিবীর প্রায় সব পুঁজিবাদী দেশগুলোতেই এদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে ফেলেছে এবং সেই সব দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের ধন-সম্পদ ও শ্রমশক্তি শোষণ করেছে ও নিজেদের পুঁজি দ্রুত বাড়িয়ে ফেলছে।

শোষণের নতুন কৌশল

এদের শোষণ-পদ্ধতি কোম্পানির যুগের শোষণ-পদ্ধতির মতো খোলামেলা নয়। লুকিয়ে, গোপনে অন্য দেশকে শোষণ করে ও লাভ তুলে এরা নিজেদের দেশে নিয়ে আসে। যে দেশে পুঁজি খাটাবে বলে এরা ঠিক করে সে দেশে গিয়ে প্রথমেই সেই দেশের বুর্জোয়া নেতাদের সঙ্গে ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গোপনে গোপনে কথাবার্তা চালায়। তাদের একটা মোটা ঘুষ দিয়ে কিংবা কোম্পানির কিছু শেয়ার দিয়ে কিংবা তাদের ছেলে-মেয়েদের ভালো ভালো বেতনে চাকরি দিয়ে তাদের হাত করে ফেলে এবং এদের সাহায্যে দেশি কোনো কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তি সই করে। সরকারি বড় বড় কন্ট্রাক্টও এরা এইভাবে সরকারি কর্মচারী ও বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতাদের ঘুষ দিয়ে আদায় করে নেয়। যেমন করেছিলো বোফোর্স। অবশ্য বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের কোম্পানিগুলোর ভেতর এই কন্ট্রাক্ট নিয়ে খুব রেষারেষি চলে এবং এই রেষারেষির ফলে ঘুষের টাকা সমেত সুদে-আসলে প্রচুর লাভ এরা তুলে নেয়। যেহেতু কমিউনিস্ট দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘুষের সম্ভাবনা কম, তাই এইসব দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করার উৎসাহ এইসব বুর্জোয়া নেতা ও সরকারি কর্মচারীদের তেমন দেখা যায় না।

পুঁজি খাটিয়ে এরা নানাভাবে মুনাফা তোলে। প্রথম এরা বাজার দরের থেকে অনেক বেশি দাম দিয়ে কলকব্জা ও কাঁচামাল নিজেদের দেশের কোম্পানি থেকে আমদানি করে। দ্বিতীয়ত, তৈরি মাল এরা নিজেদের দেশে বা অন্য দেশে নিজেদের কারখানার কাছেই বাজার দামের থেকে অনেক কম দামে বিক্রি করে। তৃতীয়ত, নিজেদের দেশের কারখানা থেকে বিশেষজ্ঞ অনেক বেশি খরচ দেখিয়ে আনায়। চতুর্থত, অনাবশ্যক কলকব্জা ও অবিক্রিত মালপত্র নিজেদের কোম্পানি থেকে আমদানি করে। পঞ্চমত, কারখানার শিল্প-কৌশল বাবদ অনেক রয়ালিটি আদায় করে। ষষ্ঠত, যে টাকা লগ্নি করে তার উপর উঁচু হারে সুদ ধরে। সপ্তমত, বিদেশি কর্মচারীদের ভাতা হিসাবে বেশি বেশি ফি

নেয়। এইসব উপায়ে এরা অন্য কারখানাগুলো থেকে মজুর ও কর্মচারীদের কিছুটা বেশি বেতন দিয়ে তাদের তুষ্ট করে রাখে। ফলে তাদের উৎপাদন ভালো হয় এবং লাভও বেশি হয়।

জাতিসংঘের তথ্য থেকে দেখা যায় ৬১টা অনুন্নত দেশে সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ১৯৬৭ সালে ১২০ কোটি ডলার পুঁজি পাঠিয়েছিলো এবং লাভের যে অংশ দেশে এনেছিলো তার পরিমাণ ছিলো ৪৪৪ কোটি ডলার। ১৯৭৪ সালে পুঁজি তুলে ফেরত এনেছিলো ২১০ কোটি ডলারের এবং লাভ এনেছিলো ১৬৪০ কোটি ডলারের। এই ক্রমবর্ধমান লাভের স্রোতের একটা অংশ তারা তাদের শ্রমিক-কর্মচারীদের দিয়ে তুষ্ট রেখে নিজেদের শাসন বজায় রাখে এবং অনুন্নত দেশগুলোতেও বুর্জোয়া নেতা সেনাপতিদের হাতে রাখে।

[সতেরো]

বৈদেশিক মুদ্রা ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথার পক্ষে বিদেশি বাজার ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। বিদেশ থেকে, বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলো ও তাদের কলোনি বা তাঁবেদার দেশগুলো থেকে, কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হয়, আবার বিদেশের বাজারে তাদের পণ্য বিক্রি করতে হয়। যতো বড় দেশই হোক না কেন নিজেদের দেশের লোকদের শোষণ করার ফলে তাদের দেশের বাজার সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। ফলে বিদেশের বাজারে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতেই হয়। শুধু যে কাঁচামাল কেনা ও পণ্য বিক্রির জন্যই বিদেশের বাজার দরকার তা নয়। শোষণের ফলে দেশে পুঁজিবাদীদের প্রচুর মুনাফা হতে থাকে এবং তাদের পুঁজি দু'দিনে ফেঁপে ফুলে এতো বেশি হয়ে যায় যে, দেশের ভেতর সে পুঁজি খাটাবার সুযোগ পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। কাজেই তখন এই বর্ধিত পুঁজি বিদেশে হয় উঁচু হারে সুদে কিংবা কল-কারখানা তৈরি করে মুনাফার জন্য খাটায়।

বিদেশের সঙ্গে কারবার করতে গেলে বিদেশের টাকার সঙ্গে নিজেদের দেশের টাকার বিনিময় করতে হয়। কাঁচামালপত্র কিনতে গেলে বিদেশি টাকায় তার দাম দিতে হয়। আবার বিদেশে জিনিসপত্র বিক্রি করে বিদেশি টাকায় আয়ও হয়। বিদেশে টাকা খাটাতে হলেও দেশি টাকাকে বিদেশি টাকায় বদল করে নিতে হয়। বিদেশিরা ঋণ ফেরত দিলে কিংবা সুদ দিলে বিদেশি টাকাকে দেশি টাকায় বদলে নিতে হয়। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে কতোটা লাভ হবে, তা অনেকখানি নির্ভর করে বিদেশি টাকার সঙ্গে দেশি টাকার বিনিময়ের

হারের ওপর। বিদেশি টাকার দাম যদি বেড়ে যায়, তাহলে বিদেশি মাল কিনতে অনেক বেশি টাকা লাগে। অন্যদিকে বিদেশে মাল বিক্রি করে অনেক বেশি দেশি টাকা লাগে। অন্যদিকে বিদেশে মাল বিক্রি করে অনেক বেশি দেশি টাকা পাওয়া যায়। কাজেই যারা রপ্তানি করে অর্থাৎ বিদেশে মাল পাঠায় তাদের সুবিধা হয় এবং যারা আমদানি করে তাদের লোকসান হয়। মুদ্রা বিনিময়ের হার বেশি ওঠানামা করলে বাজারে দারুন অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। মালপত্র বিদেশে চালান দিয়ে কিংবা বিদেশ থেকে চালান এনে লাভ হবে না লোকসান হবে, তা অনিশ্চিত থেকে যায় যদি বিদেশি টাকার বিনিময়ের হার ঠিক না থাকে। বিদেশি টাকার বিনিময়ের হার নির্ভর করে কতো বিদেশি টাকা দেশ থেকে চলে গেল তার ওপর। বাইরে থেকে দেশে টাকা আসে ছয় রকমভাবে, যথা- (১) দেশে তৈরি জিনিসপত্র বাইরে চালান দিয়ে অর্থাৎ রপ্তানি করলে, (২) বিদেশে চাকরি করে দেশে টাকা পাঠালে, (৩) বিদেশিরা বেড়াতে এসে দেশে খরচপত্র করলে, (৪) বিদেশে ধার দেওয়া টাকা ফেরত এলে বা সুদ পেলে, (৫) বিদেশ থেকে টাকা ধার করে আনলে এবং (৬) বিদেশে ব্যবসার লাভ বা রয়ালিটি থেকে। আবার দেশ থেকে টাকা বেরিয়ে যায় ঠিক এই সবের উল্টো কারণে, যথা- আমদানি করলে, বিদেশিরা দেশে চাকরি করতে এলে, দেশের লোক বিদেশে বেড়াতে গেলে, বিদেশের ধার শোধ দিলে বা সুদ দিলে, বিদেশি কোম্পানিগুলোর লাভ, রয়ালটি ইত্যাদি বিদেশে পাঠাতে হলে।

বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার

দেশে মোট যতো টাকা আসে এবং যতো টাকা বেরিয়ে যায়, তার সমান সমান না হলে মুদ্রা বিনিময়ের হার ওঠানামা করে। বিদেশি টাকার এই আমদানি ও রপ্তানির হিসাবকে বলা হয় 'ব্যালেন্স অব পেমেন্টে' বা 'বিদেশি মুদ্রার হিসাব'। এই হিসাব অনুযায়ী যদি বিদেশি মুদ্রা উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে বিদেশি মুদ্রার দাম পড়ে যায়। ১ ডলার কিনতে তখন কম দেশি টাকা দিতে হয়। আবার বিদেশি মুদ্রার যদি ঘাটতি পড়ে, তাহলে বিদেশি মুদ্রার দাম উঠে যায়। ১ ডলার কিনতে তখন বেশি দেশি টাকা দিতে হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে মুদ্রা বিনিময়ের হার যাতে খুব বেশি ওঠানামা না করতে পারে তার একটা ব্যবস্থা চালু ছিলো। এই ব্যবস্থার নাম ছিলো 'মুদ্রার স্বর্ণমান' বা 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড'। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক দেশ তার দেশের মুদ্রার দান নির্দিষ্ট ওজনের সোনার সঙ্গে বেঁধে দিতো। এ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য

দেশের সরকার যথেষ্ঠ পরিমাণ সোনা কিনে জমা করে রাখতো। 'বিদেশি মুদ্রার হিসাবে' যদি বিদেশি মুদ্রার ঘাটতি হতো, তাহলে বিদেশি মুদ্রার দাম বেশি টাকায় চড়া হয়ে যেত। তখন যাতে এই বিনিময়ের হার খুব বেশি উঠে না যায়, তার জন্য সরকার সোনা বিক্রি করে বিদেশিদের পাওনা মিটিয়ে দিতো। আবার যদি বিদেশি মুদ্রার বাড়তি হতো, তা হলে ঐ বিদেশি টাকা দিয়ে সোনা কিনে জমা করে রাখতো। এইভাবে সোনা কেনাবেচা করে বিদেশি মুদ্রার হিসাবে সমতা রাখা হতো।

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো প্রায় সর্বশান্ত হয়ে গেল এবং আমেরিকার কাছে তারা দারুণভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা যুদ্ধের জন্য প্রচুর পরিমাণে আমদানি তো করলোই, অনেক টাকা দেনাও করলো আমেরিকার কাছ থেকে। ফলে সোনা দিয়ে বিদেশি মুদ্রার হারের ওঠানামা বন্ধ করার যে কৌশল পুঁজিবাদী দেশগুলো ব্যবহার করতো, তা আর সম্ভব হলো না। এরপর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবধি তারা প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দায়িত্ব দিলো যথেষ্ঠ পরিমাণে বিদেশি মুদ্রা সুবিধামতো ক্রয় করে মজুত করে রাখার। যখনই কোনো দেশের মুদ্রার চাহিদা বেড়ে গিয়ে দাম বেড়ে যেত, তখনই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সেই দেশের মুদ্রা বাজারে ছেড়ে দিয়ে তার দাম কমিয়ে ফেলতো। এইভাবে খোলাবাজরে বিদেশি মুদ্রা কেনাবেচা করে বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ের হারকে মোটামুটিভাবে ঠিক রাখার চেষ্টা করতো। যখন বিদেশি মুদ্রার অভাব হতো, তখনই শুধু সোনা ব্যবহার করা হতো। এইভাবে মুদ্রার হারকে ঠিক রাখার পন্থাকে বলা হতো 'স্বর্ণ বিনিময় পন্থা' বা 'গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড'।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সৃষ্টি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো দেউলিয়া হয়ে আমেরিকার কাছে সম্পূর্ণ বাঁধা পড়লো। আমেরিকা এই দেশগুলোর পুনর্গঠনের জন্য কোটি কোটি ডলার ধার দিলো। এই ডলার দিয়ে তারা আমেরিকার কাছ থেকে যন্ত্রপাতি কিনে আবার কল-কারখানা চালু করলো। ফলে তাদের কাছে কলকজা বিক্রি করে একদিকে আমেরিকা যেমন লাভ করলো ও ব্যবসা-সঙ্কটের হাত থেকে মুক্তি পেল, তেমনি ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথা রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, এই সব দেশের হাতে সোনা তো ছিলোই না, বিদেশি কোনো মুদ্রাই ছিলো না যা

দিয়ে এরা বৈদেশিক বাণিজ্য চালু রাখতে পারে। আর বৈদেশিক বাণিজ্য চালু রাখতে না পারলে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথাও বাজারের অভাবে অচল হয়ে যায়। এই অচল অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সৃষ্টি হলো ১৯৪৪ সালের ২২ শে জানুয়ারি আমেরিকার ব্রেটন উড্‌সে আহূত এক সভায়।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক দেশ নির্ধারিত পরিমাণে তাদের দেশীয় মুদ্রা ও এক-চতুর্থাংশ সোনা এই তহবিলে জমা দিলো। এইভাবে তহবিলে কিছু পরিমাণ সোনা ও নানা দেশের মুদ্রা জমা হলো। 'রপ্তানি কম হয়ে গেলে বা অতিরিক্ত টাকা ধার শোধ করার জন্য ব্যয় করতে হলে অথবা বেশি পরিমাণে বিদেশি পণ্য আমদানি করে ফেলার জন্য বা দেশ থেকে টাকা বিদেশে চালান হয়ে যাবার জন্য যদি কোনো দেশে বিদেশি মুদ্রার অভাব এমন গুরুতর আকারে দেখা যায় যে, তাদের পক্ষে মুদ্রা বিনিময়ের হার বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে, তাহলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ঐ দেশকে তাদের মুদ্রা তহবিল থেকে বিদেশি মুদ্রা ধার দেয়। এই ধারের উপর অবশ্য সুদ দিতে হয় এবং কয়েক বছরের ভেতর সে ধার শোধও দিতে হয়। কার্যত দেখা গেল যে, শুধু 'স্বল্প উন্নত' দেশগুলো নয় ব্রিটেন, ফরাসী প্রভৃতি পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এই তহবিল থেকে বছরের পর বছর ধার নিতে বাধ্য হয়েছে।

'স্বল্প উন্নত' দেশের সঙ্কট

'স্বল্প উন্নত' দেশগুলো কলকব্জা কিনে কারখানা-শিল্প স্থাপন করার চেষ্টা করতে গিয়ে ক্রমেই পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়তে লাগলো। 'স্বল্প উন্নত' দেশগুলো বেশির ভাগ কাঁচামাল রপ্তানি করে বিদেশি মুদ্রা জোগাড় করে এবং সেই মুদ্রা দিয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছ থেকে কলকব্জা ও শিল্পজাত অন্যান্য সামগ্রী কেনে। কিন্তু কাঁচামালের দাম অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ও নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে কাঁচামালের চাহিদা কমে যাওয়ায়, এদের বিদেশি মুদ্রার আয় তেমন বাড়েনি। অন্যদিকে কলকব্জা এবং শিল্পজাত অন্যান্য সামগ্রীর দাম খুব বেড়ে যাওয়ায় তাদের অনেক বেশি বিদেশি মুদ্রায় দাম দিতে হয়েছে। তার উপর এই দাম দিতে গিয়ে ঋণ নিয়েছে এবং তার সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহলির কাছ থেকে ধার পেতে হলে তার একটা শর্ত হচ্ছে, বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানা চালুর

অধিকার দিতে হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কর্মকর্তারা নির্বাচিত হয় সভ্যদের ভোট দিয়ে। যে সভ্য যতো বেশি মুদ্রা জমা দিয়েছে তার ততো বেশি ভোট। কাজেই আমেরিকা ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোই এই তহিলের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। সুতরাং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সুবিধার জন্যই যে এই তহবিল কাজ করবে– তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিদেশি কোম্পানিগুলো ঋণগ্রস্ত দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ফেঁদে ও কলকারখানা চালু করে প্রচুর লাভ, কমিশন, রয়ালটি, পুঁজির সুদ ইত্যাদি হিসাবে এবং বিশেষ করে নিজেদের কোম্পানি থেকে আমদানি জিনিসের দাম বাড়িয়ে ও নিজেদের তৈরি মাল সস্তায় নিজেদের কাছেই রপ্তানি করে প্রচুর টাকা লুকিয়ে বছর বছর বিদেশে পাঠিয়ে ঋণগ্রস্ত দেশকে আরো বিপদে ফেলে। বিদেশি পুঁজিপতিদের এইসব পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিতে দেশের অর্জিত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে ধার করা বিদেশি মুদ্রা নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন সেই ধার শোধ করতে আবার ধার করতে হয়। এইভাবেই সাম্রাজ্যবাদীদের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে 'স্বল্প উন্নত' দেশগুলোর আর রক্ষা থাকে না। ঋণের বোঝা ক্রমেই ভারি হয়ে উঠতে থাকে।

সঙ্কটের সমাধান হয় না

আন্তর্জাতকি মুদ্রা তহবিলের কাছ থেকে এইভাবে ধার নিতে নিতে একদিন যেমন 'স্বল্প উন্নত' দেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার ক্রমশ শূন্য হয়ে আসে, তেমনি তহবিলের আমানত মুদ্রাও শেষ হয়ে যায়। এইভাবে ঋণ বাড়তে বাড়তে ও ঋণ শোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ায় 'স্বল্প উন্নত' দেশগুলো ১৯৬৮ সালে এক অচল অবস্থায় এসে পড়েছিলো। তখন আবার কিছু টাকা জমা দিয়ে পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলো অবস্থার একটা সাময়িক সমাধান করে। দ্বিতীয়বার এই টাকা জমা দিয়ে যে তহবিলটা সৃষ্টি করা হলো, সেটার নাম হলো 'বিশেষ ধার নেবার অধিকার' বা 'স্পেশাল ড্রইং রাইট'। এই তহবিল তৈরি করে আবার কিছুদিন 'স্বল্প উন্নত' দেশগুলোকে বিদেশি মুদ্রা ধার দিয়ে বিদেশি ব্যবসা ও পাওনা আদায় চালু রাখা গেল। কিন্তু রোগের আসল কারণ দূর হলো না বরং রোগ ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো। ১৯৮১ সালে স্বল্প উন্নত দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ধার দিয়েছিলো ৪৮,৩০০ কোটি ডলার। এই ধার ১৯৮২-তে দাঁড়ায় ৫৩,৩০০ কোটি ডলার এবং ১৯৮৩ সালের শেষে দাঁড়াল ৬০,০০০ কোটি ডলারে। অর্থাৎ বছরে এই ঋণ বাড়ে

শতকরা ১০ থেকে ১৩ হারে। এইভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদবেড়ে বেড়ে এতো বেশি হয়ে গেল যে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটা বড় বড় দেশ, যথা মেক্সিকো ও ব্রাজিল বলে বসলো যে, তারা আর বিদেশিদের ও আন্তর্জাতিক তহবিলের কাছ থেকে পাওনা ঋণের সুদ তো দূরের কথা আসল পর্যন্ত দিতে পারবে না। এদিকে তাদের যে আবার ঋণ দিয়ে ঋণ ও সুদ শোধ দেবার ব্যবস্থা করা যাবে তার সম্ভাবনাও থাকলো না। কারণ আন্তর্জাতিক তহবিল প্রায় শূন্য। এরূপ অবস্থায় আন্তর্জাতিক তহবিলের কর্মকর্তারা এ বছর আমেরিকার কাছে আবেদন নিবেদন করেছে, যাতে আমেরিকা আন্তর্জাতিক তহবিলে অন্তত ৮৪০ কোটি ডলার জমা রাখে। আমেরিকা এই টাকা দিতে তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না- কেননা এই টাকা ফেরত পাওয়া যাবে কি'না তাতে তাদের সন্দেহ আছে। তাহলে এই সুযোগে স্বল্প উন্নত দেশগুলোর উপর আরো কঠিন শর্ত চাপিয়ে আরো বেশি মুনাফা লোটার এই অপূর্ব সুযোগ ছাড়তে তারা নারাজ।

শেষ অবধি বিদেশি ঋণ শোধ দেবার জন্য আবার একটা নতুন কিস্তিবন্দীর ব্যবস্থা করে আপতত সমস্যাটা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। অনুন্নত দেশগুলো আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহিলের (IMF) নীতি অনুসরণ করে কিভাবে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছে তা নিচের তথ্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে।

বিদেশি ঋণের পরিমাণ (কোটি ডলার)*

দেশ	**১৯৮৪ সালে**		**১৯৮৯ সালে ঋণবৃদ্ধির বার্ষিক হার (শতকরা)**
১। ব্রাজিল	১০,৪৩০	১১,১২০	৭
২। মেক্সিকো	৯৪৮০	৯৫৬০	১
৩। আর্জেন্টিনা	৪৮৮০	৬৪৭০	৩২
৪। ভারতবর্ষ	৩৩৯০	৬২৫০	৮৪
৫। ইন্দোনেশিয়া	৩১৯০	৫৩১০	৬৬
৬। চীন দেশ	১২১০	৪৪৯০	৩৭২

সূত্র : ইকনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি, জুলাই ৪ঠা ১৯৯২ সংখ্যা, ১৪০২ পৃষ্ঠা।

উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, চীন দেশের বিদেশি ঋণ সবচেয়ে কম কিন্তু তারা দ্রুত বিদেশি ঋণ খুব বেশি পরিমাণে নিতে আরম্ভ করেছে এবং বর্তমানে এই ঋণ বৃদ্ধির হার তাদের সবচেয়ে বেশি। যেহেতু চীনদেশের বিদেশি ঋণের উপর কড়া নজর রাখা হয় এবং বিদেশি ঋণের টাকা দেশের সত্যিকার উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয় এবং ব্যক্তিগত পুঁজিবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয় না, তাদের পক্ষে বিদেশি পুঁজির সাহায্যে নানা প্রকার নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপন করে জাতীয় আয় বাড়িয়ে ঋণ শোধ দেওয়া অসুবিধা হবে না। কিন্তু অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলোতে বুর্জোয়াশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশকে আরো বেশি পরিমাণে বিদেশিদের বাজারে পরিণত করে ঋণের বোঝা ক্রমেই বাড়িয়ে দিচ্ছে। ভারতবর্ষে নেহেরু আমলের প্রথমদিকে বিদেশি ঋণ পরিহার করে দেশকে স্বাধীন ও স্বনির্ভরশীল করে তোলার ইচ্ছা প্রবল ছিলো। নেহেরুর কন্যা ও নাতিদের রাজত্বের কালে সে ইচ্ছার বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। আজকের ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে দোস্তী পাতিয়ে একযোগে দেশের সম্পদ লুণ্ঠনে ব্যস্ত, অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণরূপে ওদের কাছে আত্মসমর্পন করেছে। আজ তারা স্বনির্ভরশীলতার আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে 'গ্লোবালাইজেশন' বা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে 'আন্তর্জাতিক' করার কথা বেশি বলছে। অর্থাৎ ভারতকে আবার সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে সমর্পণ করার পথে তারা দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছে। যে 'লাল কেল্লায়' দাঁড়িয়ে ১৯৯২ সালের স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসের সভাপতি ও ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন ভারতের বাজারে তারা বিদেশি পুঁজির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ দেশকে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির কাছে বিকিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। এরপর থেকে ভারতের অর্থনীতি বিদেশি পুঁজিপতিরা নির্ধারণ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষ ও আন্তর্জাতিক ঋণ

ভারতবর্ষের বুর্জোয়া নেতারা রাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী প্রথায় ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের পথ অনুসরণ করে চলেছে। অবশ্য মেক্সিকো কিংবা ব্রাজিলের বিকাশের পন্থা থেকে ভারতের পন্থা কিছুটা ভিন্ন। মেক্সিকো বা ব্রাজিল প্রধানত আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সাহায্যে (সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক তহবিলের নির্ধারিত পন্থায়) দেশের শিল্প-বিকাশের চেষ্টা চলেছে।

তারা পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আরো কয়েক কোটি টাকা ধার না পেলে তারা বর্তমান ঋণের সুদ আর কিস্তি আর শোধ দিতে পারবে না। ভারতবর্ষ কিছুটা স্বাধীনভাবে, কিছুটা সোভিয়েটের সাহায্য নিয়ে, শিল্প-বিকাশের চেষ্টা করায় এতোদিন মেক্সিকো বা ব্রাজিলের মতো বিদেশি ঋণে এতোটা জড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু আজ বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতকে দ্রুত ধাপে ধাপে আন্তর্জাতিক ঋণের জালে জড়িয়ে ফেলছে, তা নিচের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে।

সাল	ভারতের মোট আন্তর্জাতিক ঋণ
১৯৮০	১,৭৪৫ কোটি ডলার
১৯৮৫	৩,৩৯২ " "
১৯৯০	৫,৯৭৫ " "
১৯৯১	৬,৮২৩ " "
১৯৯২	৭,৩৫০ " "

১৯৯১ ও ১৯৯২-এ মাঝেও অনেকবার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও খোলা বাজার থেকে বিদেশি টাকা ধার করা হয়েছে এবং কিছু কিছু শোধও করে দেওয়া হয়েছে। যেটা লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হলো এই যে, ধারের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নিকট ঋণ ছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছেও আমাদের প্রচুর ধার হয়েছে এবং এই সব ধারের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এই সব ধারের সুদ মেটাতে গিয়ে আমাদের রপ্তানির ১০ থেকে ২০ শতাংশ দিয়ে দিতে হচ্ছে। সুতরাং প্রয়োজনীয় কল-কব্জা কেনার ক্ষমতা আমাদের অনেক কমে যাচ্ছে। অপরদিকে এই ধারের শর্ত হিসেবে অনেক অনাবশ্যক জিনিসপত্র আমদানি করতে হচ্ছে আমাদের দেশের ধনিক শ্রেণীর সম্ভোগ বৃদ্ধির জন্য। বিদেশি ঋণের ফলে উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ঠ পরিমাণে বাড়ছে না, অথচ অন্যদিকে বিপুল পরিমাণে বাড়ছে সৌখিন ও ধনিক শ্রেণীর বিলাস-ব্যসনের জন্য আমদানি।

ভারতের ভবিষ্যৎ

বিদেশি ঋণ গ্রহণ করলেই যে দেশের সর্বনাশ হবে এমন কোনো কথা নেই। দেশের সর্বনাশ হবে না উন্নতি হবে, তা নির্ভর করে কী কী শর্তে ঋণ গ্রহণ

করা হলো এবং এই ঋণের টাকা কী রকমভাবে ব্যবহার হলো- তার ওপর। আমাদের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী যে শর্তে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো থেকে ঋণ নিয়ে আসছে এবং যেমনভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুনাফার জন্য এই ঋণের বিদেশি মুদ্রা ব্যবহার করছে, তাতে ক্রমেই ঋণের বোঝা বাড়বে এবং ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে মেক্সিকো ও ব্রাজিলের মতো অবস্থা হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী মেক্সিকো ও ব্রাজিলের মতোই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হারিয়ে দেশকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাতে তুলে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর অনুগত ও বাধ্য সহচরে পরিণত হবে। এই পিচ্ছিল পথে একবার পা বাড়ালে, আর ফেরা যাবে না। দেশের বুর্জোয়া শাসকরা যতোই চিৎকার করুক, তারা ঋণের দায়ে ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। তখন ভারতবর্ষ আর জোটনিরপেক্ষ দেশ থাকবে না। পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, মেক্সিকো ও ব্রাজিলের মতো নামে নিরপেক্ষ থাকলেও, কাজে আমেরিকার অনুচরে পরিণত হবে। দেশি বুর্জোয়াশ্রেণী বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মালিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তকে শোষণ করবে এবং এই শোষণ যাতে নিরঙ্কুশ হয় তার জন্য বুর্জোয়া হুমুকশাহী রাজত্ব চালু করবে।

ভারতবর্ষের বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে বিদেশি ঋণ না নিয়ে ও বিদেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে হাত না মিলিয়ে বেঁচে থাকা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। দেশের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তকে কম বেতন ও কৃষিজাত পণ্যের কম দাম দিয়ে এবং মুদ্রাস্ফীতি চালু রেখে এরা তাদের দ্রুত সর্বশান্ত করে দিচ্ছে। এতে এদের মুনাফা উঠছে প্রচুর এবং এই মুনাফা জমিয়ে পুঁজি তৈরি হচ্ছে দ্রুত হারে। কিন্তু এই বর্ধিত পুঁজি খাটাবার সুযোগ আমাদের দেশে ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। একটার পর একটা শিল্প অসুস্থ হয়ে পড়ছে। শুধু বিলাসিতার পণ্য উৎপাদন বাড়ছে। এর প্রধান কারণ শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা যতোটা বাড়ছে, তার তুলনায় বাজার বাড়ছে না। মধ্যযুগীয় শোষণ-নীতি আমাদের দেশে সম্পূর্ণ বজায় রাখা হয়েছে। তার ওপর চাপানো হয়েছে পুঁজিবাদী শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের শোষণ। তার উপর চলে কালোবাজারী ও সরকারী দুর্নীতি। ফলে মুনাফার প্লাবন সৃষ্টি হয় আমাদের দেশে এবং পুঁজির পরিমাণ ফেঁপে-ফুলে দ্বিগুণ তিনগুণ হয়ে যায় বছর বছর। এদিকে এই শোষণের ধাক্কা সবটা গিয়ে পড়ে দরিদ্র শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের ঘাড়ে। ফলে তাদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠে। বেকারদের দল বেড়ে যায় দিন

দিন। যেটুকু বা সঞ্চয় হয় মুদ্রাস্ফীতি হয়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়ে আওতার বাইরে চলে যায়। এইভাবে বাজার সংকীর্ণ হয়ে যাবার ফলে তাদের পুঁজি খাটাবার সুযোগ দেশে ক্রমেই কমে আসছে। সুতরাং এরা একদিকে যাচ্ছে হচ্ছে শুধু ধনিকশ্রেণীর জন্য বিলাসিতার জিনিসপত্র তৈরি করতে এবং এসব জিনিসপত্র তৈরি করার কলা-কৌশল শেখার জন্য বিদেশি কোম্পানিগুলোর দ্বারস্থ হতে। এইসব জিনিসপত্র তৈরি করেও তাদের পুঁজি উদ্বৃত্ত থাকছে এবং সে টাকা তারা বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যোগ দিয়ে বিদেশে কল-কারখানা স্থাপনের জন্য নিয়োজিত করোছে। এইভাবে ঘরে-বাইরে বিদেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে দেশীয় বর্জোয়া শ্রেণী ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছে এবং উভয়ের স্বার্থ পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এরূপ অবস্থায় ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের সহচর হয়ে তাদের রাজনীতি বহুলাংশে গ্রহণ করছে। ফলে আন্তর্জাতিক তহবিলের কঠিন শর্তে ঋণ গ্রহণ করতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হচ্ছে না। যে পথে তারা দেশকে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে এই ঋণ গ্রহণ না করে তাদের উপায়ও নেই। পুঁজিবাদী প্রথায় কারখানা-শিল্পের বিস্তার করতে হলে বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাহায্য ছাড়া তাদের উপায় থাকে না। আর বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাহায্য নিলে দেশের বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার নিঃশেষ করেও তাদের পাওনা মেটানো যায় না। তার উপরে বিদেশি পুঁজি খাটাবার প্রশ্ন এসে পড়লে তো আর রক্ষা থাকে না। দফায় দফায় আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয় এবং একবার এই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়লে আর সে জাল থেকে মুক্তি পাবার উপায় থাকে না।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতের কারখানা-শিল্প স্থাপনের যে কৌশল নিয়েছে, আন্তর্জাতিক ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে তার অবশ্যম্ভাবী ফল। এই নীতির পরিণাম হচ্ছে দেশের কারখানা-শিল্পকে ক্রমেই বিলাসিতার জিনিসপত্র উৎপাদনের দিকে নিয়ে যাওয়া, বিদেশি কোম্পানিগলোকে দেশের শিল্পে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া ও তাদের সাহায্যে বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করা। এই নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে দেশ ক্রমেই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে। দেশি বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিদেশি বুর্জোয়াদের একট জটিল প্রকৃতির আঁতাত জমে উঠেছে।

বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আমাদের দেশিয় বুর্জোয়াশ্রেণীর এই বন্ধুত্বের ফলে দেশ যে শুধু ঋণের দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছে তা নয়, দেশে গণতন্ত্রের সম্ভাবনাকেও নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। শুধু রেডিও, টেলিভিশন ও

খবরের কাগজে ভাঁওতা দিয়ে বেশিদিন এই দেশি বুর্জোয়া ও বিদেশি বুর্জোয়াদের যুক্ত শোষণ দেশের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের উপর চালানো যায় না। তাই বুর্জোয়া শাসকেরা ক্রমেই গণতন্ত্রের মুখোস খুলে ফেলছে এবং ক্রমেই হুকুমশাহী রাজত্বের দিকে দেশকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক সঙ্কট যতো বেশি গুরুতর হবে, ততো বেশি এরা সাম্রাজ্যবাদীদের খপ্পরে গিয়ে পড়বে এবং শেষ অবধি ইজিপ্টের বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতা সাদাতের মতো আমেরিকার তাঁবেদার হয়ে উঠবে।

[আঠারো]

খোলাবাজার নীতি

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ দূরদর্শন গর্বের সঙ্গে খবর দেখায়, মার্কিন ও ইউরোপীয় একটা সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা অতি গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-কে একটা রূপোর থালা উপহার দিচ্ছে। অর্থমন্ত্রীর কাছে তাদের কৃতজ্ঞ থাকার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে।

গত কয়েক বছর ধরে পুঁজিবাদী জগতে গভীর ব্যবসা-সঙ্কট চলছে। এই সঙ্কটের নিরসন হবার কোনো লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছেই না, বরং যতোদিন যাচ্ছে ততোই সঙ্কট গভীর হচ্ছে ও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। বেকারের সংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে। বাজারে অবিক্রিত পণ্যের মজুত পাহাড়-প্রমাণ হয়ে উঠছে। একটার পর একটা বড় বড় কোম্পানি ও কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একদিকে লোকের বেকারত্বের ফলে আয় কমে যাওয়ায় পণ্যের বাজার সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠছে, অন্যদিকে ব্যাংকগুলোতে লগ্নির অভাবে জমা পুঁজি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। বাজার মন্দ হওয়ায় পুঁজির চাহিদা কমে যাচ্ছে এবং ব্যাংকের খাতায় পুঁজি পাহাড়-প্রমাণ হয়ে উঠছে। উন্নত দেশগুলিতে (উন্নত দেশ বলতে আমরা OECD দেশগুলো ধরবো, অর্থাৎ পশ্চিম-ইউরোপ, জাপান ও উত্তর-আমেরিকার দেশগুলো) ১৯৮৮ সালে মোট ব্যাংকের আমানত ছিলো ৪৭৭৯ বিলিয়ন ডলার। ১৯৯২ সালে, পাঁচ বছরের ভেতর এই জমা টাকা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় ৯১৯৪ বিলিয়ন ডলারে। পুঁজি খাটাবার সুযোগ কমে যাওয়ায়, পুঁজি ব্যাংকে পড়ে থাকছে। এইভাবে পুঁজি ও পণ্যের সঙ্কটের ফলে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রথা আজ দুর্দশগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। ঠিক এই সময় ভারতবর্ষের মতো একটা বিশাল বাজার অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং ও তার কর্তা

নরসিমা তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে মাত্র কয়েক মিলিয়ন ডলার ঋণ পাবার আশায়। এতো বড় একটা বাজার বিনা রক্তপাতে, এক কানাকড়ি ব্যয় না করে, সম্পূর্ণ মুনাফা পাওয়া যে দারুণ সৌভাগ্যের কথা এটা আমাদের দেশের লোক না বুঝলেও, পশ্চিমী পুঁজিবাদীরা ভালো করেই বুঝে। তাই তারা মনমোহন সিং-এর প্রতি কৃতজ্ঞ।

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের পুঁজি বিনিয়োগ করা ও তাদের এদেশে পণ্য বিক্রি করার বিরুদ্ধে যে সব বাধা-নিষেধ ছিলো, মনমোহন সিং ও নরসিমা তা সব তুলে নিয়ে তাদের ভারতে অবাধ প্রবেশের অধিকার দিয়ে দিচ্ছে। যেহেতু এই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী আমলের নীতিকে লোকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ষড়যন্ত্র বলে সন্দেহ করতে পারে তাই তারা এই খোলাবাজারের নীতিকে নতুন নতুন নাম দিয়ে চালু করার চেষ্টা করছে। কখনও এই নীতিকে বলছে "উদারপন্থী নীতি' বা liberalisation। কখনও বলছে 'খোলাবাজারী সংস্কার' বা open market reform। কখনও বলছে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর 'বিশ্বকরণ' বা globalisation। বিশ্বব্যাংক ও বিশ্বমুদ্রা তহবিলের শেখানো বুলি ব্যবহার করে মনমোহন সিং ও নরসিমা দাবি করছেন, ভারতের বাজার উন্মুক্ত করে দিলে পশ্চিমী পুঁজিবাদীরা তাদের পুঁজি ও উন্নতমানের কলা-কৌশল ব্যবহার করে দেশের উৎপাদন কাঠামোর প্রচুর উন্নতি করে ফেলবে। আমাদের দেশীয় পুঁজিপতিরা বাধ্য হয়ে তাদের কাছ থেকে উন্নত ধরনের উৎপাদন-কৌশল শিখে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে পারবে এবং বিদেশি কারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

খোলাবাজার নীতির পরিণাম

সাম্রাজ্যবাদীরা অনুন্নত দেশে তাদের পুঁজি নিয়োগ করে সেই দেশের উন্নতিসাধন করবে এটা অত্যন্ত দুরাশা। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো পুঁজি নিয়োগ করে কোনো অনুন্নত দেশকে উন্নত করে তুলছে এমন একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না। বরং তাদের শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করে নিজেরা প্রচুর মুনাফা লুঠে তাদের পঙ্গু করে রেখেছে তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 'খোলাবাজার নীতি' অনুসরণ করে কোনো অনুন্নত দেশ উন্নত হতে পারছে, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া বিরল। পুঁজিবাদের জন্মের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, আমেরিকাসহ প্রত্যেকটা দেশই তাদের দেশের বাজার তাদের নিজেদের

দেশের পুঁজিপতিদের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছিলো, বিদেশি পুঁজিপতিদের ঢুকতে দেয়নি। ইদানিংকালে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ও সিঙ্গাপুরের দৃষ্টান্তকে বারবার সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের এ দেশীয় চেলারা খোলাবাজারের সাফল্যের উদাহরণ বলে জাহির করে। মনে রাখা দরকার, এই কয়টা ছোট ছোট দেশ গত মহাযুদ্ধের পর থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ ও জাপান এবং পণ্যের অভাবে জর্জরিত আমেরিকার বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীহীন অত্যন্ত খালি অবস্থায় পায়। দ্বিতীয়ত, চীনের বিপ্লবের ফলে সেখানকার পলাতক পুঁজি ও জাপানী পুঁজি এদের কারখানা-শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। ছোট ছোট দেশে গোটাকয়েক বড় বড় কারখানা স্থাপন করলেই সেসব দেশের কারখানা-শিল্পের উৎপাদন দেশের ভেতর প্রাধান্য লাভ করে ফেলে। সুতরাং এইসব ছোট ছোট দেশের বা শহরের খোলাবাজারের উদাহরণ বেশির ভাগ অনুন্নত দেশের পক্ষে খাটে না। একটা ছোট দেশকে শিল্পোন্নত করে তোলা ও ভারতের মতো একটা বড় দেশের শিল্পোন্নতির ভেতর গুণগত পার্থক্য আছে। এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় দক্ষিণ আমেরিকার বড় বড় দেশগুলোর দিকে তাকালেই। এইসব দেশে গত ১০০ বছর ধরে তারা এই বাজারের নীতি অণুসরণ করে আসছে। ১০০ বছর আগে তারা যে রকম পিছনে পড়ে ছিলো, আজও তারা সেই অবস্থাতেই আছে।

'খোলাবাজার নীতির' ব্যর্থতার একটা উৎকৃষ্ট প্রমাণ পূর্ব-ইউরোপের বর্তমান অবস্থা। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পতনের পর, ১৯৮৯ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক, বিশ্বঅর্থ তহবিল ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় এইসব দেশগুলোতে খোলাবাজারের অর্থনীতি চালু করা হয়েছিলো। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সাল - এই পাঁচ বছরের ভেতরেই এইসব দেশের লোকদের যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ইদানীং জাতিসঙ্ঘের ইউরোপীয় কমিশনের এক রিপোর্টে এই ভয়াবহ অবস্থার কিছু কিছু পরিসংখ্যানগত আভাস পাওয়া যায়। এই সংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী এই সব দেশের গড়পড়তা জাতীয় উৎপাদন এই পাঁচ বছরে ৩০% কমেছে, এবং এই কমার হার ক্রমেই দ্রুততর হচ্ছে। ১৯৯০ সালে জাতীয় উৎপাদন কমার হার ছিলো ১০%। বুলগেরিয়ার জাতীয় উৎপাদন কমেছিলো ১৭.৫% হারে এবং ১৯৯২ সালে এই কমার হার দাঁড়ায় ২২%। রুমানিয়ার হার ১৯৮৯ সালে কমেছিলো ৫.৮% এবং ১৯৯২ সালে তা দাঁড়ায় ১৫.৪%। পোল্যান্ডে ১৯৯০ সালে জাতীয় উৎপাদন কমেছিলো ১৮% হারে, ১৯৯২ সালে কমে ২০% হারে।

প্রাক্তন সোভিয়েট দেশগুলো যারা CIS নামে পরিচিত, তাদের জাতীয় উৎপাদন কমার হার ছিলো ১৯৯০ সালে ৪% ১৯৯২ সালে ২০%।

দেশের লোকের দ্রুত অবনতির হার বোঝা যায় দারিদ্র্যসীমার নিচের লোকসংখ্যা দিয়ে। ১৯৮৯ সালে শতকরা ১২ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিলো এইসব দেশে। ১৯৯২ সালে শতকরা ২৯ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যায়। বেকারের সংখ্যা ১৯৯০ সালে ছিলো ১৫ লক্ষ। ১৯৯২ সালে তা দাঁড়ায় ৬৫ লক্ষে। খোলাবাজারের ফলে হাঙ্গেরীর বড় বড় কারখানাগুলোতে শতকরা ৪০ জন শ্রমিক কর্মচ্যুত হন।

খোলাবাজার নীতির আর একটা কুফল হলো মুদ্রাস্ফীতি। হাঙ্গেরীর মুদ্রাস্ফীতির হার হলো বছরে ২৩%। পোল্যান্ডের ৪৩%; আলবেনিয়া, রুমানিয়া ও স্লোভাকিয়ার ২০০% এবং আগের সোভিয়েট দেশগুলিতে ৩০০%। আমাদের দেশে সেই তুলনায় এখনও মুদ্রাস্ফীতি ততোটা উগ্র আকার ধারণ করে নি। তথাপি এই মুদ্রাস্ফীতির ফলে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের দুরবস্থা আমরা বর্তমানে হাড়ে-হাড়ে ভোগ করোছি। আমাদের ৯/১০% মুদ্রাস্ফীতির তুলনায় যে সব দেশে ১০০/২০০% মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে, সেইসব দেশের লোকের দুর্দশার কথা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

জনসাধারণের যখন এই রকম দুরবস্থা তখন কিছু ব্যবসায়ী ও ভাগ্যান্বেষী সরকারী কর্মচারীরা ও রাজনৈতিক নেতারা সুযোগ বুঝে সরকারি কল কারখানা, বাড়ি-জমি-জায়গা ও অন্যান্য সম্পত্তি জলের দামে নিজেরা দখল করে নিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে। দেখতে দেখতে একটা মুষ্টিমেয় ধনী শ্রেণীর উৎপত্তি হয়। খোলাবাজারের সুযোগ পেয়ে বিদেশি ভোগ্যপণ্যে দেশের বাজার ভরে যায়। সাধারণ মানুষের অবশ্য এইসব বিদেশি ভোগ্যপণ্য কেনার ক্ষমতা থাকে না শুধুমাত্র নবজাত ধনীশ্রেণীর লোকেদের বিলাসিতার জন্যই এগুলো বিক্রি হয়। বেকার পরিবারের মায়েরা সংসারের ব্যবহৃত দু'একটা ছোট-খাটো জিনিস বিক্রির জন্য রাস্তার ধারে এসে অপেক্ষা করে, বিক্রি হলে সংসারের রুটির সংস্থান হবে এই আশায়। যুবতী মেয়েদের দলে দলে বেশ্যাবৃত্তি করার জন্য দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীরা কোম্পানি খুলে দেশের ভেতরে ও বাইরে চালান করে দেয়।

সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার করেছিলো, খোলাবাজার হলে পশ্চিম-ইউরোপের লোকদের মতো তারাও প্রত্যেকে রঙিন টিভি, ভিসিআর, মোটর গাড়ি ইত্যাদি বিলাসিতার ভোগ্য-পণ্যের অধিকারী হবে। আজ বেকার, দারিদ্র্য ও রুটির ক্ষুধার তাড়নায় তাদের সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে।

আমাদের দেশের একচেটিয়া শিল্পপতিরা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধে দেশের শ্রমশক্তি ও সম্পদ শোষণের যে ষড়যন্ত্র করছে, খোলাবাজার নীতি সেই ষড়যন্ত্র কার্যকরী করার একটা কৌশল মাত্র। এর অনিবার্য ফল পূর্ব-ইউরোপের লোকেদের দেখলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

খোলাবাজার নীতি ও ভারতবর্ষ

নরসিমা ও মনমোহন সিং-এর চালু খোলাবাজার নীতি ভারতের জনসাধারণকে এই দু'বছরের ভেতরেই অনেকখানি দারিদ্র্যও অভাব-অনটন ও বেকারত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পূর্ব-ইউরোপের জনসাধারণের মতোই এই নীতি ভারতের জনসাধারণকে দুঃখ-দুর্দশার অতল গহ্বরে ঠেলে দেবে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। মনমোহন সিং অবশ্য সুযোগ পেলেই চিৎকার করে ঘোষণা করছে, দেশের অবস্থা নাকি উত্তরোত্তর ভালো হচ্ছে। তার আসল উদ্দেশ্য অবশ্য বিদেশিদের কাছ থেকে আরও ডলার ঋণ আদায় করা। তার এই দাবির অসারতা প্রমাণ হয় সরকারি দু'একটা তথ্য থেকেই। গত ৩০ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে এক সভায় তিনি জোর গলায় প্রচার করেন ভারতের অবস্থা ভালোর দিকে কারণ আমাদের রপ্তানি বাড়ছে। ভারতের রপ্তানি কিছুটা বেড়েছে সন্দেহ নেই। ১৯৮৮-৮৯ সালে ভারতের মোট রপ্তানি ছিলো ২০,২৩২ কোটি টাকার। ১৯৯২-৯৩ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩,৩৫১ কোটি টাকায়, অর্থাৎ প্রায় ১৬৪% বেশি। বিদেশি মুদ্রার তুলনায় টাকার মূল্য অনেক সস্তা করে দেওয়ার ফলে ভারতীয় পণ্যের দাম বিদেশে প্রায় ৬০% সস্তা হয়ে যায়। এই রকম টাকার মূল্য কমিয়ে বিদেশে মাল সস্তা করে রপ্তানি বৃদ্ধি বেশিদিন স্থায়ী হয় না। কাজেই এই রপ্তানি বৃদ্ধি কতদিন স্থায়ী হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাছাড়া রপ্তানি বাড়লেই যে দেশের অবস্থা ভালো হয়ে যাবে এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই। ভারতীয় মুদ্রার দাম কম করে দেবার ফলে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের দাম যেমন সস্তা হয়ে যায়, ঠিক তেমনি দেশের ভেতর আমদানি করো বিদেশি পণ্যের দাম ঠিক সেই পরিমাণেই বেড়ে যায়। ভারতবর্ষ বিদেশ থেকে যেসব জিনিসপত্র আমদানি করে সেগুলোর একটা মোটা অংশ এরকম যে, দাম বাড়লেও তাদের চাহিদা কমানো যায় না। যেমন পেট্রোল, ভোজ্য-তেল ইত্যাদি। এইসব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আমদানি করতে এখন খরচ অনেক বেশি করতে হয়। ফলে আমদানি ব্যয় বেড়ে যায়। তাছাড়াও বিশ্ব-মুদ্রা-তহবিলের চাপে বিদেশ থেকে আমদানি করা

জিনিসপত্রের উপর থেকে আমদানি শুল্ক কম করে দিতে নরসিমা ও মনমোহন সিং বাধ্য হয়েছে। ফলে নানারকম অপ্রয়োজনীয় বিদেশি বিলাস-দ্রব্যে দেশের বাজার ভরে গেছে। ফলে আমদানি ব্যয় আরও বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৮৮-৮৯ সালে ভারত বিদেশ থেকে আমদানি করেছিলো ২৮,২৩৫ কোটি টাকার জিনিসপত্র। ১৯৯২-৯৩ সালে এই আমদানির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৬২,৯২০ কোটি টাকায় অর্থাৎ ১৩১% বেশি। এই আমদানি বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ এই সময়ের ভেতর ৮,৩০৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৯,৫৭২ কোটি টাকায়। এই ঘাটতির উপর আবার জুটেছে বিদেশি ঋণ শোধ দেবার পালা ও তার সুদ যোগানো। শুধু তাই না, খোলাবাজার নীতির ফলে এদের থেকে বিদেশি কোম্পানিগুলি তাদের লাভ, কমিশন, রয়ালটি, কাঁচামাল ও কলকজার দাম, বিদেশি বিশেষজ্ঞদের ফি ইত্যাদি বাবদ প্রচুর টাকা বিদেশে পাচার করার সুযোগ পায়। ফলে বিদেশি মুদ্রার চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং বিদেশি মুদ্রার সঙ্কট ক্রমেই আরও ঘনীভূত হচ্ছে। বিদেশ থেকে কিছু ঋণ পাওয়ায় আপাতত বিদেশি মুদ্রার তহবিলের অবস্থা কিছুটা ভালো হয়েছে এবং এই কথাটাই মনমোহন সিং জোর গলায় প্রচার করছে। কিন্তু এই ভালো হওয়াটা যে কতো সাময়িক সে কথা সে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করছে না।

খোলাবাজার নীতির ফলে ভারত যে শুধু বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটে পড়েছে- তা নয়, ভারতের কারখানা-শিল্প আগে থেকেই ব্যবসা-সঙ্কটে জর্জরিত হয়েছিলো। তার উপর খোলাবাজার নীতির ফলে বহু কল-কারখানা ও ব্যবসায়িক সংস্থার নাভিশ্বাস উঠেছে। বেকারের সংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে। ১৯৮৮ সালে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে যারা নাম রেজিস্ট্রি করেছেন এমন বেকারদের সংখ্যা ছিলো ৩ কোটি ৫০ হাজার। ১৯৯২ সালে এদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ কোটি ৬৮ হাজার। মনে রাখা দরকার লোকের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের উপর আস্থা বেকারী যতো বাড়ে ততো কমে যায় এবং বেকারদের নাম রেজিস্ট্রি করা ততো কম হয়। নরসিমা-এর এক অনুগত মন্ত্রীর মতে ২০০০ সালে রেজিস্ট্রি করা বেকারদের সংখ্যা ১০ কোটিতে দাঁড়াবে। যারা বেকার নয় মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কায় তাদের অবস্থাও ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিসপত্রের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৯-৯০ সালে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছিলো ৭% হারে। ১৯৯২-৯৩ সালে এই বৃদ্ধির হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৫%। ১৯৯৩ সালে ভালো বৃষ্টি হওয়ায় এবং ভালো ফসল হওয়ায় এই দাম বাড়ার হার কিছুটা কমে দাঁড়ায় ১০%। কিন্তু এই দাম কমার হারও যে অত্যন্ত সাময়িক হবে তা

বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, দাম বাড়ার একটা প্রধান কারণ বাজারে বেশি বেশি টাকা ছাড়া। কেন্দ্রীয় সরকার বাজারে বেশি বেশি টাকা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় থেকে ব্যয় অনেক বেশি হচ্ছে। এইভাবে সরকারি ঘাটতি হিসাবে যা পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যাচ্ছে, এই সরকারি ঘাটতি ক্রমেই বাড়ছে। গত বছরের প্রথম ৬ মাসে সরকারের ঘাটতি ছিলো ৫,৬৬১ কোটি টাকার। এ বছরে প্রথম ৬ মাসে তা দাঁড়ায় ১১,২২২ কোটি টাকায়, অর্থাৎ প্রায় ডাবল। কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে ধার করে এই ঘাটতি পূরণ করছে। রিজার্ভ ব্যাংকও মনের সুখে নোট ছাপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধার দিচ্ছে, এইভাবে বাজারে টাকার পরিমাণ ৬ মাসে প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেছে। এইভাবে যতোই বিদেশি ঋণ বাড়ছে, ততোই দেশের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং দেশের অবস্থা যতোই খারাপের দিকে যাচ্ছে ততোই নরসিমা ও মনমোহন সিং বিদেশি ঋণের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারস্থ হচ্ছে। এবং যতোই এরা বিদেশি ঋণ নিয়ে আসছে, ততোই চাপ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারস্থ হচ্ছে। এবং যতোই এরা বিদেশি ঋণ নিয়ে আসছে, ততোই চাপ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা দেশের বাজার দখল করার নানারকম সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে। বিদেশি ঋণের টাকায় কিছুদিনের জন্য কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যেতে পারে বটে, কিন্তু কিছুদিনের ভেতরই এর কুফল হাড়ে হাড়ে দেশের লোক টের পাবে। খোলাবাজার নীতি দুর্বল ও পেছনে পড়ে থাকা দেশগুলোর পক্ষ যে অত্যন্ত মারাত্মক, তা দেশের মানুষ বুঝতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ করে যেখানে শক্তিশালী একচেটিয়া বহুজাতিক কোম্পানিগুলো পেছনে পড়ে থাকা দেশগুলো বাজার, শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে, সেখানে তাদের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিয়ে দেওয়া মীরজাফরের ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার দেওয়ার নামান্তর মাত্র।

[উনিশ]

ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও গ্যাট চুক্তি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী দেশগুলি এটা বুঝেছিলো যে, ৩০-এর দশকের অর্থনৈতিক সঙ্কট, যা তাদের নিজেদের মধ্যে বাজারের দখল নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র করে শেষ পর্যন্ত আর একটা বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত করলো, তার পুনরাবৃত্তি ঘটলে পরিণতি আরো মারাত্মক হবে। কারণ, যুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে সমাজতন্ত্রের যে বিকাশ দেখা গেছে, তার প্রভাবে নতুন সঙ্কটের মধ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর টিকিয়ে রাখা যাবে না, গোটা বিশ্বই সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়বে।

এই পটভূমিকায় ১৯৪৫ সালে পুঁজিবাদী দেশগুলি মিলিত হলো ব্রেটন উড্সে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রীতিনীতি বিষয়ে নিজেদের মধ্যে একটা আপোষ-রফা করতে, যাতে প্রত্যেকে নিজের সুবিধার জন্য ইচ্ছামতো আমদানি শুল্ক বাড়াতে গিয়ে বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই আবার বিপর্যয়ের মধ্যে না ফেলে। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করা হলো বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সংস্থা। আলোচনার অনুসরণ করে ১৯৪৮ সালে গ্যাট GATT, জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস্ এন্ড ট্রেড, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শুল্ক সম্পর্কে সাধারণ চুক্তি প্রবর্তন করা হয়। এতে প্রথমে স্বাক্ষরকারী ছিলো ২৩টি দেশ। কয়েক বছর অন্তর আলোচনা মারফৎ চুক্তিতে নতুন সংযোজন বা কিছু সংশোধন করা চলতে থাকে। এই আলোচনার ধারা অনুসরণ করে ১৯৮৬ সালে দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়েতে যে আলোচনা শুরু হয়, তাকে অষ্টম রাউন্ড বলে উল্লেখ করা হয়। এই আলোচনায় অধিক সংখ্যায় অনুন্নত দেশগুলি যোগ দেয়। তা সত্ত্বেও আলোচনায় উন্নত দেশগুলির নিজস্ব স্বার্থরক্ষার বিষয়ই ছিলো প্রধান বিচার্য। এদের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিফলন দেখা যায় সাত বছর ধরে অষ্টম রাউন্ডের আলোচনার বিস্তৃতির মধ্যে। এই আলোচনার সময়েই দেখা যায়, মার্কিন পুঁজিবাদের সঙ্গে ইউরোপীয় এবং জাপানি পুঁজিবাদের সংঘর্ষের রূপ। গ্যাট চুক্তির মধ্যে আমেরিকা এর একটা সমাধানের পথ খুঁজছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই বিরোধেও সুযোগ সৃষ্টি করেছিলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়ী মিত্রপক্ষই। তারা জাপান, জার্মানি ও ইটালির উপর সমরাস্ত্র উৎপাদনের বিষয়ে অনেকগুলি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলো, যা তিনটি দেশের পক্ষে শাপেবর হয়ে দাঁড়ালো। এরা পূর্ণোদ্যমে তাদের দেশে ভোগ্য পণ্য ও যন্ত্রপাতির

উৎপাদন বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাঁকিয়ে বসলো। জাপান এই বিষয়ে যে পারদর্শিতার পরিচয় দিলো, তাতে আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোণঠাসা করার জন্য যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ ও তার আধুনিকীকরণের জন্য বিনিয়োগ বাড়িয়েই চলেছিলো। ভোগ্য পণ্য ও অন্যান্য শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য ক্রমশই সে আমদানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক বিপর্যয় উপস্থিত করলো এক নতুন সমস্যা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো আমেরিকার বাড়তি গম বিক্রির একটা বড় বাজার। তার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্স অন্যতম। এইবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কৃষিপণ্যের রপ্তানি নিয়ে আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশের স্বার্থের সংঘাত তীব্র হয়ে উঠলো।

আমেরিকায় ক্রমাগত আমদানি বাড়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বছরের পর বছর স্থায়ী হয়ে উঠলো। বিদেশের বাজার দখল বাড়াবার জন্য আমেরিকা গ্যাট চুক্তির মধ্যে তার সুবিধা মতন নতুন নতুন শর্তের অবতারণা করতে থাকলো। ইউরোপীয় ও অন্যান্য উন্নত দেশের পুঁজিপতিরা সহজে এই শর্তগুলি মানতে রাজি হয় না। তাই দীর্ঘ আলোচনার পর ১৯৯২ সালে গ্যাট এর ডিরেক্টর জেনারেল আর্থার ডাঙ্কেল উন্নত দেশগুলির পক্ষে সহজ হবে এমন একটি খসড়া সমঝোতাপত্র প্রস্তুত করলেন, যা 'ডাঙ্কেল প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এই খসড়া প্রকাশ হলে দেখা গেল- কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু উন্নত দেশগুলির পক্ষে আপত্তিজনক শর্ত থাকলেও শর্তগুলি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থের পক্ষে বিশেষভাবে প্রতিকূল। দীর্ঘ আলোচনার পর চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে ১৯৯৪ এর এপ্রিলের 'গ্যাট ১৯৯৪' নামে এই চুক্তি ভারত সমেত ১১৭টি দেশের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়।

ডাঙ্কেল প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

প্রধানত চারটি বিষয় ডাঙ্কেল প্রস্তাবে উত্থাপন করা হয়। (১) ট্রিমস (TRIMS) (২) ট্রিপস (TRIPS) (৩) গ্যাটস (GATS) এবং (৪) এমটিও (MTO) যা পরে করো৷ হয়েছে ডব্লিউটিও (WTO), এবার এগুলির তাৎপর্য আলাদা আলাদা করে দেখা যাক।

(১) ট্রিমস : ট্রেড রিলেটেড ইনভেস্টমেন্ট মেজার্স, অর্থাৎ ব্যবসা, সম্পর্কিত বিনিয়োগ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় দাবি করা হয় প্রত্যেক বিদেশি কোম্পানিকে কোনো দেশের ব্যবসায়ে দেশীয় কোম্পানির সমান সমস্ত সুযোগ দিতে হবে।

এদের অবাধ বাণিজ্যে কোনো রকম শর্ত বা বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা চলবে না। বিদেশি বিনিয়োগকারী দেশে উৎপাদনের জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠা করে যদি প্রয়োজন মনে করে, তবে সমস্ত যন্ত্রাংশ আমদানি করতে বা সস্তা মনে হলে দেশি সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে। মুনাফা যা অর্জিত হবে তার সবটাই নিজের দেশে পাঠাতে পারবে।

ট্রিমস-এর শর্ত দেশি ও বিদেশি বাজারকে এক অভিন্ন বাজার বিবেচনা করায় অনুন্নত দেশগুলি এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। ভারতবর্ষে বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলি এখনই যে আমদানি করে তাতে বিদেশি মুদ্রা বাইরে যা চলে যায়, তার তুলনায় রপ্তানি করে আয় কম করে। ভারতীয় শ্রম ও সম্পদ সস্তা দরে ব্যবহার করে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে তারা বাজার দখল করে। ভারতীয় শিল্প সংকুচিত হয়, কারখানা বন্ধ হয়, শ্রমিক ছাঁটাই হয়। এদিকে ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হওয়ার ফলে বিদেশি মুদ্রায় যে ঘাটতি দেখা যায় তা পূরণ করতে বিদেশি ঋণ গ্রহণ করতে হয়। আমাদের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১৯৯৪ সালে যেখানে আমাদের রপ্তানি থেকে আয় হয়েছিলো ১০৩৫.১১ কোটি ডলার, সেখানে আমদানি বাবদ ব্যয় হয়েছিলো ১০৭৯.৯৬ কোটি ডলার (ইকনমিক সার্ভে রিপোর্ট ১৯৯৩-৯৪)। এই অবস্থা চলতে থাকলে ট্রিমসের চাপে ভারত আরও বৈদেশিক ঋণে জড়িয়ে পড়বে।

(২) **ট্রিপস** : ট্রেড রিলেটেড ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস, অর্থাৎ ব্যবসায়গত মেধাস্বত্ব সম্পত্তির অধিকার। এই শর্তের উদ্দেশ্য মানুষের বুদ্ধিজাত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের প্রয়োগ আবিষ্কারকের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করা। চুক্তিতে তালিকাভুক্ত ক্ষেত্রগুলিতে, যেমন কপিরাইট, ট্রেড মার্কস, পেটেন্ট, শিল্পগত নক্সা ইত্যাদি বিষয়ে এই বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হবে। এর মধ্যে পেটেন্টের বিষয়ে যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তা ভারতবর্ষের মতন উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর।

পেটেন্ট আইন কার্যত মানুষের জ্ঞানকে অন্যান্য পণ্যের মতন বাজারে বিক্রয়ের সামগ্রী হিসাবে বিবেচনা করে। পুঁজিবাদী সমাজে তার মূল্য নির্ধারণ করা হয় এর থেকে কতটা মুনাফা লাভ করা যাবে সেই হিসাবে। ভারতবর্ষে ১৯৭০ সালের পেটেন্ট আইনে কিন্তু এইদিক থেকে কয়েকটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমাজের মঙ্গল ও উন্নতির উদ্দেশ্যে কতগুলি ক্ষেত্রে সব আবিষ্কার জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, কোনো পেটেন্ট করা গ্রাহ্য হবে না। ক্ষেত্রগুলি হলো (ক) কৃষি ও ফলাদি উৎপাদনের পদ্ধতি, (খ) মানুষ, পশু ও গাছপালাকে রোগমুক্ত করার যে কোনো পদ্ধতি, (গ) খাদ্য ও ওষুধে

ব্যবহার হতে পারে এ ধরনের যেকোনো বস্তু এবং (ঘ) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত বিভিন্ন বস্তু। আইনে বলা হয় যে, শেষোক্ত বস্তুগুলির কোনো পেটেন্ট এদেশে হবে না। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় বস্তুগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে তা পেটেন্ট করা চলবে। যেমন, কোনো ওষুধ যদি কেউ ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রস্তুত করে তা বেআইনি হবে না। ডাঙ্কেল প্রস্তাব কিন্তু বস্তু ও পদ্ধতির মধ্যে আইনের পার্থক্যকে স্বীকার করে না। অথচ অনুন্নত দেশের পক্ষে এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। এরই সাহায্যে ভারতে প্রস্তুত ওষুধ বিদেশি ওষুধের সমকক্ষ, অথচ তুলনায় অনেক কম মূল্যে বিক্রয় হয়।

ভারতীয় পেটেন্ট আইন ভারতীয় আবিষ্কারককে স্বদেশে কাজ করতে উৎসাহ দেয়। গ্যাটের চুক্তিতে এর বিরোধিতা করে বলা হয়েছে- আবিষ্কারের স্থান, প্রয়োগের ক্ষেত্র, স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত কিংবা আমদানি করা কিনা এইসব প্রভেদ বিবেচনা করা চলবে না।

ভারতীয় পেটেন্ট আইন অনুসারে খাদ্য, রসায়ন এবং ভেষজ সংক্রান্ত বিষয়ের পেটেন্টের সীমা ৭ বছর এবং অন্য ক্ষেত্রে ১৪ বছর। গ্যাট চুক্তি এই সীমা নির্ধারণ করেছে ২০ বছর। এর ফলে পেটেন্টকারী অনেক বেশি সময় তার একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখবে। ২০ বছরের মধ্যে এই ক্ষেত্রে নতুন কোনো আবিষ্কার গ্রাহ্য হবে না। গ্যাট চুক্তি ভারতীয় পেটেন্ট আইনে সব কয়টি প্রগতিশীল দিককে নস্যাৎ করে দিতে চায়।

(৩) গ্যাটস : জেনারের এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস, অর্থাৎ পরিষেবা (ও কৃষি ব্যবসা) সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি।

গ্যাটসের চুক্তিতে নানা ধরনের পরিষেবা যেমন ব্যাঙ্ক, বীমা, অর্থাৎ লগ্নীর ব্যবসা, জাহাজ চলাচল, পরিবহন, টেলিকমিউনিকেশ, আইন, ডাক্তারি, নির্মাণ ইত্যাদি পেশাগত ব্যবসা, পত্রপত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ব্যাঙ্ক, বীমা, অর্থ লগ্নীর ব্যবসা, বিমান চলাচল এবং শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিদেশে পেশাগত কারণে যাতায়াত, এই বিষয়গুলোর মধ্যে দক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিদেশে যাতায়াতের উপর নিয়ন্ত্রণও রয়েছে। অন্যদিকে ব্যাঙ্ক বীমা ও অর্থ-বিনিয়োগকারীদের বিদেশে যাতায়াতের উপর নিয়ন্ত্রণও রয়েছে। অন্যদিকে ব্যাঙ্ক-বীমা ও অর্থ-বিনিয়োগের সংস্থাগুলির অবাধ স্বাধীনতা রক্ষা করার সুযোগ এক দেশের পুঁজি অন্য দেশে স্থানান্তরিত করা সহজ হলো। ভারতের মতন অনুন্নত দেশগুলির দক্ষ শ্রমিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানিরা যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারতেন তার সুযোগ সংকুচিত হলো।

(৪) ডব্লিও. টি. ও : ওয়ার্লড ট্রেড অরগানাইজেশন, অর্থাৎ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা। এই শর্তে দাবি করা হয়েছে যে, যে সব দেশ চুক্তি সমস্ত শর্ত গ্রহণ করবে তারাই সংস্থার সদস্য হতে পারবে। এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো স্বাক্ষরকারী দেশগুলি চুক্তির শর্ত পালন করছে কি'না তার উপর নজর রাখা। কোনো পক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ করোলে এই সংস্থা তার বিচার করবে। বিচার হবে অভিনব পদ্ধতিতে। পুরানো রোমান আইন অনুসারে আমাদের দেশে এবং অন্য অনেক দেশে বিচারের নিয়ম হলো, যে অভিযোগ করবে তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে অভিযুক্ত দোষী। এতে অভিযুক্ত পক্ষ, যে অভিযোগ করবে তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে অভিযুক্ত দোষী। এতে অভিযুক্ত পক্ষ আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হলেও বিচারে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। নিয়মে ব্যবস্থাটা উল্টে এখন দাঁড়ালো যে, অভিযোগকারীর দায়িত্ব শুধু অভিযোগ পেশ করা এবং অভিযুক্ত পক্ষের দায়িত্ব এই অভিযোগ খণ্ডন করা। বহুজাতিক সংস্থাগুলি তার ফলে সামান্য অজুহাতেই অনুন্নত দেশের প্রযুক্তি উন্নতির প্রচেষ্টাকে ব্যবহাত করার জন্য পেটেন্ট আইন ভঙ্গের নালিশ করতে পারবে। এর ফলে অনুন্নত দেশের প্রচুক্তিবিদরা সব সময়েই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবেন।

এর উপর গ্যাট চুক্তিতে কৃষি সম্পর্কে এমন কতকগুলি বিশেষ শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যা আগে ভাবা যেত না। যারা অবাধ বাণিজ্যের প্রবক্তা তারাই এখন শর্ত আরোপ করছেন যে প্রত্যেক দেশ বাধ্যতামূলকভাবে নিজেরে দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট অংশ আমদানি করবে উন্নত দেশগুলির জন্য এই অংশ হবে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগ এবং অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে এটা হবে শতকরা ৩.৫ ভাগ। আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলি নিজস্ব প্রয়োজনের বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন করে অন্য দেশে রপ্তানি করে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলিতে এখন জাতীয় আয় যেভাবে হ্রাস পেয়েছে তাতে সেখানে রপ্তানির সুযোগ কমে গেছে। এই অবস্থায় অনুন্নত দেশগুলি যেখানে ক্রববর্ধমান জনসংখ্যা এবং কৃষিতে স্বয়ং সম্পূর্ণতার অভাব সেখানে রপ্তানির সুযোগ পাওয়া দরকার। এই শর্তের তাৎপর্য হলো স্বাক্ষরকারী কোনো দেশ যেন খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভর হবার চেষ্টা না করে। ফলে অনুন্নত দেশগুলি সব সময়েই খাদ্যশস্য আমদানি করে যাবে।

কৃষিতে উন্নত বীজের আবিষ্কার ও ব্যবহার সম্পর্কে গ্যাট-এ যে ধারা সংযোজন করা হয়েছে, তাতে বহুজাতিক সংস্থাগুলির এ বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার আরো শক্তিশালী হবে। শুধু উন্নত বীজের ব্যবহারই নয়, এর থেকে গবেষণা

করে আরো উন্নত করার অধিকারও আবিষ্কারক ছাড়া আর কারো থাকবে না। কৃষক উন্নত বীজ বাঁচিয়ে পরের মৌসুমে নিজের জমিতে ব্যবহার করতে গেলেও বিক্রেতা সংস্থাকে টাকা দিতে হবে এবং শর্তও আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিতর্কের ফলে আপাতত কিছুদিনের জন্য নিষ্কৃতি মিললেও এই দাবি এখন বহুজাতিক সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছে।

কৃষিতে জমির পক্ষে ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পদার্থগুলির পরিবর্তে ক্ষুদ্র আকারের জীবন, যেমন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি এবং অন্যান্য মাইক্রো অর্গানিজমের সাহায্যে উদ্ভিদে এমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায় যাতে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের জৈব প্রযুক্তি শস্যের চরিত্র বদল করে অসুখের প্রতিরোধ করতে পারবে। ভারতীয় পেটেন্টে আইন জীবজগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গ্যাট চুক্তি এই অধিকার দাবি করেছে। শুধু কৃষিতেই নয় মানুষের ব্যবহার্য ওষুধের ক্ষেত্রেও জৈব প্রযুক্তি পেনিসিলিন জাতীয় ওষুদের প্রবর্তন করেছে। ভারতের বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। এই প্রযুক্তিও নতুন চুক্তির ফলে বিপন্ন হবে।

যুদ্ধোত্তর বিশ্বে পুঁজিবাদী দেশগুলি উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে একদিকে যেমন তাদের উৎপাদনের ক্ষমতা যথেষ্ঠ বাড়াতে পেরেছিলো, তখন অন্যদিকে তাদের শ্রম নিয়োগের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছিলো। ফলে উৎপাদিত পণ্যের বাজার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিলো। ৭০-এর দশক থেকে পুঁজিবাদী দেশগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন বাড়িয়ে তোলে, তখন তারা জোট বেঁধে অনুন্নত দেশের বাজার দখল করে এই সমস্যার সমাধানের জন্য উদ্যোগী হয়। গ্যাট চুক্তি এই সঙ্কট থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিত্রাণের পরিকল্পনা হিসাবে রচনা করা হয়েছে। বাজার দখল নিয়ে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির অন্তদ্বর্ন্দ্ব, উন্নত দেশগুলির সঙ্গে অনুন্নত দেশগুলির দ্বন্দ্ব এই সব প্রতিফলিত হয়েছে গ্যাট চুক্তির মধ্যে পরস্পরবিরোধী শর্তগুলিতে। একদিকে যখন দাবি করা হচ্ছে যে গ্যাট চুক্তি অবাধভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যবস্থা করবে, তখন অন্যদিকে পণ্য ও পরিষেবার আমদানি ও রপ্তানির ব্যাপারে বিভিন্ন রকম শর্ত আরোপ করা হয়েছে চুক্তিতে। বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগ করে বিশ্ব জুড়ে যে অসম প্রতিযোগিতার অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে সম্পর্কে গ্যাট চুক্তি সম্পূর্ণ নীরব। বস্তুতপক্ষে গ্যাট চুক্তি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে অসম প্রতিযোগিতার অবস্থা স্থায়ী করার ব্যবস্থা করেছে। এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদী শক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পারবে না, এবং পুঁজিবাদী সংকটের সমাধানও এইভাবে সম্ভব হবে না।

একদিকে যেমন একচেটিয়া বড় পুঁজিবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর ভেতরও, বিশেষ করে ছোট ছোট শিল্পপতিদের ভেতর, যারা স্বাধীনতাপ্রিয় ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও একচেটিয়া বড় বুর্জোয়া শ্রেণী, বিশেষ করে ছোট ছোট শিল্পপতিরা ও তাদের নেতারা, সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে না সমাজতন্ত্র ও স্বাধনতার পক্ষে যোগ দেবে তা নির্ভর করে কী পরিমাণে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে ভারতের জনগণ সচেতন ও ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করোছে তার উপর।

স্বাধীনতা ও সমাজবাদের পক্ষে বিশাল, শক্তিশালী আন্দোলন সৃষ্টি করোতে হলে প্রথম ও সর্বাগ্রে প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর ও কৃষক শ্রেণীর পার্টিগুলির ঐক্য। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলির ঐক্যকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক শক্তি দানা বেঁধে উঠবে ও সংহতি লাভ করবে। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলি যদি দ্বিধা-বিভক্ত ও দুর্বল থাকে এবং শুধুমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে কার্য উদ্ধার করার চেষ্টা করে তাহলে বেশিদিন তারা সফল হবে না। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সঙ্কট গুরুতর আকার ধারণ করোলে এরা বাধ্য হয়েই সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আশ্রয় নেবে। এই বিপজ্জনক পদক্ষেপ থেকে তারা বিরত থাকবে এবং স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রের পক্ষে কাজ করবে, একমাত্র যদি দেশে এই আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে দেশের জনগণকে এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল করা যায়। সে আন্দোলন সৃষ্টি করার পক্ষে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিগুলির একতা।

[বিশ]

পরিশিষ্ট

তোমাদের ভেতর অনেকে হয়তো বীজগণিত দেখলে ভূতের ভয় পাও। কিন্তু অনেকের পক্ষে বীজগণিতের ভাষায় জিনিস বোঝাও সুবিধা, চিন্তা করাও সহজ। তাদের জন্য বই-এর প্রথম দিকে আলোচিত সিদ্ধান্ত ও তার প্রমাণগুলি বীজগণিতের ভাষায় দিচ্ছি-

১। বাড়তি মূল্য

মনে করো, M = পুঁজি

c = পণ্য

M' = বর্ধিত পুঁজি

S = বাড়তি মূল্য

তাহলে, আগের যুগের বিনিময়কে (যখন বিনিময় লাভের জন্য হতো না, এক পণ্যে দিয়ে অন্য পণ্য পাবার জন্য হতো) আমরা এই রকমভাবে প্রকাশ করতে পারি-

$$c- M- c$$

পরের যুগের বিনিময়কে (যখন বিনিময়ের লাভের উদ্দেশ্য হতে লাগলো) আমরা এই রকমভাবে লিখতে পারি-

$$M- c-M'$$

$\therefore$ বাড়তি মূল্য $= S = M' - M$

২। যান্ত্রিক সংগঠন :

মনে করো, মোট পুঁজি (যা ব্যবসায়ে খাটছে) = M

এই মোট পুঁজির একটা অংশ যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য অপরিবর্তনশীল পুঁজি হিসেবে খাটছে। তাকে আমরা বলছি - C

এবং যে অংশটা শ্রমশক্তির মূল্য বাবদ খরচ করা হচ্ছে পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসাবে, তাকে আমরা বলবো - V

তাহলে $M = C + V$

(খ) P' নির্ভর করে S' ও $\frac{C}{V}$ এর উপর ;

কারণ, $P' = \frac{S}{C+V}$ এবং $S' = \frac{S}{V}$; অথবা $S = S'V$

সুতরাং $P' = \frac{S'V}{C+V}$ – [S এর জায়গা $S'V$ লিখে]

$$= \frac{S'}{\frac{C}{V}+1}$$ [উপরে ও নীচে দিয়ে V ভাগ করে]

সুতরাং P' নির্ভর করছে S' ও $\frac{C}{V}$ র উপর।

$$P' = f\left(S' \frac{1}{\frac{C}{V}}\right)$$

অর্থাৎ যদি $\frac{C}{V}$ ঠিক থেকে S' বাড়ে তাহলে P' ও বাড়ে।

যদি S' ঠিক থেকে $\frac{C}{V}$ বাড়ে তাহলে P' কমে।

অর্থাৎ বাড়তি মূল্যের হার যতো বাড়বে মুনাফার হার ততো বাড়বে এবং যান্ত্রিক সংগঠন যতো বাড়বে মুনাফার হার ততো কমবে।

৫ । ব্যবসা-সঙ্কট :

মনে করো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদন-যন্ত্র উৎপাদন বিভাগ = I খাবার-দাবার, কাপড়, জুতা ইত্যাদি ব্যবহারিক দ্রব্য উৎপাদন বিভাগ = II

I বিভাগের মোট পুঁজি খাটছে M এবং বাড়তি মূল্য তৈরি হচ্ছে S, সুতরাং I বিভাগে মোট যতো মূল্য তৈরি হলো তা হচ্ছে-

$$= M + S$$
$$= (C + V + S) \text{ যেহেতু } [M=C+V]$$

আমরা I বিভাগের মোট উৎপাদিত মূল্যকে বলবো

$$= I\,(C+V+S)$$

এইরূপ, II বিভাগেরও মোট উৎপাদিত মূল্য হবে

$$= II\,(C+V+S)$$

এখন মনে করো, উভয় বিভাগেরই যে বাড়তি মূল্যটা তৈরি হয়, তার কিছুটা পুঁজিবাদী নিজে খরচ করে, কিছু ব্যবসায়ে খাটায়। ব্যবসায়ে যতো খাটায় তা আবার কিছুটা পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসেবে মজুরদের দেয়, কিছু অপরিবর্তনশীল পুঁজি হিসেবে যন্ত্রপাতি কিনতে ব্যয় করে। এই কথা I ও II দু' বিভাগের পক্ষেই খাটে। পুঁজিবাদী বাড়তি মূল্যের যে অংশটা নিজের ব্যবহারের জন্য খরচ করে তাকে আমরা বলবো "a" এবং যে অংশটা পরিবর্তনশীল পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে তাকে বলবো "1" এবং যে অংশটা অপরিবর্তনশীল পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে তাকে বলবো 'k" সুতরাং বাড়তি মূল্য (S) এই রকমভাবে ভাগ হয়ে যায়-

সুতরাং $S = a + (k+1)$
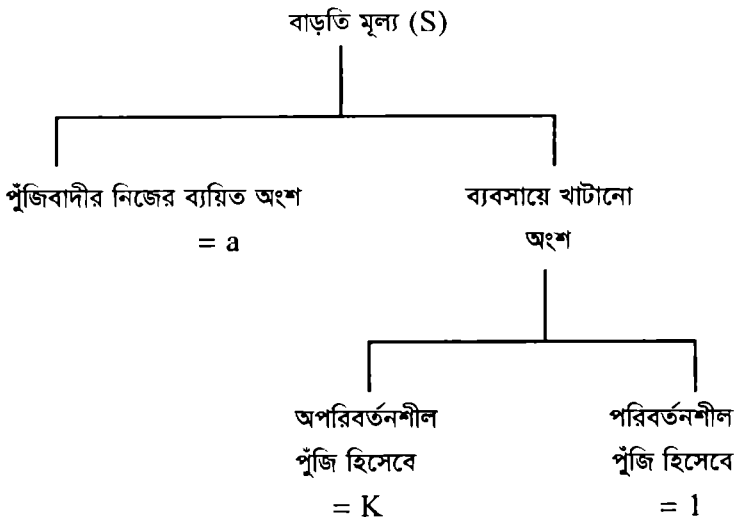
সুতরাং I বিভাগের যতো মূল্য তৈরি হলো তার মোট মূল্য =

$I(C+V+S) = I[C+V+\{a+(k+1)\}]$···

... [S-এর জায়গায় $a+(k+1)$] বসিয়ে

$= I(C+V+a+k+1)$

তেমনি II বিভাগের মোট মূল্য হবে -

$II(C+V+S) = II[C+V+\{a+(k+1)\}]$

$= II\ (C+V+a+k+1)$

I বিভাগের এই মোট মূল্যের ভেতর যন্ত্রপাতির ক্ষয়পূরণ, নতুন যন্ত্রপাতি বসানোর জন্য লাগছে- $(C+k)$

অর্থাৎ I বিভাগের মোট যতো মূল্য তৈরি হচ্ছে, তার $(C+k)$ পরিমাণ ঐ বিভাগের লোকের কাছেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বাকি থাকছে - $(V+a+1)$ পরিমাণ মূল্য। I বিভাগের এই পরিমাণ II বিভাগের কাছে বিক্রি করতে হবে।

II বিভাগের যতো মূল্য সৃষ্টি হচ্ছে, তার ভেতর (V+a+1) পরিমাণ মূল্যের ব্যবহারিক দ্রব্য ঐ বিভাগের লোকদের কাছেই বিক্রি হয়ে যাবে। কারণ, V হচ্ছে পুরানো শ্রমিকদের আয় এবং 1 হচ্ছে নতুন শ্রমিকদের আয়। সুতরাং, শ্রমিকরা এই আয় দিয়ে ব্যবহারিক দ্রব্য কিনবে (আমরা ধরে নিচ্ছি, শ্রমিকদের যা আয় তা থেকে কিছু বাঁচাতে পারে না, সবটাই ব্যবহারিক দ্রব্যে খরচ হয়। সুতরাং এই পরিমাণ ব্যবহারিক দ্রব্য II বিভাগের মজুরদের কাছেই বিক্রি হয়ে যাবে। II বিভাগের পুঁজিপতিরাও কিছুটা পরিমাণ ব্যবহারিক দ্রব্য কিনবে। আমরা আগে তার পরিমাণ ধরেছি "a", সুতরাং মোট ঐ বিভাগেই (V+a+1) পরিমাণ ব্যবহারিক দ্রব্য বিক্রি হয়ে যাবে। II বিভাগের উৎপাদিত পণ্যের আর বাকি থাকে (C+k) পরিমাণ মূল্য। এইটা তাদের I এর লোকদের কাছে বিক্রি করতে হবে।

সুতরাং I বিভাগ II বিভাগের কাছে I(V+a+1) পরিমাণ যন্ত্রপাতি বিক্রি করতে চাইবে এবং II বিভাগ I বিভাগের কাছে II (C+k) পরিমাণ মূল্যের ব্যবহারিক দ্রব্য বিক্রি করতে চাইবে। সুতরাং I-এর ও II-এর সব পণ্য বিক্রি করতে হলে I(V+a+1) = II (C+k) হওয়া দরকার। যদি এই দুইটি সংখ্যা সমান না হয় তাহলেই পণ্য অবিক্রিত থেকে যাবে এবং ব্যবসা-সঙ্কট আরম্ভ হবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথায় যে যার মতন উৎপাদন করে বলে এই দুইটি সংখ্যা বরাবর সমান রাখা খুব কষ্টকর।